রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী

রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

প্রথম খণ্ড

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৮০ : ১৮৯৫ শক

প্রচ্ছদলিপি : শ্রীসুবিমল লাহিড়ী

প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী। ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

মুদ্রক শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস। ১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

নিবেদন

রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীর সূচনা করেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ১৩২৮-২৯ সালে প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত তাঁহার 'রবীন্দ্র-পরিচয়' প্রবন্ধমালায়।[১] এই প্রবন্ধগুলি সূচী-সংকলনমাত্র নহে; সূচী-সংকলনের সহিত তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের কালানুক্রমিক পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠকের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই আলোচনা সম্পূর্ণ হয় নাই— এই প্রবন্ধমালায় তিনি বন-ফুল, কবি-কাহিনী ও রুদ্রচণ্ড এই তিনখানি বইয়ের আলোচনা করেন; প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু তথ্য এগুলিতে সন্নিবিষ্ট হয়।[২]

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসমূহের একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করেন এডওয়ার্ড টমসন তাঁহার *Rabindranath Tagore Poet and Dramatist* (Oxford University Press, 1926) গ্রন্থে। এই গ্রন্থসমূহের কতকগুলি এ সময়ে বহুকাল ধরিয়া অপ্রচলিত; অনুমান হয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রভৃতি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অনেক রবীন্দ্রানুরাগীও সকল পুস্তকের সহিত তখন পরিচিত ছিলেন না। টমসন সাহেবের এই তালিকায় তাহার অনেকগুলি উল্লিখিত।

ইহার কয়েক বৎসর পরে শান্তিনিকেতনের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' [১৯৩২] নামে রবীন্দ্রগ্রন্থনিচয়ের একটি পূর্ণতর সূচী প্রকাশ করেন— কবিকাহিনী (১৮৭৮) হইতে সঞ্চয়িতা (১৯৩১) পর্যন্ত ২৪৮ খানি পুস্তক-পুস্তিকা ইহাতে উল্লিখিত হয়। এই সূচীগ্রন্থের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য গ্রন্থোৎসর্গ-বিবরণ— পুরাতন গ্রন্থ অনেকগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল; কোনো-কোনো গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইলেও উৎসর্গপত্র বর্জিত হইয়াছিল— ফলে উৎসর্গপত্রে বিধৃত সৌহৃদ্য ও প্রীতির নিদর্শনও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

বিস্মৃত কতকগুলি পুস্তিকাও এই সূচীতে উল্লিখিত হয়।

ইহার আট বৎসর পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস

১ প্রবাসী, মাঘ ফাল্গুন, চৈত্র ১৩২৮; জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩২৯

২ যেমন, কোনো-কোনো গ্রন্থের রচনাকাল তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে জানিয়া লন; স্বাক্ষরহীন কোনো-কোনো বাল্যরচনা রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যাচাই করিয়া লইয়া প্রবন্ধে উল্লেখ করেন।

শনিবারের চিঠিতে ১৩৪৬ কার্তিক সংখ্যা হইতে "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকের রচনা ও গ্রন্থের "পঞ্জী"— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রিত গ্রন্থগুলি লইয়া ও সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বেনামী ও ছদ্মনামে প্রকাশিত রচনাগুলি লইয়া কাজ করেন। 'এই রচনা ও গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের কাজ নানা কারণে শনিবারের চিঠিতে সম্পূর্ণ হয় নাই'— কিন্তু কাজ যতদূর হইয়াছিল তাহা বিস্তারিতভাবেই হইয়াছিল। এই আলোচনা-প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম মুদ্রিত (স্বাক্ষরহীন) কবিতা 'অভিলাষ' আবিষ্কৃত হয়, আরো অনেক গদ্য পদ্য রচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়।

গ্রন্থপঞ্জীও সবিস্তারে প্রকাশিত হইতে থাকে ; গ্রন্থবর্তী রচনাগুলির সাময়িকপত্রে প্রকাশের সূচীও এই পঞ্জীর অন্তর্গত হয়। ১৩৪৬ কার্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত শনিবারের চিঠিতে, "কথা-চতুষ্টয়" (১৩০১) পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী মুদ্রণ আরম্ভের কিছুকাল পূর্বে বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেন, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের আশ্বিন মাসে। প্রত্যেক খণ্ডে বিধৃত বিভিন্ন পুস্তকের যে 'গ্রন্থপরিচয়' ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে ধারাবাহিক গ্রন্থপঞ্জী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর প্রাসঙ্গিক আরো বহু তথ্য সংগৃহীত বা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অতিরিক্ত যে-সকল নূতন রবীন্দ্র-গ্রন্থ বা পুরাতন গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বিশ্বভারতী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরিশেষেও অধিকাংশ স্থলে এই-জাতীয় উপকরণ সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

এতাবৎকাল বিভিন্ন গবেষকের রবীন্দ্রচর্চার ফলেও বহু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে ; গ্রন্থপঞ্জী যাহার প্রধান বিষয় না হইলেও যাহাতে প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর তথ্যের সহিত, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে পঞ্জীতে সংকলনযোগ্য বহু প্রয়োজনীয় তথ্যেরও সমাবেশ ঘটিয়াছে ; যেমন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'রবীন্দ্রজীবনী' চার খণ্ড ; চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'রবিরশ্মি' দুই খণ্ড ; শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড ; শ্রীকানাই সামন্ত প্রণীত 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' ; শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ; শ্রীকানাই সামন্ত সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা,

ও গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড।[১]

শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী'তে ও অন্যত্র সজনীকান্ত দাস যে-সকল উপকরণ আহরণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে (১৩৬৭) নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবারের চিঠিতে 'রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী'তে গ্রন্থপঞ্জী অংশ সম্পূর্ণ করেন নাই; "রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়" নামে একখানি পুস্তকে (প্রকাশ পৌষ ১৩৪৯; সংস্করণ মাঘ ১৩৫০) একটি 'কালানুক্রমিক তালিকা' প্রকাশ করেন। 'এই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের রচিত বাংলা পুস্তকের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রকাশিত হইল।' তবে শনিবারের চিঠিতে রবীন্দ্ররচনাপঞ্জীতে তাঁহার সংকলিত গ্রন্থপঞ্জী অংশের বিবরণ যেরূপ বিশদ ছিল, ইহাতে সেরূপ নহে। বেঙ্গল লাইব্রেরি তালিকা হইতে প্রকাশ-তারিখ যোগ করিবার ফলে পুস্তকগুলির প্রকাশের ক্রমনির্ণয় হইয়াছে, ইহা এই পুস্তকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার পরিশিষ্টে বহু মূল্যবান প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপকরণ সংকলিত হয়।

১৩৫০ সালের পরে এ যাবৎ প্রকাশিত পুস্তকাবলীর তালিকাও স্বভাবতই ইহাতে নাই।

'প্রধানতঃ পুস্তিকা ও প্রোগ্রামের নাম' এই তালিকায় সংকলিত হয় নাই।

'এই গ্রন্থপঞ্জীতে প্রথম সংস্করণের পুস্তকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রচলিত সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থাকিলেও প্রধানতঃ তাহার কোনো উল্লেখ করা হয় নাই।'

অতঃপর শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক তাঁহার সংকলিত একটি 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনকথা' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৬। পরিবর্ধিত সংস্করণ কার্তিক ১৩৬৮) প্রকাশ করেন।

---

১ রবীন্দ্রশতবার্ষিক উৎসবের প্রাক্‌কালে এবং উৎসব-বর্ষে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ কয়েকখানি 'অভিধান' বা 'কোষ-গ্রন্থ' প্রকাশিত হইয়াছে, যথা, শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীবাসুদেব মাইতি, 'রবীন্দ্ররচনাকোষ'; শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিধান'; শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু, 'রবীন্দ্র-অভিধান'; শ্রীনির্মলেন্দু রায়চৌধুরী, 'রবীন্দ্র-নির্দেশিকা'। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, 'রবীন্দ্রশব্দকোষ'।

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী প্রণীত 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' ও শ্রীসীতা দেবী প্রণীত 'পুণ্যস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের জীবনালেখ্যরূপেই স্মরণীয়; তবে এ দুটি পুস্তকে রবীন্দ্র-রচনা সম্বন্ধে বহু তথ্যও প্রসঙ্গক্রমে কাহিনীসূত্রে আহৃত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে ও মৃত্যুর পর, 'রবীন্দ্রজীবনকথা'র পরিবর্ধিত সংস্করণের (কার্তিক ১৩৬৮) প্রকাশকাল পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি এই তালিকাভুক্ত।[১]

এই সূচনায় যে-সকল প্রবন্ধ ও গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সবগুলি দ্বারাই বর্তমান সংকলয়িতা অল্পবিস্তর উপকৃত হইয়াছেন।[২]

বর্তমান রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী সংকলনে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপার্থ বসু, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীশুভেন্দু-শেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।— ইঁহাদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই পঞ্জী প্রথমে অংশত সাহিত্যের খবরে এবং পরে ধারাবাহিকভাবে কালি ও কলম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী সংকলন করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুগ্রহপূর্বক আমাকে একটি বৃত্তি দিয়াছিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষকে সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

---

১ অতঃপর বর্তমান সংকলয়িতা ও শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক -কৃত অনুরূপ একটি সূচী, সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত *Rabindranath Tagore: A Centenary Volume* (November 1961)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়; ইহাতে ইংরেজি গ্রন্থের তালিকাও আছে। অপিচ দ্রষ্টব্য: Niharranjan Ray, *An Artist in Life* (December 1967).

২ পূর্বপৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লিখিত 'অভিধান' বা কোষ'-জাতীয় গ্রন্থের অনেকগুলির বিষয়বস্তু বহুলাংশে বর্তমান গ্রন্থপঞ্জীর পরিসর-বহির্ভূত।

১

কবি-কাহিনী। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। / ও / শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা / মেছুয়াবাজার-রোডের ৪৯ সংখ্যক ভবনে / সরস্বতী যন্ত্রে / শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক / মুদ্রিত। / সংবৎ ১৯৩৫।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র [৵০], ৫৩।

প্রকাশ [৫ নভেম্বর ১৮৭৮]। মুদ্রণসংখ্যা ৫০০। মূল্য ছয় আনা।[১]

কবি-কাহিনী রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ইহা চারি সর্গে সমাপ্ত— গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১২৮৪ সালের ভারতী পত্রের পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় ইহা মুদ্রিত হয়। রচনা স্বাক্ষরহীন।

কবি-কাহিনীর সাহিত্যমূল্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে 'ভারতী' অধ্যায়ে মন্তব্য করিয়াছেন—

"এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই 'কবিকাহিনী' নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্ত্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে— যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে[২]— তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ,

---

১ বন্ধনীভুক্ত প্রকাশ-তারিখ, এবং মুদ্রণ-সংখ্যা বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ হইতে গৃহীত। মূল্য যে ক্ষেত্রে পুস্তকে উল্লিখিত নাই সে ক্ষেত্রে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ হইতে গৃহীত।

২ হিমালয়ের প্রতি বৃদ্ধ কবি :

"কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে,
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানব-মনে বিষ মিশাইয়া!

ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত

কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,...
তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার!...
পৃথিবী জানে না গিরি, হেরিয়া পরের জ্বালা,
হেরিয়ে পরের মর্ম্ম-দুখের উচ্ছ্বাস,
পরের নয়নজলে, মিশাতে নয়নজল
পরের দুখের শ্বাসে মিশাতে নিশ্বাস!...
কেহ বা রতনময় কনকভবনে
ঘুমায়ে রয়েছে সুখে বিলাসের কোলে,
অথচ সুমুখ দিয়া দীন নিরালয়
পথে পথে করিতেছে ভিক্ষান্ন-সন্ধান!
সহস্র পীড়িতদের অভিশাপ লোয়ে
সহস্রের রক্তধারে ক্ষালিত আসনে
সমস্ত পৃথিবী রাজা করিছে শাসন,...
এ অশান্তি কবে দেব, হবে দূরীভূত!...
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি!...
তবে বল কবে গিরি, হবে সেইদিন
যে দিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ!
সেদিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়।

তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।
নিশা তারে ঝিল্লীরবে পাড়াইত ঘুম,
পূর্ণিমার চাঁদ তার মুখের উপরে
তরল জোছনা-ধারা দিতেন ঢালিয়া,
স্নেহময়ী মাতা যথা সুপ্ত শিশুটির
মুখ পানে চেয়ে চেয়ে করেন চুম্বন।
প্রভাতের সমীরণে, বিহঙ্গের গানে
উষা তার সুখ-নিদ্রা দিতেন ভাঙ্গায়ে।
এইরূপে কি একটি সঙ্গীতের মত,
তপনের স্বর্ণময়-কিরণে প্লাবিত
প্রভাতের একখানি মেঘের মতন,
নন্দন বনের কোন অপ্সরা-বালার
সুখময় ঘুমঘোরে স্বপনের মত
কবির বালক কাল হইল বিগত।

যৌবনে যখনি কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।
প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে;
প্রভাতের-সমীরণ যথা চুপি চুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।
নদীর মনের গান বালক যেমন
বুঝিত, এমন আর কেহ বুঝিত না।
বিহঙ্গ তাহার কাছে গাইত যেমন,
এমন কাহারো কাছে গাইত না আর।

তার কাছে সমীরণ যেমন বহিত
এমন কাহারো কাছে বহিত না আর।
যখনি রজনী-মুখ উজলিত' শশী,
সুপ্ত বালিকার মত যখন বসুধা
সুখের স্বপন দেখি হাসিত নীরবে;
বসিয়া তটিনী তীরে দেখিত সে কবি,
স্নান করি জোছানায় উপরে হাসিছে
সুনীল আকাশ, হাসে নিয়ে স্রোতস্বিনী;
সহসা সমীরণের পাইয়া পরশ
দুয়েকটি ঢেউ কভু জাগিয়া উঠিছে;
ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবসের আলোকে সকলি অনাবৃত,
সকলি রয়েছে খোলা চখের সমুখে,
ফুলের প্রত্যেক কাঁটা পাইবে দেখিতে।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি পানে,
কাঁটা খোচা কর্দ্দমাক্ত বীভৎস জঙ্গল
তোমার চখের পরে হবে প্রকাশিত;
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের যন্ত্র-চক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি।
কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-মন্ত্র
পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে,
সকলি দেখায় যেন রহস্যে পূরিত;
সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন;
ওই স্তব্ধ নদী-জলে চন্দ্রের আলোকে
পিছলিয়া চলিতেছে যেমন তরণী,
তেমনি সুনীল ওই আকাশ সলিলে
ভাসিয়া চলেছে যেন সমস্ত জগৎ;
সমস্ত ধরারে যেন দেখিয়া নিদ্রিত,
একাকী গম্ভীর-কবি নিশাদেবী ধীরে
তারকার ফুলমালা জড়ায়ে মাথায়,

ভারতী ১২৮৪ পৌষ সংখ্যার কবি-কাহিনীর এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য্য।"

কবি-কাহিনীর গ্রন্থাকারে প্রকাশ-প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু[১] এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না কিন্তু তখন আমার মনে যে-ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনোমতেই বলা যায় না। দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বইলেখকের কাছে নহে, বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায়, সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।"

সাহিত্যসংসারে এই কাব্যের সমাদর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির একটি খসড়ায়[২] উল্লেখ করিয়াছেন যে

"...বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বান্ধব' পত্রে এই কাব্য-সমালোচন উপলক্ষ্যে লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।[৩] খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম।"

> প্রকৃতির সব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে,
> এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে,
> পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
> পৃথিবীর সে অবস্থা আসে নি এখনো,
> কিন্তু এক দিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।..."
>
> সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল
> বৃদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত!
>
> —কবি-কাহিনী, চতুর্থ সর্গ

১ গ্রন্থের আখ্যাপত্রে প্রকাশকরূপে উল্লিখিত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

২ "জীবনস্মৃতির খসড়া", বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০।

৩ শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত জীবনস্মৃতিতে এই সমালোচনাটির

পুনর্মুদ্রণ

'আমার রচনার আবর্জিত অংশ অনেকদিন আমি প্রচ্ছন্ন রেখেছিলুম'— কবি-কাহিনী, বন-ফুল প্রভৃতি এই অংশেরই অন্তর্গত।

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশকালে অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এগুলি পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেন— রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের (১৯৪০) অন্তর্গত হইয়া কবি-কাহিনী প্রথম প্রকাশের বাষট্টি বৎসর পর প্রথম পুনর্মুদ্রিত হয়।

স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে কবি-কাহিনী আর মুদ্রিত হয় নাই।

প্রাসঙ্গিক অংশ পুনর্মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি অন্য কোনো-কোনো গ্রন্থেও সংকলিত হইয়াছে। জীবনস্মৃতি-সম্পাদক ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বান্ধব পত্রে 'উদয়োন্মুখ কবি' বলিয়া রবীন্দ্রনাথ অভিহিত হন বস্তুতঃ রুদ্রচণ্ড গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ; এই সমালোচনাটিও তিনি জীবনস্মৃতিতে মুদ্রিত করিয়াছেন।

বন-ফুল। / কাব্যোপন্যাস। / "অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ।" / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। / শ্রীমতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / গুপ্তপ্রেশ; / ২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট;—কলিকাতা। / ১২৮৬ সাল।

পৃষ্ঠাসংখ্যা॥ আখ্যাপত্র [/০-৵০], 'অশুদ্ধ সংশোধন' [৶০], বিজ্ঞপ্তি 'কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী ও চিনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের / দোকানে প্রাপ্তব্য।' [।০], ৯৩।

প্রকাশ [৯ মার্চ ১৮৮০ ।] মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য আট আনা।

বন-ফুল গ্রন্থাকারে কবি-কাহিনীর পরে প্রকাশিত হইলেও সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল কবি-কাহিনীর পূর্বে, রচনাও পূর্ববর্তী বলিয়া অনুমেয়। ইহা আট সর্গে সমাপ্ত— গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রে ১২৮২-৮৩ সালে নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়—

১২৮২॥ অগ্রহায়ণ, মাঘ, চৈত্র
১২৮৩॥ জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক

রচনা স্বাক্ষরহীন।

ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"১২৮২ সালে প্রথম বাহির হইলেও 'বনফুল' লেখা হইয়াছিল আরো আগে। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন— জ্ঞানাঙ্কুরে বাহির হইবার 'বেশ কিছুদিন আগে' ইহা লেখা হয়।[১] যদি এক বছর পূর্বে লেখা হইয়া থাকে তবে, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেরো বছর।"

জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে[২] বন-ফুল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"এমনি সময়টাতে জ্ঞানাঙ্কুর বলিয়া একটি কাগজ বাহির হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমার সেই বাল্যের কবিতাগুলিও সম্পাদক মহাশয় আবর্জ্জনার

---

১ শান্তিনিকেতনে কথাবার্তায়, ১০ই ডিসেম্বর ১৯২১। দ্রষ্টব্য "রবীন্দ্র-পরিচয়", প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৮।

২ "জীবনস্মৃতির খসড়া", বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০।

বন-ফুল।

কাব্যোপন্যাস।

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

শ্রী মতিলাল মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেস;

২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

১২৮৬ সাল।

বন-ফুল গ্রন্থের আখ্যাপত্র। প্রতিলিপি মূল গ্রন্থের আকারে।

হউক এরূপ প্রয়োজনীয় পুস্তকের দোষানুসন্ধান করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উক্তবিধ দোষ সমস্ত স্বত্ত্বেও ইহা যে এক খানি বঙ্গভাষায় আদর যোগ্য পুস্তক হইয়াছে তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। এতদ্রূপ প্রয়োজনীয় পুস্তক সংকলন জন্য কার্ত্তিকেয় বাবু অবশ্যই কৃতজ্ঞতা ভাজন ইহা বলা বাহুল্য।

বন ফুল।

কাব্য।

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলনং কররুহৈঃ।"

১ম সর্গ।

চাইনা জ্ঞোন, চাইনা জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে
শুকায়ে যেতাম বনের কোলে!

"দীপ নির্ব্বাণ"

নিশার আঁধার রাশি করিয়া নিরাস
রজত সুষমাময়, প্রদীপ্ত তুষার চয়
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ
অসংখ্য শিখর মালা বিশাল মহান্;
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্ত সীমায় গিয়া যেন অবসান!
শিরোপরি চন্দ্র সূর্য্য, পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন;
তুষারে আবরি শির, ছেলে খেলা পৃথিবীর
ভ্রূক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন
কত নদী কত নদ, কত নির্ঝরিণী হ্রদ
পদতলে পড়ি তার করে আস্ফালন!
মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে, দেখে রয় স্তব্ধ হয়ে
অবাক্ হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন!

চৌদিকে পৃথিবী ধরা নিদ্রায় মগন,
তীব্র শীত সমীরণে, দুলায়ে পাদপগণে
বহিছে নির্ঝর-বারি করিয়া চুম্বন,
হিমাদ্রি শিখর শৈল করি আবরিত
গভীর জলদরাশি, তুষার বিভায় নাশি
স্থির ভাবে হেথা সেথা রয়েছে নিদ্রিত।
পর্ব্বতের পদতলে, ধীরে ধীরে নদী চলে
উপল রাশির বাধা করি অপগত,
নদীর তরঙ্গ কুল, সিক্ত করি বৃক্ষ মুল
নাচিছে পাষাণ-তট করিয়া প্রহৃত!
চারি দিকে কত শত, কল কলে অবিরত
পড়ে উপত্যকা মাঝে নির্ঝরের ধারা।
আজি নিশীথিনী কাঁদে, আঁধারে হারায়ে চাঁদে
মেঘ ঘোমটায় ঢাকি কবরীর তারা।

কম্পনে! কুটীর কার তটিনীর তীরে
তরুপত্র ছায়ে ছায়ে, পাদপের গায়ে গায়ে
ডুবায়ে চরণ-দেশ স্রোতস্বিনী নীরে?
চৌদিকে মানব-বাস নাহিক কোথায়
নাহি জন কোলাহল, গভীর বিজন-স্থল
শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে ঘুমায়!
কুসুম-ভূষিত-বেশে, কুটীরের শিরোদেশে
শোভিছে লতিকা-মালা প্রসারিয়া কর,
কুসুমস্তবক রাশি, দুয়ার উপরে আসি
উঁকি মারিতেছে যেন কুটীর ভিতর!

জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বন-ফুলের আরম্ভাংশের প্রতিলিপি

ঝুড়িতে ফেলেন নাই। পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া "বনফুল" নামে যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম সেটি বোধকরি জ্ঞানাঙ্কুরে বাহির হইয়াছিল। এবং বছর তিন চার পরে দাদা সোমেন্দ্রনাথ অন্ধপক্ষপাতের উৎসাহে এটি গ্রন্থ আকারেও ছাপাইয়াওছিলেন। মনে একান্ত আশা ছিল এই কবিতাটিও অন্যান্য অনেকগুলি বাল্যকীর্ত্তির সহিত লোপ পাইয়াছে কিন্তু দুই এক খণ্ড বনফুল এখনো কোনো কোনো সঞ্চয়বায়ুগ্রস্ত পাঠকের হাতে আছে খবর পাইয়া হতাশ হইয়াছি। ইহাকে শাস্ত্রে বলে কর্ম্মফল।"

পুনর্মুদ্রণ

রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে (১৯৪০) প্রথম পুনর্মুদ্রিত। স্বতন্ত্র আকারে আর মুদ্রিত হয় নাই।

বাল্মীকি প্রতিভা। / গীতি-নাট্য। / বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে।/ রচিত ও অভিনীত। / কলিকাতা। / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তি দ্বারা / মুদ্রিত। / ফাল্গুন ১৮০২ শক।/ মূল্য ।০ চারি আনা।[১]

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ ১৩।

প্রকাশ [১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০

বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে প্রসন্নকুমার বিশ্বাস প্রকাশকরূপে উল্লিখিত, পুস্তকে প্রকাশকের নাম-ঠিকানা মুদ্রিত নাই।

বাল্মীকি-প্রতিভা রচনা ও অভিনয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"জ্যোতিদাদার পিয়ানো যন্ত্র যখন খুব চলিতেছে সেই সময়ে সেই উৎসাহেই কতক তাঁহার সুরে, কতক হিন্দি গানের সুরে বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলাম। তখন এই নাটক লিখিবার একটি উপলক্ষ্য ঘটিয়াছিল।

"বৎসরে একবার দেশের সমস্ত সাহিত্যিকগণকে একত্র করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের বাড়িতে 'বিদ্বজ্জনসমাগম'[২] নামক এক সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সম্মিলন উপলক্ষ্যে গানবাজনা আবৃত্তি ও আহারাদি হইত।

---

১ এই পুস্তিকার আখ্যাপত্র নাই, বিবরণ মলাট হইতে গৃহীত। লেখকের নামও কোথাও মুদ্রিত নাই— 'সরকারী দলিলে' (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে) গ্রন্থকার ও স্বত্বাধিকারীরূপে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল, বোধ হয় তাহার ফলেই "চন্দ্রনাথ বসুর মতো প্রতিষ্ঠাপন্ন তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পরিচিত থাকা সত্ত্বেও 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রকাশ ও অভিনয়ের বছরখানেক পরেও" বাংলা বইয়ের প্রতিবেদনে ইহাকে দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় তাঁহার "সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা" প্রবন্ধে এ-সকল দেখাইয়াছেন। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত সংস্করণেও মলাটে যে বিবরণ আছে তাহাতে বা গ্রন্থের অন্যত্র, গ্রন্থকারের নাম নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে অবশ্য এই সংস্করণের বিবরণে লেখকরূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ আছে।

২ 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্র হইতে সংগৃহীত তথ্য জীবনস্মৃতির

"দ্বিতীয় বৎসরে দাদারা এই সম্মিলনে একটি নাট্যাভিনয় করিবার ইচ্ছা করিলেন। কোন্ বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিলে এই সভার উপযুক্ত হইবে তাহারই আলোচনাকালে দস্যুরত্নাকরের কবি হইবার কাহিনীই সকলের চেয়ে সংগত বলিয়া বোধ হইল। ইহার কিছু পূর্বেই আর্যদর্শনে বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সংগীত বাহির হইয়া আমাদের সকলকেই মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এই কাব্যে বাল্মীকির কাহিনী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহারই সঙ্গে দস্যু রত্নাকরের বিবরণ জড়াইয়া দিয়া এই নাটকের গল্পটা একরূপ খাড়া হইল। তাহার পর জ্যোতিদাদা বাজাইতে লাগিলেন, আমি গান তৈরি করিতে লাগিলাম এবং অক্ষয়বাবুও মাঝে মাঝে যোগ দিলেন।[১] অক্ষয়বাবুর রচিত দুই-তিনটি গান বাল্মীকিপ্রতিভার মধ্যে আছে।

"তেতালার ছাদের উপর পাল খাটাইয়া স্টেজ বাঁধিয়া বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হইল। আমি সাজিয়াছিলাম বাল্মীকি। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভার নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়াছে। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন— অভিনয়মঞ্চ হইতে আমি তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাইলাম না কিন্তু শুনিতে পাইলাম তিনি খুসি হইয়া গিয়াছিলেন।"[২]

গ্রন্থপরিচয়ে সমাহৃত আছে। বিদ্বজ্জন-সমাগম সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি রচনা শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-সাগরসংগমে' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

১ এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর-রচনা করিতাম। আমার দুইপার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র [চৌধুরী] ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর-রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম।··· রবীন্দ্রনাথের···"কালমৃগয়া" গীতিনাট্য এবং তাঁহার···"বাল্মীকি-প্রতিভা" গীতিনাট্যেও উক্তরূপে রচিত সুরের, অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।"

—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', পৃ. ১৫৫-৫৬

২ জীবনস্মৃতি, প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮, পৃ ৩১৯। "গ্রন্থপ্রকাশের সময়

জীবনস্মৃতির 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এই নাট্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

'সারদামঙ্গল' ও 'বাল্মীকিপ্রতিভা'

জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"সারদামঙ্গলের আরম্ভ-সর্গ হইতেই বাল্মীকিপ্রতিভার ভাবটা আমার মাথায় আসে এবং সারদামঙ্গলের দুই একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকিপ্রতিভায় গানরূপে স্থান পাইয়াছে।" এই প্রসঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত উক্তিতেও অনুরূপ মন্তব্য আছে। জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—"ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গলসংগীতের দুই-এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।"

ইহার পূর্বেও একাধিকবার অনুরূপ স্বীকৃতি করিয়াছেন—

'গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৩০০) গ্রন্থের বিজ্ঞাপন॥ "ইহার সহিত বাল্মীকি-প্রতিভা নামক একটি গীতিনাট্য সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া গেল। কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত সারদামঙ্গল নামক কাব্য পাঠ করিয়া উক্ত গীতিনাট্যের ভাব আমার মনে উদয় হয়। এমন কি দুই একটি গানে সারদামঙ্গলের অনেকগুলি পদ প্রায় অবিকৃতভাবেই রক্ষিত হইয়াছে, এজন্য বিহারীবাবুর নিকট আমি ঋণী আছি।··· ১০ই চৈত্র, ১২৯৯।"

'বিহারীলাল' প্রবন্ধ, সাধনা আষাঢ় ১৩০১। আধুনিক সাহিত্য॥ "এই প্রসঙ্গে আমার সেই কাব্যগুরুর নিকট আর-একটি ঋণ স্বীকার করিয়া লই। বাল্যকালে বাল্মীকিপ্রতিভা-নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া বিদ্বজ্জন-সমাগম-নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।[১] সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্য্যন্ত বিহারীলালের সারদা-মঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।"

এই অংশ বর্জিত হয় এবং 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নামে স্বতন্ত্র অধ্যায়টি সংযোজিত হয়।"—জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয়

১ এই প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য। অভিনয়স্থলে উপস্থিত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্যান্য মনীষীদের মনে এই অভিনয় যে রেখাপাত করিয়াছিল তাহার বিবরণ ইহাতে সংকলিত আছে।

'কাব্য গ্রন্থাবলী'র (১৩০৩) ভূমিকা॥ "বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য লেখকের বাল্যরচনা। ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত সারদামঙ্গল কাব্য হইতে ইহার কতক কতক ভাব এমন কি, ভাষা সংগ্রহ করিয়াছিলাম—সেজন্য কবির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।...১৫ আশ্বিন ১৩০৩।"

সারদামঙ্গল। সর্গ ১ স্তবক ২০

এস মা করুণারাণী
ও বিধু-বদন-খানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরি গো আবার ;
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার।

বাল্মীকি-প্রতিভা, বাল্মীকি-কর্তৃক সরস্বতী বন্দনা,
'হৃদয়ে রাখ', গো দেবি, চরণ তোমার।'

এস, মা করুণারাণী, ও বিধুবদন খানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার।

সারদামঙ্গল। পূর্বোদ্ধৃত স্তবক

যাও লক্ষ্মী অলকায়
যাও লক্ষ্মী অমরায়
এস না এ যোগী-জন-তপোবন-স্থলে।

বাল্মীকি-প্রতিভা, বাল্মীকি-কর্তৃক লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান
'কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা'

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসনা এসনা, এসনা এ দীন জন কুটীরে।

সারদামঙ্গল। সর্গ ১ স্তবক ৩৩

অদর্শন হ'লে তুমি,
ত্যেজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে ;

হেরে মোরে তরু লতা
বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুম কুল বন-ফুল-বনে।
'হা দেবী, হা দেবী', বলি
গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি ;
নীরবে হরিণীবালা ভাসিবে নয়নজলে ॥

বাল্মীকি-প্রতিভা, পূর্বোল্লিখিত সরস্বতী-বন্দনা

অদর্শন হ'লে তুমি, ত্যেজি লোকালয় ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে,
হেরে মোরে তরুলতা, বিষাদে কবে না কথা
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুল-বনে।
"হা দেবী, হা দেবী" বলি, গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি,
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির আসার,…[১]

বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে।" পূর্বোদ্ধৃত তাঁহার মন্তব্যেও আছে—"অক্ষয়বাবুর রচিত দুই-তিনটা গান বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে আছে।" ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 'এই প্রসঙ্গে' লিখিয়াছেন[২]—

---

১ শ্রীসুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "আরও দুইটি গানে সারদামঙ্গলের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।" দ্রষ্টব্য 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৩১

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, "হৃদয়ে রাখ, গো দেবি, চরণ তোমার" পরবর্তী-কালে বাল্মীকি-প্রতিভা হইতে বর্জিত হয়। বর্তমানে গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে "নাট্যগীতি" বিভাগে গানটি ও স্বরবিতান ৫১ খণ্ডে তাহার স্বরলিপি মুদ্রিত আছে।

২ 'রবীন্দ্রস্মৃতি', ১৩৬৭, পৃ. ২৩-২৪। গান দুটি বাল্মীকি-প্রতিভার দ্বিতীয় তথা বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণের অন্তর্গত।

"সপরিবার অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা থেকে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।[১] তাঁর রচিত কতকগুলি গান সশরীরে রবিকাকার গীতিনাট্যে স্থান পেয়েছে, যেমন 'রাঙা পদপদ্মযুগে' ও 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথায়"।[২]

---

১ এই ঘনিষ্ঠতার বিবরণ নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে—

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি';

শরৎকুমারী চৌধুরাণী, 'রচনাবলী', "ভারতীর ভিটা" প্রবন্ধ;

রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', "অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী" অধ্যায় ও অন্যত্র।

জীবনস্মৃতি-সম্পাদক লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ওই গ্রন্থের 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়ে "তখনকার কালের ইংরেজি-সাহিত্যশিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে যিনি আমাদের কাছে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন…' এই বর্ণনার উদ্দিষ্ট অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে—

"তখন [কিশোরবয়সে] আমার কাব্যলেখার আর একটি আদর্শ ছিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী… ইঁহার সদ্য রচনাগুলি সর্ব্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইঁহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।"—"জীবনস্মৃতির খসড়া", বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা ভারতী পত্রের ১২৮৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রথম রচনা, "তাহারই প্রসঙ্গক্রমে" ওই সংখ্যার শেষ রচনা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর "অভিমানিনী নির্ঝরিণী" কবিতা। প্রভাতসংগীতের প্রথম সংস্করণেও দুইটি কবিতাই মুদ্রিত হইয়াছিল—"উভয়ের মধ্যে যে একটি আজন্ম-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন না করিয়া দুটিকেই একত্রে রক্ষা করিলাম।" —গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন, প্রভাতসঙ্গীত, প্রথম সংস্করণ।

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, 'পূরবী'র সঞ্চিতা অংশে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের "পত্র" ("সৃষ্টিপ্রলয়ের তত্ত্ব লয়ে তুমি আছ মত্ত") কবিতাটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদ্দেশে লিখিত।—'রবীন্দ্রকথা', পৃ. ১৯৭। কবিতাটি পূর্বে ভারতী ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়— রচনা-স্থান ও কাল দেওয়া আছে বনক্ষেত্র ["Woodlands"], শিমলাশৈল, শনিবার ১৮৯৮। পূরবীতে রচনাকাল জ্যৈষ্ঠমাস অনুমিত হইয়াছিল।

২ শ্রীসুকুমার সেন লিখিয়াছেন—

"রচনাভঙ্গি অনুসারে 'এখন কর্ব্ব কি বল!' 'তবে আয় সবে আয়…'এবং

স্বপ্ন-প্রয়াণ ও বাল্মীকি-প্রতিভা

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছেন—

"আমি ঘরের একটি কোণে বসিয়া বা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা [স্বপ্নপ্রয়াণ] শুনিবার চেষ্টা করিতাম।… স্বপ্নপ্রয়াণ বারম্বার শুনিয়া তাহার বহুতর স্থান আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল…।"[১]

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র 'এই-যে হেরি গো দেবী আমারি' গানে "দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ (অক্টোবর ১৮৭৫) কাব্যের 'জয় জয় পরব্রহ্ম' গানটির কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।"[২]

স্বপ্ন-প্রয়াণ

মহা কবি! আদি কবি!
ছন্দে উঠে শশি-রবি,
ছন্দে পুন' অস্তাচলে যায়॥
তারকা কনক-কুচি,
জলদ্-অক্ষর-রুচি
গীত-লেখা নীলাম্বর-পাতে।

বাল্মীকি-প্রতিভা

ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদিছে,
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে,
জলন্ত কবিতা তারকা সবে ;

প্রথম অভিনয়ের তারিখ

শ্রীসুকুমার সেন লিখিয়াছেন—

"জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে যেদিন বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম অভিনয় হয়

'কালী কালী বলো রে আজ'— এই তিনটি গান অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা বলিয়া মনে করি।"—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮, পৃ. ২৩১

১ "জীবনস্মৃতির খসড়া", বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০, পৃ. ১১৮। ওই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো লিখিয়াছেন, "তথাপি আমার লেখার তাহার নকল ওঠে নাই।"

২ গীতবিতান, তৃতীয় খণ্ড, শ্রীকানাই সামন্ত লিখিত গ্রন্থপরিচয়।

সেদিন দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ও ছিলেন। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইনি একটি কবিতা লিখেন 'বালিকা-প্রতিভা' নামে। ইহা রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'অবসর-সরোজিনী'তে সঙ্কলিত আছে। কবিতাটিতে যে পাদটীকা আছে তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে ১৬ই ফাল্গুন ১২৮৭ [২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১] শনিবার দিবসে বাল্মীকি-প্রতিভা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।"[১]

১৭ ফাল্গুন ১২৮৭, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ সংখ্যা সাধারণী পত্রে এই 'সংবাদ'টি প্রকাশিত হইয়াছিল—

"কল্য শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতার জোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে "বিদ্বজ্জন সমাগম" হইয়াছিল। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্যারীমোহন মিত্র, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, বাবু শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার বি, এল, গুপ্ত, মিষ্টার টি, এন, পালিত, আচার্য্য শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাক্তার কানাইলাল দে, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি বহুতর আহূত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর বাড়ীর ছোট ছোট গুটিকত বালক বালিকা সঙ্গীত-যন্ত্রের সুরের সঙ্গে বেশ সুস্বরে গান করিয়াছিলেন। তাহার পর "বাল্মীকি প্রতিভা" নামে একখানি অভিনব গীতিকাব্য অভিনীত হয়। বাল্মীকি সরস্বতী কৃপায় দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কিরূপে অমর কবিত্ব লাভ করেন তাহা প্রদর্শন করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং বাল্মীকি হন আর "প্রতিভা" নাম্নী প্রতিভা-সম্পন্না তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয়া ভ্রাতুষ্কন্যা বাগ্‌দেবী রূপে অভিনয় করেন। বঙ্গ কুল-কুমারী কর্ত্তৃক রঙ্গ-বেদী এই প্রথম উজ্জ্বলীকৃত হইল। বঙ্গ রঙ্গ-ভূমির নব কলেবরের এই অভিষেক ক্রিয়ার প্রতিভা উপযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী বটেন। তিনি সুকণ্ঠা, গীতি নিপুণা, সতেজ-নয়না এবং ধীর-পদ বিক্ষেপ-কারিণী। তাঁহার গীতাভিনয়ে দর্শক বৃন্দের অনেকে বিস্মিত এবং প্রীত হইয়াছিলেন।"[২]

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০, পৃ. ১৬৩। রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতাটি পাদটীকাসহ প্রথমে ১২৮৮ বৈশাখ সংখ্যা আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হয়।

২ 'বহুরূপী' পত্রের রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যাতেও উদ্‌ধৃত।

বাল্মীকি প্রতিভা।

গীতি-নাট্য।

বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে।

রচিত ও অভিনীত।

কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তি দ্বারা

মুদ্রিত।

ফাল্গুন ১৮০২ শক।

মূল্য ।০ চারি আনা।
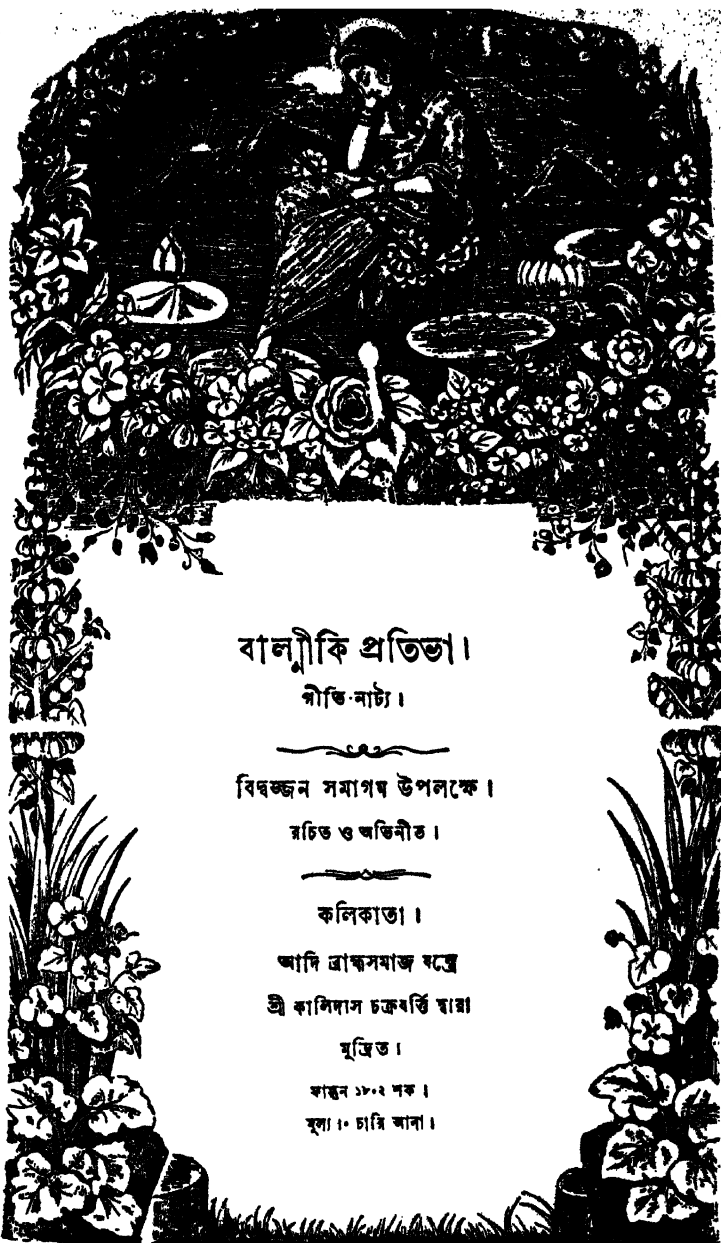
'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রথম সংস্করণের মলাট

ইহাতে ব্যবহৃত সরস্বতী-চিত্র 'ভারতী' পত্রের মলাট হইতে গৃহীত

রবীন্দ্র-ভারতী সমিতির সৌজন্যে

অভিনয়স্মৃতি

নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে রবীন্দ্রনাথ-অনুষ্ঠিত বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয়ের স্মৃতি[১] লিপিবদ্ধ আছে—

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘরোয়া'

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথের কথা'

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, 'রবীন্দ্র-স্মৃতি'

স্বরলিপি

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত স্বরলিপি ১৩৩৫ সালের আশ্বিন মাসে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পুনর্মুদ্রণ/সংস্করণ

১২৯২ সালে বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মলাট হইতে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল—

বাল্মীকি-প্রতিভা। /গীতি-নাট্য। /দ্বিতীয় সংস্করণ। /কলিকাতা/ ৫৫ নং চিৎপুররোড। / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত / ও প্রকাশিত। / ফাল্গুন ১২৯২ সাল। / মূল্য ।০ চারি আনা।[২]

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ ২৯।

প্রকাশ [২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০

'ফাল্গুন ১২৯২' তারিখে প্রকাশিত কতকগুলি কপিতে 'দ্বিতীয় সংস্করণ' শব্দ দুইটি নাই, তাহা ছাড়া মলাট, পৃষ্ঠাসংখ্যাদি অনুরূপ।[৩]

প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই দ্বিতীয় সংস্করণও অভিনয়ের প্রাক্‌কালে মুদ্রিত, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে।

---

১ রাজকৃষ্ণ রায়ের "বালিকা-প্রতিভা" কবিতার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে 'বালিকা'-বেশিনী প্রতিভা দেবীর প্রশস্তি।

২ এই সংস্করণের এক কপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারে আছে।

৩ রবীন্দ্রভারতী-সমিতির গ্রন্থাগারে ইহার এক কপি আছে।

বাল্মীকি-প্রতিভার এই দ্বিতীয় সংস্করণ ওই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা বহুপরিবর্ধিত; দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (পৃ. ২, পাদটীকা) উল্লিখিত আছে যে, "অনেকগুলি গান পরিবর্ত্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে 'কাল মৃগয়া' গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।" জীবনস্মৃতিতেও লিখিয়াছেন—"পরে, এই [কাল মৃগয়া] গীতনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া ছিলাম···।" বনদেবীদের চরিত্রও কালমৃগয়া হইতে নূতন লওয়া হইয়াছে।

অতঃপর বাল্মীকি-প্রতিভা সাধারণত গ্রন্থাবলী বা গীতসংগ্রহের অন্তর্গত হইয়াই প্রকাশিত হইতে থাকে, যথা—'গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৮৯৩); 'কাব্য গ্রন্থাবলী' (১৮৯৬)[১] ; কাব্যগ্রন্থ, ৮ম ভাগ (১৯০৩), 'গান' অংশে; 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' (১৯০৪), "গান" অংশে; 'গান' (১৯০৮); 'গান' (১৯০৯); 'কাব্যগ্রন্থ', দশম খণ্ড (১৯১৬), 'গান' অংশে; গীতবিতান প্রথম খণ্ড (১৩৩৮)। বর্তমানে বাল্মীকি-প্রতিভা গীতবিতান তৃতীয়খণ্ডভুক্ত; রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডেও বাল্মীকি-প্রতিভা মুদ্রিত আছে। এ-সকল দ্বিতীয় সংস্করণেরই অনুবৃত্তি; তবে পরবর্তীকালে, সম্ভবত 'গান' (১৯০৮) পুস্তকে ও তদবধি, 'হৃদয়ে রাখ, গো দেবি, চরণ তোমার' বর্জিত হইয়াছে তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে; বর্তমানেও উহা বর্জিত।

এই-সকল সংগ্রহ-গ্রন্থ ব্যতীত, সম্ভবতঃ অভিনয়পত্রীরূপে বাল্মীকি-প্রতিভা একাধিকবার স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে উল্লিখিত ইহার একখানির প্রকাশকাল ১৬ মার্চ ১৯১২, মুদ্রণসংখ্যা ৫০০।[২]

১ এই গ্রন্থে বাল্মীকি-প্রতিভার সূচনায় লিখিত হইয়াছে, "এই গীতিনাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুর লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শন -যোগ্য। গ্রন্থাবলীর অসম্পূর্ণতা দোষ নিবারণের জন্য ইহাকে স্থান দেওয়া গেল।"

২ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার *On the Edges of Time* (1958) গ্রন্থে এইবারের অভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; ১৯১২ সালে মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথের যে বিলাতযাত্রার কথা ছিল তাহার পূর্বরাত্রে এই অভিনয় হয়—

"The evening before the boat sailed there was a party at Sir Ashutosh Chaudhuri's palatial residence, where a performance of father's operatic play *Balmiki Pratibha* was given. Preparations had been going on for a long time and

অভিনয়-উপলক্ষে ব্যবহারার্থ পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র মুদ্রিত 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র একটি সংস্করণে অবনীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট হয়, এজন্য ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১]

বাল্মীকি-প্রতিভা প্রথম সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

কোন্ কোন্ গান কালমৃগয়া হইতে গৃহীত, কোন্ কোন্ গান দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন যুক্ত তাহার একটি তালিকা নিম্নে মুদ্রিত হইল।[২]

কালমৃগয়া হইতে বিশুদ্ধ বা পরিবর্তিত আকারে গৃহীত গান

আঃ বেঁচেছি এখন
এনেছি মোরা এনেছি মোরা
রিম ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে

Dinendranath had been chosen to play the part of Balmiki. Father, of course, had to be present. We came back late at night. Instead of going to bed Father sat down to write letters for the remainder of the night. In the early hours of the morning we found him to our dismay on the verge of collapse..."। বিলাতযাত্রা স্থগিত হয়।

১ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত ইংরেজি প্রোগ্রাম দর্শনে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সাহায্যার্থে সংগীতসংঘের উদ্যোগে ১৯১৪ সালে ৮ ডিসেম্বর কলিকাতায় থিয়েটার রয়্যালে এই অভিনয় হয়। অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরও (তিনি অভিনয়ে 'দস্যু'দলভুক্ত ছিলেন) অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তাঁহার 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' গ্রন্থে "নাট্যস্মৃতি" বিভাগে এই অভিনয়ের স্মৃতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯১২ সালের অভিনয়ের ন্যায় এইবারেও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্মীকির অভিনয় করিয়াছিলেন।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৯১২ ও ১৯১৪ উভয় বারের অভিনয়েই তিনি 'দস্যু'দলভুক্ত ছিলেন) এই সচিত্র বাল্মীকি-প্রতিভা বর্তমান সংকলয়িতাকে দেখিতে দিয়াছেন।

২ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস -লিখিত 'রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৬৯) বাল্মীকি-প্রতিভা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য নানা তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই বেলা সবে মিলে চল হো, চল হো
গহনে গহনে যা রে তোরা
চল্ চল্ ভাই
কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে
সর্দার মশয় দেরি না সয়

দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন গান

সহে না সহে না কাঁদে পরাণ
ওই মেঘ করে বুঝি গগনে
মরি ও কাহার বাছা
রাঙা পদপদ্মযুগে
কি দোষে বাঁধিলে আমায়
ছাড়ব না ভাই ছাড়ব না ভাই
রাজা মহারাজা কে জানে
আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা
আঃ কাজ কি গোলমালে
এত রঙ্গ শিখেছ কোথায় মুণ্ডমালিনী
অহো আস্পর্দ্ধা একি তোদের নরাধম
আয় মা আমার সাথে
কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই
কেন রাজা ডাকিস কেন
বলব কি আর বলব খুড়ো
রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু
দেখ্ দেখ্ দুটো পাখী বসেছে গাছে
নমি নমি ভারতী
শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা
বাণী, বীণাপাণি করুণাময়ী

প্রথম সংস্করণের গান দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত

নিশুম্ভ-মর্দ্দিনী অম্বে

এই গানটির স্থলে 'রাঙা পদপদ্মযুগে' গানটি বসানো হইয়াছে। বর্জ্জিত গানটি এখানে মুদ্রিত হইল—

নিশুম্ভ-মর্দ্দিনী অম্বে,

মহা-সমর-প্রমত্ত মাতঙ্গিনী, কম্পে রণাঙ্গন পদভরে একি ?

থরহর মহী সমুদ্র, পর্ব্বত ব্যোম,

সুরনর শঙ্কাকুল কে এ অঙ্গনা !

ভগ্নহৃদয়। / (গীতি-কাব্য) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা / বাল্মীকি যন্ত্রে / শ্রী কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / শকাব্দা ১৮০৩।

পৃষ্ঠাসংখ্যা॥ আখ্যাপত্র, ভূমিকা [৪], উপহার ৵০, ১৯৬।

প্রকাশ [২৩ জুন ১৮৮১]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য এক টাকা।

১৯৬ পৃষ্ঠার পাদদেশে মুদ্রিত আছে—PRINTED BY K. K. CHAKRAVARTI AT THE VALMIKI PRESS, / 55, AMHERST STREET, CALCUTTA.

গ্রন্থখানি চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত; তন্মধ্যে ছয় সর্গ ভারতী পত্রে ১২৮৭ সালে কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রচনা স্বাক্ষরহীন।

গ্রন্থের 'ভূমিকা' এই—

"নিম্নলিখিত কাব্যটিকে কাহারো যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত; তাহাতে ফুল ফুটে, কিন্তু সে ফুলের সঙ্গে শিকড়, কাণ্ড, শাখা, পত্র কাঁটাটি পর্য্যন্ত থাকা আবশ্যক। নিম্নলিখিত কাব্যটি ফুলের তোড়া। গাছের আর সমস্ত বাদ দিয়া কেবলমাত্র ফুলগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপেই ফুলের কথা উল্লেখ করা হইল।"[১]

পুস্তকখানি পাত্র-পাত্রীর সংলাপসূত্রে গ্রথিত, সেইহেতু নাটকরূপে গৃহীত হইতে পারে, এই সম্ভাবনায় এই ভূমিকা।

গ্রন্থোৎসর্গ

'ভারতী'তে এই 'উপহার' মুদ্রিত হয়—

উপহার

রাগিণী— ছায়ানট

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক' পথহারা।

---

১ গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে এই ভূমিকার ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়।

যেথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল এ আঁখিপরে ঢাল' গো আলোক ধারা।
ও মুখানি সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে
আঁধারে হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা।
কখনো বিপদে যদি, ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি— এ ভগ্নহৃদয় খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিত ধারা।

এই 'উপহার' কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে [আদি] ব্রাহ্মসমাজ গৃহে 'একপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে' ১১ মাঘ প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে ব্রহ্মসংগীতরূপে গীত হয়;[১] তদবধি বিভিন্ন ব্রহ্মসংগীত-সংগ্রহে স্থান লাভ করিয়াছে।—

ব্রহ্মসংগীত-রূপটি এই—

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথ হারা।
যেথা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণ ধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।
কখন বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।

---

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮০২ শক, পৃ. ২১১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৭ সংস্করণ, পৃ. ১১১। গানটি মূলত আরো পূর্বে রচিত, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুরাতন পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে এইরূপ অনুমান করেন; পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮০

ভগ্নহৃদয় গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে নূতন 'উপহার' সন্নিবিষ্ট হয়, নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

উপহার

শ্রীমতী হে——,

১

হৃদয়ের বনে বনে সূর্য্যমুখী শত শত
ওই মুখ পানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক্, শুকায় শুকায়ে যাক্,
ওই মুখ পানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায়,
বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়!

২

জীবন-সমুদ্রে তব জীবন তটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর;
সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্ম্মি যত উঠে জাগি,
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া,
জানে বা না জানে কেউ, জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে— বিরাম পাবে— তোমার চরণে গিয়া।

৩

হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হইনাক' তাহারি অটল বলে,
নহিলে হৃদয় মম ছিন্ন ধূমকেতু সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশ তলে!

৪

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে ;
পর পারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে ;
দিবস ফুরাবে যবে সে দেশে যাইতে হবে,
এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশি,
ফুরাইবে গীত গান, অবসাদে ম্রিয়মান,
সুখ শান্তি অবসান কাঁদিব আঁধারে বসি !

৫

স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ,
এ পারে দাঁড়ায়ে, দেবি, গাহিনু যে শেষ গান,
তোমারি মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়,
একটি নয়ন জল তাহারে করিও দান।
আজিকে বিদায় তবে, আবার কি দেখা হবে,
পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান ?

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনস্থিত মালতী পুঁথিতে আর-একটি "উপহারগীতি" আছে— পাশে লেখা আছে "ভগ্নহৃদয়"। কবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল ; ইহার শেষ ছত্র লক্ষণীয়।[১]

উপহারগীতি

ছেলেবেলা হোতে বালা, যত গাঁথিয়াছি মালা
যত বনফুল আমি তুলেছি যতনে
ছুটিয়া তোমারি কোলে, ধরিয়া তোমারি গলে
পরায়ে দিয়াছি সখি তোমারি চরণে।
আজো গাঁথিয়াছি মালা, তুলিয়া বনের ফুল
তোমারি চরণে সখি দিব গো পরায়ে—

১ শ্রীকানাই সামন্ত "রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি" প্রবন্ধে কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ভগ্নহৃদয়ের স্পষ্ট উল্লেখ না করিলেও কবিতাটি যে গ্রন্থোৎসর্গরূপে পরিকল্পিত তাহার সম্যক্ ইঙ্গিত দিয়াছেন।

না হয় ঘৃণার ভরে, দলিও চরণতলে
হৃদয় যেমন কোরে দলেছ দুপায়ে।
পৃথিবীর নিন্দাযশে, কটাক্ষ করি না বালা
তুমি যদি সোহাগেতে করহ গ্রহণ
আমার সর্ব্বস্বধন, কবিতার মালাগুলি
পৃথিবীর তরে আমি করিনি গ্রন্থন।
আমি যে সকল গান, গাইব মনের সুখে
সপ্তসুরে পূর্ণ করি এ শূন্য আকাশ
পৃথিবীর আর কেহ, শুনুক্ বা না শুনুক্
তুমি যেন শুন বালা, এই অভিলাষ।
তোমার লাগিবে ভালো, তুমি গো বলিবে ভালো
গলাবে তোমারি মন এ সঙ্গীত ধ্বনি
আমার মর্ম্মের কথা, তুমিই বুঝিবে সখি
আর কেহ না বুঝুক্ খেদ নাহি গণি
একদিন মনে পড়ে, যাহা তাহা গাইতাম
সকলি তোমার সখি লাগিত গো ভাল
নীরবে শুনিতে তুমি, সমুখে বহিত নদী
মাথায় ঢালিত চাঁদ পূর্ণিমার আলো।
সুখের স্বপন সম, সেদিন গেল গো চলি
অভাগা অদৃষ্টে হায় এ জন্মের তরে
আমার মনের গান মর্ম্মের রোদন ধ্বনি
স্পর্শও করে না আজ তোমার অন্তরে।
তবুও— তবুও সখি, তোমারেই শুনাইব
তোমারেই দিব সখি যা আছে আমার
দিনু যা' মনের সাথে তুলিয়া লও তা হাতে
ভগ্নহৃদয়ের এই প্রীতি উপহার।

তিনটি উপহার-কবিতাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

'শ্রীমতী হে'-র পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"আমরা শুনিয়াছি 'হে'— কাদম্বরী দেবীর কোনো ছদ্মনামের আদ্যক্ষর। কেহ কেহ বলেন তাঁহার ডাকনাম ছিল 'হেকেটি'।—ইনি প্রাচীন গ্রীকদের ত্রিমুণ্ডী দেবী। অন্তরঙ্গেরা রহস্যচ্ছলে এই নামটিতে ডাকিতেন। এই নারীর স্নেহ ও শাসন রবীন্দ্রনাথের যৌবনকে সুন্দরের পথে চালিত করিয়াছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁহারই পবিত্র স্মৃতি ছিল তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা।"[১]

সজনীকান্ত দাস বর্তমান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

" 'হে' কে, কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, তোমার কি মনে হয়? বলিলাম, হেমাঙ্গিনী। 'অলীকবাবু'তে আপনি অলীকবাবু ও কাদম্বরী দেবী হেমাঙ্গিনী সাজিয়াছিলেন।…তিনি স্বীকার করিলেন, ইহাই সত্য…।"[২]

"আমার এই আঠারো বছর বয়সের কবিতা সম্বন্ধে আমার ত্রিশ বছর বয়সের একটি পত্রে" রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন জীবনস্মৃতির "ভগ্নহৃদয়" অধ্যায়ে তিনি তাহা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন; জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে চিঠিখানির পূর্ণতর পাঠ আছে, নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

"ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধে নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে— সত্যকার পৃথিবী একটা আজ্‌গবি পৃথিবী হয়ে ওঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স যে আঠারো

---

১ রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৭, পৃ. ১১২। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এক পত্রে লিখিয়াছেন—

" 'হেকেটি' শোনা ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে।…'মালতী পুথি' বা ওই ধরনের পুঁথিতেও 'হেকেটি' শব্দটি আছে।…deflect করবার জন্য 'হেমাঙ্গিনী' সৃষ্টি বলেই মনে হয়। ১১।৭।১৯৬০।"

—শ্রীকানাই সামন্ত, 'রবীন্দ্রপ্রতিভা' (১৩৬৮), পৃ. ৩৮৯, পাদটীকা

২ "রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী", 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থ, ১৩৬৭, পৃ. ২৪৬

ছিল তা নয়, আমার আশেপাশের সকলেরই বয়স যেন আঠারো ছিল।[১] আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনারাজ্যে বাস করতেম। সেই কল্পনারাজ্যের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্যপদার্থ ছিল না। কেবল নিজেরই মনটা ছিল— তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত। তিল তাল হয়ে না উঠ্‌লেও মনের সন্তোষ হত না— মনে হত ঠিক উপযুক্ত হচ্ছে না।··· যা হোক সেই আঠারো বৎসর বয়সের দিকে চেয়ে দেখলে রাশি রাশি কুয়াশা দেখতে পাই। সেই অনির্দিষ্ট কুয়াশায় আমার তখনকার জীবন একটা অশ্রুময় ভাবে আর্দ্র করে রেখেছিল। আমার যে একটা অস্থির বিষাদের ভাব ছিল তার নির্দিষ্ট কোনো সত্য কারণ ছিল না— বরঞ্চ অনির্দ্দিষ্টতাই তার যথার্থ কারণ। মন কী চায় তা ঠিক ঠাওরাতে পারত না— কারণ চারিদিকের আকাশ আচ্ছন্ন ছিল, উপন্যাস এবং কাব্য থেকে যা জান্‌তে পেত সেইটেকেই আপনার মনে করত। অনেক সময় রোগের একটা নাম দিতে পারলেও আরাম পাওয়া যায়— আমার সে সময়কার মানসিক ভাবটা নিজের একটা নামকরণ করবার চেষ্টা করত। তার নিজের মধ্যে অবশ্যই একটা সত্য ছিল কিন্তু সে সত্যটা যে কি তা সে কিছুতেই ঠাওরাতে পারত না বলে আপনাকে পুঁথিসম্মত অন্য পাঁচ নামে পরিচয় দিয়ে মিথ্যা করে তুল্‌ত। কেবল যে মিথ্যা পরিচয় তা নয় তদনুসারে তাকে মিথ্যা অভিনয়ও করতে হত।"

"আমার পনেরো ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ তেইশ বছর পর্য্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে ইঁহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল"— জীবন-

---

১ "উক্ত চিঠির সবচেয়ে চমকদেওয়া পঙ্‌ক্তিটি গয়্‌ঠের উক্তির একটি ছত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যে আশ্চর্য রকম মিলে যায়। আমাদের মনে হয় সদ্য পাঠ করা গয়্‌ঠের রূপকটি অর্ধসচেতন মুহূর্তে প্রবেশ করেছে কবির নিজের লেখায়।···

Als ich achtzehn war, war Deutschland auch erst achtzehn: When I was eighteen, all my country was eighteen too. (February, 15, 1824).—*Goethe's Conversations with Eckermann.*"— শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "গয়্‌ঠে ও রবীন্দ্রনাথ", বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭

স্মৃতির "ভগ্নহৃদয়" অধ্যায়ে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত লিখিয়াছেন।— এই অংশের পূর্বতন পাণ্ডুলিপির পুনর্লিখনকালে বর্জিত একটি অনুচ্ছেদ—

"আমার হৃদয়ের আবেগ আমার কল্পনাবৃত্তি পরিণত শক্তি লইয়া বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে জীবনের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রেতের কীর্ত্তন করিয়াছিল তাহার কোনো চিহ্ন আমার কাছে আজ প্রীতিকর নহে এবং কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কাছে তাহা উপাদেয় হইতে পারে না।"— এই 'চিহ্ন' স্বরূপ পুস্তকও তাই তিনি পুনর্মুদ্রণ বা গ্রন্থাবলীভুক্ত করেন নাই।

ভগ্নহৃদয়ের সমাদর

ভগ্নহৃদয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—"বিলাতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল, তখন মনে হইয়াছিল, লেখাটা খুব ভালো হইয়াছিল।[১] লেখকের পক্ষে এরূপ মনে হওয়া অসামান্য নহে। কিন্তু, তখনকার পাঠকদের কাছেও এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই। মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার

১ জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থলে আছে— "তখন এই কাব্যটির প্রতি আমার বিশেষ একটা সগর্ব্ব মমত্ব জন্মিয়াছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করি নাই এবং গ্রন্থাবলীতেও ইহা স্থান পায় নাই।"

ইহা "সগর্ব্ব মমত্ব" অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই; গ্রন্থপ্রকাশের দশ বৎসর পরের (১২৯৮, ১৮৯১) একখানি চিঠিতে আছে—

"সল্লির [সরলা দেবীর] একখানা চিঠি পেয়েছি। সে আমার ভগ্নহৃদয় এবং রুদ্রচণ্ড সমালোচনা করে লিখেছে। পূর্বে ভগ্নহৃদয়ের পক্ষ অবলম্বন করে সে আমার সঙ্গে অনেক তর্ক করত— এবার আমার সঙ্গে তার মতের ঐক্য হয়েছে। অর্থাৎ ভগ্নহৃদয়ের অনেক নিন্দে করেছে। বলেছে ওর কবি মুরলা চপলা প্রভৃতিরা একটা কল্পনাকাননের লোক…"

—ছিন্নপত্রাবলী, ৩৬-সংখ্যক পত্র। সম্পূর্ণ চিঠিখানি পাওয়া যায় নাই।

কেন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই, বা গ্রন্থাবলীতে স্থান দেন নাই সে বিষয়ে পরে প্রিয়নাথ সেন -প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।" [১]

'রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয়' খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—('রবীন্দ্র কথা', পৃ ১৯৫)

"এই পুস্তক প্রকাশের পর যুবক মহলে, ছাত্র মহলে, রবীন্দ্রনাথের নাম পড়িয়া গেল। তিনি বাংলার "শেলী" হইলেন— তাঁহার বেশ, তাঁহার কেশ, তাঁহার চসমা সবই অনুকৃত হইতে লাগিল। তাহাই ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইল। আকাশে বাতাসে তখন 'রবিবাবু', কাব্যে এলো নূতন ছন্দ, উদাস ভাব।"

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্য রবীন্দ্রনাথকে সে যুগের যুবমহলে যশস্বী করিয়াছিল; অনেকে এই কাব্যের অংশবিশেষ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; এইরূপ

---

১ এই অভিনন্দনের কথা রবীন্দ্রনাথ পরেও বারংবার স্মরণ করিয়াছেন; সে-সকল রচনা 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' (১৩৬৮) গ্রন্থে শ্রীসত্যরঞ্জন বসু ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সযত্নে সংকলিত হইয়াছে। ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র দেববর্মা আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন— "প্রিয়তমা প্রধানা মহিষীর অকালমৃত্যুতে [১২৮৯] প্রৌঢ় বীরচন্দ্রের হৃদয় অসহনীয় প্রিয়া-বিরহ-শোকাকুল হইয়া পড়ে। তখন তিনি বিরহীর মর্মবেদনা কবিতার লহরে লহরে গাঁথিতে-ছিলেন।··· কবি বীরচন্দ্রের তখনকার মানসিক ভাবের সহিত 'ভগ্ন হৃদয়ে'র কবিতাগুলি সায় দিয়াছিল। গুণগ্রাহী বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের তখনকার এই কাঁচা লেখার মধ্যেও তাঁহার অন্তকার বিশ্ববিমোহন কাব্যপ্রতিভার প্রথম সূচনা দেখিতে পাইয়া, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বর্গীয় রাধারমণ ঘোষকে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করেন, 'ভগ্ন হৃদয়' কাব্য গ্রন্থ মহারাজকে প্রীত করিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের বা তাঁহার পরিবারের কাহারো সহিত মহারাজ বীরচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।"— "ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ", 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থ।

একজন সমসাময়িক যুবককে তাঁহার বৃদ্ধবয়সে দেখিয়াছি, তিনি কাব্যের বহু অংশ আবৃত্তি করিয়া গেলেন।”

প্রিয়নাথ সেন ও ‘ভগ্নহৃদয়’

“সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক” প্রিয়নাথ সেন, “যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমার কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল”, তিনি কিন্তু ভগ্নহৃদয় পড়িয়া উৎসাহিত হন নাই—রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, “ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন।” বইটির যে দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই, তাহা সম্ভবত অনেকাংশে ইঁহারই অনাগ্রহের ফলে। রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের সুহৃৎ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন—

“It was in deference to his [Preo Nath Sen's] unfavourable opinion that Rabindranath Tagore withdrew one of his carly works from circulation and it has never been reprinted.”[১]

সমসাময়িক পত্রিকার সমালোচনা

সাময়িক পত্রের একটি সমালোচনাও এখানে উদ্ধৃত হইল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ‘সাধারণী’ (১০ আশ্বিন ১২৮৮। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮১) লিখিয়াছেন—

“সমালোচনা।

“ভগ্ন হৃদয়। গীতি কাব্য। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতর কাব্য রুদ্রচণ্ড সমালোচনায় আমরা বলিয়াছিলাম যে ‘ইহার কোন কোন কবিতায় ফল্গু নদীর মত, কেমন এক থানি ধীরবাহিনী, নির্ম্মলা, অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনী থাকে, তবে কি না বালি খুঁড়িয়া, কোথাও পাথর ঠেলিয়া, কোথাও দলদাম সরাইয়া, স্রোত বাহির করিতে হয়।’ এ কাব্য সম্বন্ধেও আমরা তাহাই বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত কবি। কিন্তু তাঁহার ভাষা সকল স্থানে প্রাঞ্জল নহে। অদ্য ভগ্ন-হৃদয় হইতে দুই একটি উদাহরণ দিব।

১ ১৯২৭ মে সংখ্যা *The Modern Review* হইতে প্রিয়নাথ সেনের রচনাসংগ্রহ ‘প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি’র পরিশেষে উদ্ধৃত।

"২৮ পৃষ্ঠায়—

বিষণ্ণ অধর দুটি অতি ধীরে ধীরে টুটি
অতি ধীরে ধীরে ফুটে হাসির কিরণ।

"৩৬ পৃষ্ঠায়—

অধর দুটির শাসন টুটিয়া
রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,

"অধরোষ্ঠের যোগ ভঙ্গ করাকে অধর টুটা— বা অধরের শাসন টুটা— বলা ভাষার উপর একরূপ জবরদস্তি করা।

"২৯ পৃষ্ঠায়—

মেঘের দুঃস্বপ্নে মগ্ন দিনের মতন
কাঁদিয়া কাটিবে কিরে সারাটি যৌবন ?

নায়িকার হৃদয়ের কুহেলিকা বর্ণন করিতে গিয়া কবি প্রথম পঙ্‌ক্তির ভাষা সম্পূর্ণ প্রহেলিকাময়ী করিয়াছেন। শেলী প্রভৃতি ইংরাজ কবির ঐরূপ কুহেলিকা কোথাও কোথাও প্রশংসনীয় হয় বলিয়া— বাঙ্গালা ভাষায় ঐরূপ আবছায়া যে আদরের বস্তু তাহা নহে। কবি রবীন্দ্র স্বভাবের এই আধ ফুটন্ত ভাব বড় ভাল বাসেন। তাঁহার কাব্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে "জোছনা" আছে— তাহা ফুটফুটে জ্যোৎস্না নহে; মিটি মিটি ঘুমন্ত জোচ্ছনা— তাহা কবি বড় ভাল বাসেন। কবির এই প্রকৃতি হইতে তাহার কাব্যের ভাষাও স্থানে স্থানে কুহেলিকাময়ী হইয়া থাকে। তাহার পর, ৩১ পৃষ্ঠার "অস্তমান যামিনীর" মত দুঃসাহসের উদাসীনতা আছে। একে তো যামিনী অস্ত যায় না; তাহার উপর "অস্তমান যামিনী"— ভাষার উপর আর একরূপ জবরদস্তি।

"ভাষা সম্বন্ধে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে বলিয়া আমরা মাতৃভাষার উপর যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত না হই— ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা। কবি রবীন্দ্রের কাছেও আমাদের সেই একমাত্র ভিক্ষা।"

—সাধারণী, ১০ আশ্বিন ১২৮৮। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮১।

পরবৎসর 'সাধারণী'তে (১১ বৈশাখ ১২৮৯) লিখিত হয়—

"সাহিত্য-সমালোচন।

"কবিতাপুস্তক।

"শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রুদ্রচণ্ড, ভগ্নহৃদয় প্রভৃতি এবং বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত আমি রমণী, আর বৎসরের কবিতাকলাপ মধ্যে সর্ব্ব

প্রথমে উল্লেখ করিতে হয়। রবীন্দ্রের কবিতা ছায়াময়ী, তাঁহার স্বর ভাঙা ভাঙা, ছন্দ স্বাধীন এবং তাঁহার হৃদয় আবেগপূর্ণ। কিন্তু তিনি নূতন পথে যাইতে বিশেষ প্রয়াসী বলিয়া তাঁহার কবিত্ব বঙ্গ সাহিত্যে বদ্ধমূল হইতে পারিতেছে না।"

ভগ্নহৃদয়ের কয়েকটি গানের রচনাকাল

ভগ্নহৃদয়ের 'পত্তন' বিলাতে হইলেও, তাহার অন্তর্গত কতকগুলি গান ইতিপূর্বেই রচিত। এই প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতির অন্যতম পাণ্ডুলিপি[১] হইতে একটি অংশ উদ্ধারযোগ্য—

"[প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্বে আমেদাবাদে শাহিবাগ প্রাসাদে] সকলের উপরের তলায় একটি ছোটো ঘরে আমার আশ্রম ছিল। রাত্রেও আমি সেই নির্জন ঘরে শুইয়া থাকিতাম। শুক্লপক্ষের কত নিস্তব্ধ রাত্রে আমি সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এইরূপ একটা রাত্রে আমি যেমন খুসি ভাঙা ছন্দে একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম— তাহার প্রথম চারটে লাইন উদ্ধৃত করিতেছি।

'নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো!
ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!'[২]

ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্রছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে ছাপাইয়াছিলাম— কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে, সেই সাবরমতী-নদীতীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্মরজনীর কিছুই ছিল না। 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটা এম্‌নি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগসুরে বসাইয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম। 'শুন, নলিনী

---

১ "জীবনস্মৃতির খসড়া", বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০, পৃ. ১২১

২ 'ভগ্নহৃদয়', রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭০

খোলো গো আঁখি' 'আঁধার শাখা উজল করি'[১] প্রভৃতি আমার ছেলে-বেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই লেখা।"

পুনর্মুদ্রণ

রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে (১৩৪৭) ভগ্নহৃদয় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; স্বতন্ত্র আকারে আর মুদ্রিত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যে-সময় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের সহিত যুক্ত হন (১৯০৮ ?—) এবং যেকালে (১৯১১) ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে সন্ধ্যাসংগীত প্রভাতসংগীত প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থ কলিকাতা কান্তিক প্রেসে পুনর্মুদ্রিত হয় এই পর্বে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে ভগ্নহৃদয় পুনর্মুদ্রণেরও আয়োজন হইয়াছিল। ইহার সম্পূর্ণ প্রুফ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। এই প্রুফ রবীন্দ্রনাথ প্রথমে সংশোধন করিয়া পরিশেষে মন্তব্য করেন—"Rubbish!" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে লেখেন "দোহাই ধর্ম্মের এটা ছাপিয়ো না!!"[২] "ভগ্নহৃদয়ের কিছু কিছু অংশ মুক্ত কবিতারূপে 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র (১৩০৩) কৈশোরক ভাগে গৃহীত হইয়াছিল" —শ্রীসুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে (তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬৮; পৃ. ৪০, পাদটীকা) তাহার তালিকা দিয়াছেন। তাহার বিস্তার ও মূল নির্দেশ -পূর্বক মুদ্রিত হইল:

ভগ্নহৃদয়	কাব্যগ্রন্থ
প্রথম সর্গ। মুরলার উক্তি : "সূর্য্যমুখী ফুল সখি আমি ভালবাসি বড়"[৩]	বাসকসজ্জা
দ্বিতীয় সর্গ। শ্যামার প্রতি গান : "নাচ্ শ্যামা, তালে তালে"	শ্যামা

১ 'ভগ্নহৃদয়', রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬৫।

২ দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৫। এই দুইটি মন্তব্য-যুক্ত প্রুফের অংশ ১৩৭৩ সালে শারদীয়া দেশ পত্রিকায় (পৃ. ১৭) পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে।

৩ কয়েক ছত্র কাব্যগ্রন্থে বর্জিত।

ভগ্নহৃদয়

প্রথম সর্গ।

দৃশ্য—বন। চপলা ও মুরলা।

চপলা। সখি, তুই হলি কি আপনা-হারা?
এ ভীষণ বনে পশি, একেলা আছিস্ বসি
খুঁজে খুঁজে হয়েছি যে সারা।
এমন্ আঁধার ঠাঁই—জনপ্রাণী কেহ নাই
জটিল-মস্তক বট চারিদিকে ঝুঁকি।
দুয়েকটি রবি-কর সাহসে করিয়া ভর
অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি।
অন্ধকার চারিদিক হ'তে মুখ পানে
এমন তাকায়ে রয়, বুকে বড় লাগে ভয়,
কি সাহসে রয়েছিস বসিয়া এখানে?

মুরলা। সখি, বড় ভালবাসি এই ঠাঁই।
বায়ু বহে হুহু করি, পাতা কাঁপে থর থরি,
স্রোতস্বিনী কুলু কুলু করিছে সদাই।
বিছায়ে শুকানো পাতা, বট-মূলে রাখি মাথা,
দিনরাত্রি পারি সখি শুনিতে ও ধ্বনি।

ভৈরবী

বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝাতে বলিতে তাহা পারিনা স্বজনী।
যা সখি, একটু মোরে রেখে যে একেলা,
এ বন আঁধার ঘোর, ভাল লাগিবেনা তোর,
তুই কুঞ্জ-বনে সখি কর গিয়ে খেলা।

ভগ্নহৃদয়ের প্রস্তাবিত নূতন মুদ্রণের প্রুফ ও কবির মন্তব্য

ভগ্নহৃদয়	কাব্যগ্রন্থ
দ্বিতীয় সর্গ। মাধবীর উক্তি : "মৃদু হাসি…এমন মোহিনী মেয়ে"	চাঞ্চল্য
চতুর্থ সর্গ। কবি (প্রথম গান।) : "বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই"	প্রথম দর্শন
চতুর্থ সর্গ। কবি (দ্বিতীয় গান।) : "প্রতিদিন যাই সেই পথ দিয়া"	মোহ
চতুর্থ সর্গ। কবি (চতুর্থ গান।) : "কাল যবে দেখা হ'ল পথে যেতে যেতে চলি"[১]	আন্দোলন
চতুর্থ সর্গ। কবি (অষ্টম গান।) : "শুনেছি— শুনেছি কি নাম তাহার "	উল্লাস
পঞ্চম সর্গ। প্রমোদের গান : "আঁধার শাখা উজল করি"	একাকিনী
ষষ্ঠ সর্গ। কবির উক্তি : "শুধু যদি বলি…মানুষের ভাষা"	ভাবাবেগ
ষষ্ঠ সর্গ। কবির উক্তি : "পূর্ণিমা-রূপিণী বালা…করিব রজনী ভোর"[২]	উচ্ছ্বাস
ষষ্ঠ সর্গ। চপলার গান : "সখি, ভাবনা কাহারে বলে"	সমস্যা
সপ্তম সর্গ। অনিলের গান : "কাছে তার যাই যদি"[৩]	লাজময়ী
নবম সর্গ। নলিনীর গান : "কি হ'ল আমার ? বুঝিবা সজনি… (সহসা আজ সে হৃদয় আমার / কোথায় হারিয়েছি" পর্যন্ত)	হারা হৃদয়ের গান

---

১ কয়েক ছত্র কাব্যগ্রন্থে বর্জিত।

২ কাব্যগ্রন্থে অনেক অংশ পরিবর্জিত ও পরিবর্তিত

৩ এটি শৈশবসঙ্গীতেও মুদ্রিত হইয়াছিল।

ভগ্নহৃদয়	কাব্যগ্রন্থ
একাদশ সর্গ। অনিলের উক্তি : "কিছুই তো হল না…ছায়া সব ছায়া" পর্যন্ত[১]	ছায়া
দ্বাদশ সর্গ। নলিনীর গান : "এস মন, এস, তোমাতে আমাতে… খেলিতে দুখের শ্বাস" পর্যন্ত	বুঝা-পড়া
দ্বাদশ সর্গ। নলিনীর গান : "সখি লো, দুরন্ত হৃদয়ের সাথে" হইতে[২]	বিদ্রোহী
ত্রয়োদশ সর্গ। অনিলের উক্তি : "জীবন নিশীথ মোর… কাঁদিত আঁধার রাশি" পর্যন্ত	আত্মসমর্পণ
সপ্তদশ সর্গ। মুরলার উক্তি : "যার কেহ নাই তার সব আছে… কিছু তার নাহি থাকে" পর্যন্ত	বৈরাগ্যমেবাভয়ং
অষ্টাদশ সর্গ। ললিতার উক্তি : "আদর করিয়া কেন… একটু ভালবাসিও— আর কিছু নয়" পর্যন্ত[৩]	অভাগিনী
উনবিংশ সর্গ। অনিলের উক্তি : …"কোরেছে দারুণ ঝড়… তলায়ে তলায়ে যাই পাতালের পথ" পর্যন্ত[৩]	নৈরাশ্য
বিংশ সর্গ। নলিনীর গান : "আমি কভু চাই নি এ মন"[৪] হইতে শেষ পর্যন্ত[৫]	অবজ্ঞা

১ কতক অংশ কাব্যগ্রন্থে বর্জিত।

২ নলিনীর একটি গান কাব্যগ্রন্থে দুই ভাগে বিভক্ত।

৩ মধ্যে কয়েক ছত্র কাব্যগ্রন্থে বর্জিত।

৪ কাব্যগ্রন্থে আরম্ভ 'চাহি নি ত আমি তার মন'।

৫ মধ্যে কয়েক ছত্র কাব্যগ্রন্থে বর্জিত।

ভগ্নহৃদয়	কাব্যগ্রন্থ
একবিংশ সর্গ। অনিলের উক্তি : "কেমন ? এখন তোর… কোথায় গিয়ে ঢাকিবি সরম" পর্যন্ত[১]	জাগরণ
দ্বাবিংশ সর্গ। বিনোদের গান : "তুই রে বসন্ত সমীরণ"	বসন্ত সমীর
চতুর্বিংশ সর্গ। নলিনীর উক্তি : "সে জন চলিয়া গেল কেন[২]…নারিব এখন"	সংশয়
ষড়্‌বিংশ সর্গ। নলিনীর উক্তি : "আজ তার সাথে দেখা হ'ল…ফিরায়ে নয়ন।"[৩]	প্রত্যাখ্যান
অষ্টবিংশ সর্গ। নলিনীর উক্তি : "ভাল করে সাজায়ে দে মোরে… এ মুখ সাজায়ে দে লো তবে!"[৩]	সায়াহ্নে
উনত্রিংশ সর্গ। ললিতার উক্তি : …"শ্রান্ত এ জীবনে মোর… আর কোন নাই আশা।"	বিশ্রাম
ত্রিংশ সর্গ। নলিনীর উক্তি : "বড় সাধ গেছে মনে… খেলা-রাজধানী…" পর্যন্ত[৩]	খেলা-ভঙ্গ
চতুস্ত্রিংশ সর্গ। ললিতার গান : "বায়ু! বায়ু…প্রভাত পবন" পর্যন্ত[৩]	

১ মধ্যে একছত্র কাব্যগ্রন্থে বর্জিত।

২ কাব্যগ্রন্থে আরম্ভ 'তবে আজ চলে গেল সে কি ?'

৩ মধ্যে কতকগুলি ছত্র কাব্যগ্রন্থে বর্জিত।

৫

রুদ্রচণ্ড। / (নাটিকা) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা / বাল্মীকি যন্ত্রে / শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / শকাব্দা ১৮০৩।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, উপহার ।০, ৫৩।

প্রকাশ [২৫ জুন ১৮৮১]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য আট আনা।

৫৩ পৃষ্ঠার পাদদেশে মুদ্রিত আছে— PRINTED BY K. K. CHAKRAVARTI AT THE VALMIKI PRESS,/ 55, AMHERST STREET, CALCUTTA.

গ্রন্থোৎসর্গ

গ্রন্থখানি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত—

উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা' নহে ভাই!
কোথাও পাইনে খুঁজে যা' তোমারে দিতে চাই!
আগ্রহে অধীর হয়ে, ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা পূরিত সকল আশ।
ছেলেবেলা হতে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন কোরে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই,
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই!

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বোলপুর আসিয়া 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'[১] নামে যে কাব্য রচনা করেন (১৮৭৩ মার্চ) এই রুদ্রচণ্ড তাহারই নাট্যরূপ।"[২] শ্রীসুকুমার সেন লিখিয়াছেন ইহা "লুপ্ত বাল্য-রচনা পৃথ্বীরাজের-পরাজয়ের কৈশোর সংস্করণ।"[৩]

পৃথ্বীরাজের পরাজয় প্রসঙ্গ রুদ্রচণ্ড গ্রন্থেরও উপজীব্য, এই-সকল মন্তব্যের ইহাই কারণ।

সমসাময়িক সমালোচনা

কালীপ্রসন্ন ঘোষ -সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রের ১২৮৮ সালে তৃতীয় সংখ্যায় লিখিত হয়—

"রুদ্রচণ্ড। নাটিকা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বাবু রবীন্দ্রনাথ এ দেশের একজন উদীয়মান কবি। বোধ হয় তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িবে। তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচণ্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু

১ "বোলপুর ২০ অক্টোবর। ১৮৯৪। ...মনে পড়ছে, আমি যখন প্রথম বাবামশায়ের সঙ্গে বোলপুরে আসি তখন আমার বয়স ন-দশ বৎসর হবে।... সেই প্রথম বোলপুর-দর্শনের কত কথাই মনে পড়ে। তখনো কবিতা লিখতুম। মনে ধারণা ছিল— খোলা আকাশে গাছের তলায় বসে কবিতা লিখলে ঠিক দস্তুরমত কবিত্ব করা হয়। তাই ভোরে উঠেই একখানা পুরোনো Letts' Diary এবং পেন্সিল হাতে বাগানের প্রান্তে একটি ছোট নারকোল গাছের তলায় বসে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলে একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখেছিলুম। সেটা লিখতে দিন সাতেক লেগেছিল। কোথায় সে খাতা এবং সে কবিতা! তার একটা লাইনও মনে নেই। কেবল মনে আছে বড়দাদা সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন।...সেই Letts' Diaryটা যদি খুঁজে পাই তাহলে আবার একবার ভোরের বেলায় সেই নারকেল-তলায় বসে সেই 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'টা পড়ে দেখতে ইচ্ছে করে।" —*ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১৬৬*

জীবনস্মৃতিতেও 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায়ে এই কাব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

২ রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৭ সংস্করণ, পৃ. ১০৩

৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬৮ সংস্করণ, পৃ. ৩৮

নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ। আমরা নিম্নে এই কাব্যের কতিপয় পংক্তি তুলিয়া দিলাম। আমাদিগের বোধ হয় বাঙ্গালায় কেহই এমন জ্যোৎস্নাশীল, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারে না।"[১]

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের ১৮৮১ সালের ২৩ মে সংখ্যায় এই সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল—

"This is the Title of a melo-drama from the pen of a writer, who belongs to a nest of singing birds, and to whose credit it may be said that amid great temptation they have made literature and poetry the vocation of their life. The sons and daughters of the venerable Babu Debendranath Tagore have set an example which the scions of our noble families might follow with advantage and credit. As regards the performance under notice we need scarcely say it is not a drama properly so-called nor an opera. Of course the writer would not stoop to the composition of farces, and his performance is not a farce. It is a sort of interlocutory poem— short but sweet.

"The writer we may add not long ago visited Europe,[২] and through fond of English scenes and the English people, his Anglican partiality has not made him so unpatriotic as to abjure his maternal language and the habits and customs of the country of his birth. He is culling honey from foreign flowers to enrich his home, but is quite national in his tone and feeling".[৩]

---

১ শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 'জীবনস্মৃতি'র গ্রন্থপরিচয়ে উদ্‌ধৃত। সমালোচক যে ছত্রগুলি 'তুলিয়া' ছিলেন তাহা শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-সাগরসংগমে' গ্রন্থে [১৩৬৯] উদ্‌ধৃত আছে।

২ ইতিপূর্বে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ভারতী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, এই মন্তব্য সেই প্রসঙ্গে।

৩ শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনা-পঞ্জীতে এই সমালোচনাটি উল্লিখিত।

পুনর্মুদ্রণ

এই গ্রন্থও প্রথম প্রকাশিত হইবার পর দীর্ঘকাল আর মুদ্রিত হয় নাই। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে (১৩৪৭) রুদ্রচণ্ড পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। অন্য সংকলন বা গীতসংগ্রহে ইহার কোনো কোনো অংশ অবশ্য গৃহীত হইয়াছে, সেই-সকল গ্রন্থের পরিচয়দানকালে তাহা উল্লিখিত হইবে।

ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচণ্ডের প্রকাশ-পারম্পর্য

দুখানি বইই ১৮০৩ শকাব্দে প্রকাশিত বলিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত, গ্রন্থ হইতে ইহার অপেক্ষা অধিক সংবাদ জানা যায় না। 'উপহারে'র ভাষা হইতে অনুমান হয় দুখানিই রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার— সম্ভবত দ্বিতীয়বার বিলাত-যাত্রার (৯ বৈশাখ ১২৮৮। এপ্রিল ১৮৮১। এই তারিখ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড হইতে গৃহীত)— পূর্বে মুদ্রিত বা মুদ্রণের জন্য প্রেরিত। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশ যথাক্রমে ২৩ ও ২৫ জুন ১৮৮১। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের তারিখ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনো কারণ নাই। বস্তুত ইহার একমাস পূর্বে (২৩ মে ১৮৮১) *The Hindoo Patriot* পত্রে রুদ্রচণ্ডের সমালোচনা প্রকাশিত হয়, এবং তাহারও দুই সপ্তাহ পূর্বে (৯ মে) ওই পত্রে উক্ত গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকৃত হয়। অন্য নির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে আপাতত বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে উল্লিখিত পারম্পর্য অনুসৃত হইল।

ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচণ্ডের রচনাকাল

ভগ্নহৃদয় ॥ ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "[প্রথমবার] বিলাতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে, কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি।" রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী) প্রথম খণ্ডে ভগ্নহৃদয়ের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার যে প্রতিলিপি ("১৮৮০ সালের রচনার পাণ্ডুলিপি") মুদ্রিত হয় তাহাতে দ্বিতীয় সর্গের শিরোদেশে S. S. Oxus, February 1880 লিখিত আছে। পাণ্ডুলিপিতে ষষ্ঠ সর্গের এক পৃষ্ঠায় কবির হস্তাক্ষরে লেখা আছে Steamer : এই পৃষ্ঠাতেই পুনরায় মন্তব্য আছে Bulpore/May/1880।

রুদ্রচণ্ড॥ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিয়াছেন, "[উপহার কবিতায়] প্রবাসে যাইবার কথা উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে ইহা বিলাত যাত্রা করিবার পূর্ব্বে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলাত যাত্রা করেন তখন তাঁহার বয়স সতেরো বৎসর, তাহার পূর্ব্বে লেখা হইয়া থাকিলে, 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকাটিকে ষোল সতেরো বৎসর বয়সের লেখা বলা যায়।" —"রবীন্দ্র-পরিচয়", প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯।

শ্রীসুকুমার সেন এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "ইহা [রুদ্রচণ্ড] রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদে থাকা কালে প্রথমবার বিলাতযাত্রার আগে লেখা এমন অনুমান অপরিহার্য নয়। দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার প্রারম্ভে ইহা রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, এই অনুমানই সঙ্গততর।" —'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬৮ সংস্করণ, পৃ. ৩৮, পাদটীকা।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "আমাদের মনে হয় [দ্বিতীয়বার] বিলাত যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়িতে নূতন কিছু সৃষ্টি-প্রেরণার অভাবে পুরাতন রচনাটাকে ['পৃথ্বীরাজের পরাজয়'] নূতন কলেবরে সাজাইয়া 'জ্যোতিদাদা'কে উপহার দিলেন।" —রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৭ সংস্করণ, পৃ. ১০৩

৬

য়ুরোপ-প্রবাসীর/ পত্র / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত / শ্রীসারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক প্রকাশিত / কলিকাতা / বাল্মীকি যন্ত্রে / শ্রী কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত। / শকাব্দা ১৮০৩

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র [৴০], উপহার [৶০], ভূমিকা ৴০-৵০, ২৫৬। প্রকাশ [২৫ জুলাই ১৮৮১]। মুদ্রণসংখ্যা ২০০০। মূল্য দেড় টাকা।

২৫৬ পৃষ্ঠার পাদদেশে মুদ্রিত আছে— Printed by K. K. Chakravarti at the Valmiki Press, 40, Guruprasad Chowdhury's Lane, Calcutta.

গ্রন্থোৎসর্গ

এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্র এইরূপ—

উপহার।

ভাই জ্যোতিদাদা,

ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন

রবি।[১]

---

১ প্রবাসী ভ্রাতাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁহার গ্রন্থ (অশ্রুমতী নাটক) উৎসর্গ করিয়াছিলেন—

উৎসর্গপত্র।

ভাই রবি

তুমি অশ্রুমতীকে ছাখ্‌বার জন্য উৎসুক হয়ে আছ। এই লও, আমার অশ্রুমতীকে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলণ্ড-প্রবাসে, তাকে দেখে, তোমার প্রবাস-দুঃখ যদি ক্ষণকালের জন্যও ঘোচে তা হ'লে আমি সুখী হব।

৯ই শ্রাবণ }
১৮০১ শক }

তোমার

———

সাময়িক পত্রে প্রকাশ

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র বিলাত হইতে লিখিত[১] তেরোটি পত্রের সমষ্টি, ১২৮৬ ও ১২৮৭ সালের ভারতী পত্রিকায় "য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র" এই নামে নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়—

১২৮৬ বৈশাখ-পৌষ, ফাল্গুন ; ১২৮৭ বৈশাখ-শ্রাবণ।[২]

১৮৮০ সালের প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন— ফেব্রুয়ারি মাসে, এইরূপ এ যাবৎ অনুমিত। যে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য 'কতকটা ফিরিবার পথে' লিখিয়াছিলেন তাহার দ্বিতীয় সর্গের পাণ্ডুলিপিতে S. S. Oxus/ February/1880 এই তারিখ কবির হস্তাক্ষরে লিখিত আছে, ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যগ্রন্থ, চলিত ভাষায় লিখিত। "আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয় স্বজনদের সহিত মুখোমুখি এক প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা

১ "আমার বয়স ছিল সতেরো। পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে গুরুজনের উদ্বেগভাজন হয়েছি। মেজদাদা তখন আমেদাবাদে জজিয়তি করছেন। ভদ্রঘরের ছেলের মানরক্ষার উপযুক্ত ইংরেজি যে-ক'রে-হোক জানা চাই ; সেজন্যে আমার বিলেত নির্ব্বাসন ধার্য্য হয়েছে। মেজদাদার ওখানে কিছুদিন থেকে পত্তন করতে হবে তার ভিৎ, হিতৈষীরা এই স্থির করেছেন।" —পাশ্চাত্য ভ্রমণ, মুখবন্ধ। এই মুখবন্ধ চারুচন্দ্র দত্তের উদ্দেশে লিখিত। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের সংশোধিত পাঠ-সংবলিত এই গ্রন্থের বিবরণ যথাস্থানে মুদ্রিত হইল।

"ভারতী যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন, আমাকে তিনি বিলাতে লইয়া যাইবেন। পিতৃদেব যখন সম্মতি দিলেন তখন আমার ভাগ্যবিধাতার এই আর একটি অযাচিত বদান্যতায় আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম।" —জীবনস্মৃতি, 'আমেদাবাদ' অধ্যায়।

১৮৭৮ সালের "বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা 'পুনা' ষ্টীমারে উঠলেম।"— য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, প্রথম পত্র।

২ "ভারতী পত্রিকায় ও গ্রন্থে 'পত্র'গুলি একই পারম্পর্যে প্রকাশিত হয় নাই।" দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৭।

চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।"[১] "আমার বিশ্বাস বাংলা চলিত-ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"[২]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বাদানুবাদ

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়— ইহার কোনো কোনো পত্রে প্রকাশিত মন্তব্য সম্বন্ধে ভারতী-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ টিপ্পনী— দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম পত্র। আমাদের দেশে "পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত রোয়েছে, আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মত অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। ···মেয়েদের সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত কোরে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা' বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।" —বিতর্কের একটি প্রধান বিষয়; অপর একটি বিষয়, "ছেলেবেলা থেকে প্রতি পদে আমাদের কানে মন্ত্র দিতে হয় যে, পিতা দেবতুল্য, গুরু দেবতুল্য; ···আমাদের পরিবারে গুরুলোকদের পরে এই রকম একটা অস্বাভাবিক ভক্তির উদ্রেক কোরে দেওয়া হয়, গুরুলোকেরাও সেই অন্ধ ভক্তির প্রভাবে বলীয়ান হোয়ে ছোটদের উপর যথেচ্ছব্যবহার করেন। তাঁরা চান, তাঁদের সমস্ত মত, সমস্ত আজ্ঞা ছোটরা অবিচারে শিরোধার্য্য কোরে নেয়, সে বিষয়ে তারা তিলমাত্র দ্বিরুক্তি বা দ্বিধা না করে, ···এইরকম ছেলেবেলা থেকে গুরুভারে অবসন্ন হোয়ে একটি মুমূর্ষু জাতি তৈরি হোচ্চে। ছেলেবেলা থেকে বলের অন্ধ দাসত্ব করে আস্‌চে, সুতরাং বড় হোলে সে অবস্থা তার নতুন বা অরুচিজনক বোলে ঠেকে না", "···আমাদের শাস্ত্রে বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য; শুনে শুনে অভ্যেস হোয়ে গেছে বোলে ও আমাদের দেশে এই রকম একটা ভাব বর্ত্তমান আছে বোলে এর হাস্যজনকতা ঘুচে গিয়েছে; নইলে এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হোতে পারে? ভ্রাতা কি ভ্রাতার তুল্য হোতে পারে না? ···ভাই ভাইয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বোলে কি একটা ভাব বর্ত্তমান নেই?" —আমাদের দেশে প্রচলিত প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ মন্তব্য করেন, তাহা লইয়াও বিতর্ক হয়।

---

১ ভূমিকা, প্রথম সংস্করণ

২ মুখবন্ধ, পাশ্চাত্য ভ্রমণ

পিতৃতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথের (জন্ম ১৮৪০) মত অবশ্য অষ্টাদশবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথ 'অবিচারে শিরোধার্য্য' করিয়া লন নাই— লেখকরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'সমান আসনে' বসিয়াই উত্তর দিয়াছিলেন।[১]

"ব্যারিষ্টার হইব বলিয়া বিলাতে আয়োজন সুরু করিয়াছিলাম এমন সময়ে পিতা আমাকে দেশে ডাকিয়া আনাইলেন।" "মেজদাদার দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিতে হইবে।" 'রবীন্দ্রজীবনী'কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে প্রকাশিত 'প্রগল্‌ভতায়' অভিভাবকগণের অসন্তোষের ফলেই পাঠক্রম অসমাপ্ত রাখিয়া দেশে ফিরিবার এই নির্দেশ। অল্পকাল পরেই (বৈশাখ ১২৮৮) অবশ্য ব্যারিস্টার হইবার উদ্দেশ্যে পিতার অনুমতিক্রমে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিলাত যাত্রা করেন, কিন্তু বিলাত পর্যন্ত পৌঁছান নাই, মাদ্রাজ হইতেই ফিরিয়া আসেন।

পুনর্মুদ্রণ ও সংস্করণ

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র পুনর্মুদ্রিত হয় 'হিতবাদির উপহার ; রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী'র (১৩১১) অন্তর্গত হইয়া।

১ এই বির্তক-প্রসঙ্গে, বহু বৎসর পরে (১৯২০-২১) পুনরায় যে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-বিতর্ক ঘটিয়াছিল তাহার কথা অনেকের স্মরণ হইবে— বিতর্কের বিষয় অসহযোগ আন্দোলন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের বিশেষ সমর্থক ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ইহাকে স্বীকার করিতে পারেন নাই— ইহাই তর্কের হেতু। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের দুইখানি চিঠি বিশ্বভারতী পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৩৫৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে ; দ্বিজেন্দ্রনাথকে লিখিত রবীন্দ্র-নাথের চিঠি পাওয়া যায় নাই।

এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'উপসর্গের অর্থবিচার' ও রবীন্দ্রনাথের 'উপসর্গ সমালোচনা' প্রবন্ধেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (চতুর্থ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা ও পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা) দ্বিজেন্দ্রনাথ 'উপসর্গের অর্থবিচার' প্রবন্ধ লিখিলে রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধটির সমালোচনা করেন ; জ্যেষ্ঠের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৬ বৈশাখ সংখ্যা ভারতী পত্রে 'উপসর্গ সমালোচনা' প্রবন্ধ লেখেন। —রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশখণ্ডে (বিশ্বভারতী, ১৩৪৯) শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রবন্ধটি গ্রন্থভুক্ত করেন।

দীর্ঘকাল পরে, ১৩৪২-৪৩ সালে বিভিন্ন গদ্য রচনা সংকলনকালে এই গ্রন্থেরও পুনঃসংস্করণ হয় ; কবি কর্তৃক বহুসংস্কৃত হইয়া য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারির সহিত 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' (আশ্বিন ১৩৪৩) নামে ইহা পুনরায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথমখণ্ডেও (বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৪৬) গ্রন্থখানি এই সংশোধিত আকারে, অর্থাৎ 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' অনুযায়ী পুনর্মুদ্রিত হয়।

বহুকাল ইহা আর না ছাপাইবার কারণ রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে 'বিলাত' অধ্যায়ে এবং 'পাশ্চাত্য ভ্রমণে'র মুখবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন।

জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

"অশুভক্ষণে বিলাত-যাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্যবয়সের বাহাদুরি। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতসবাজি করিবার এই প্রয়াস। শ্রদ্ধা করিবার, গ্রহণ করিবার, প্রবেশ লাভ করিবার শক্তিই যে সকলের চেয়ে মহৎ শক্তি এবং বিনয়ের দ্বারাই যে সকলের চেয়ে বড় করিয়া অধিকার বিস্তার করা যায় কাঁচা বয়সে এ কথা মন বুঝিতে চায় না। ভাললাগা, প্রশংসাকরা যেন একটা পরাভব, সে যেন দুর্ব্বলতা— এইজন্য কেবলি খোঁচা দিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার এই চেষ্টা আমার কাছে আজ হাস্যকর হইতে পারিত যদি ইহার ঔদ্ধত্য ও অসরলতা আমার কাছে কষ্টকর না হইত।"

পাশ্চাত্য ভ্রমণের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—

"চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্দ্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে। বাঙালির ছেলে প্রথম বিলেতে গেলে তার ভালো লাগবার অনেক কারণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক, সেটা ভালোই। কিন্তু কোমর বেঁধে বাহাদুরি করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উল্টো মূর্ত্তি ধরতে হয়। বলতে হয়, আমি অন্য পাঁচজনের মতো নই, আমার ভালো লাগবার যোগ্য কোথাও কিছুই নেই। সেটা যে চিত্তদৈন্যের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্ব্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ, সেটা বোঝবার বয়স তখনো হয় নি।

"সাহিত্যে সাবালক হওয়ার পর থেকেই ঐ বইটার পরে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। বুঝেছি, যে দেশে গিয়েছিলুম সেখানকারই যে সম্মান হানি করা

হয়েছে তা নয়, ওটাতে নিজেরই সম্মানহানি। বিস্তর লোকের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বইটা প্রকাশ করি নি।"

প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেও ইহা গ্রন্থাকারে 'প্রকাশ করিতে আপত্তি'র কারণ লিখিয়াছেন—

"বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল;— কারণ, কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই, বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে।"

পাশ্চাত্য ভ্রমণের মুখবন্ধে তিনি লেখেন—

"আমি প্রকাশে বাধা দিলেই এটা যে অপ্রকাশিত থাকবে এই কৌতূহল-মুখর যুগে তা আশা করা যায় না। সেই জন্যে এ লেখার কোন্ কোন্ অংশকে লেখক স্বয়ং গ্রাহ্য এবং ত্যাজ্য ব'লে স্বীকার করেছে সেটা জানিয়ে রেখে দিলুম।···

"য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়।···

"···লেখার জঙ্গলগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল, এর মধ্যে শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে, অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাহিরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে।···আসল জিনিষটাকে তারা আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু নষ্ট করে নি।"

রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে বিশ্বভারতী যে 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থমালা প্রকাশ করেন তাহার অন্তর্গত হইয়া য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের নূতন সংস্করণ (পৌষ ১৩৬৭) প্রকাশিত হয়; ইহা প্রধানত প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ হইলেও, নবযোজিত গ্রন্থপরিচয়ে পুস্তক-সম্পর্কিত বহু প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ [৮০], ২২৪।

প্রকাশ পৌষ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ : ১৮৮২ শকাব্দ। মুদ্রণসংখ্যা ৩১০০। মূল্য সাড়ে চার টাকা। ছয় টাকা।

২২৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে— প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত / বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ / মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় / নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্ক্‌স্‌ প্রাইভেট লিমিটেড / ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "এই পুস্তক ছাপা হইবার সময় নানা কারণে আমি কোন মতেই নিজে তদারক করিতে পারি নাই, এই নিমিত্ত ইহাতে ভুল আছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।" এইরূপ অনেক মুদ্রণ-ত্রুটি 'ভারতী'র সাহায্যে এই সংস্করণে সংশোধন করা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য ভ্রমণ গ্রন্থের ভূমিকাও আলোচ্য সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়ে পুনর্‌-মুদ্রিত হইয়াছে। রচনার সমসাময়িক দুইখানি রবীন্দ্রপ্রতিকৃতি এই সংস্করণে যুক্ত হইয়াছে। কয়েকখানি চিঠি প্রসঙ্গে ভারতী পত্রে তথা প্রথম সংস্করণ এবং রবীন্দ্রগ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত দ্বিজেন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত মন্তব্যগুলিও এই সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের কোনো অংশের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। তবে, পাশ্চাত্য ভ্রমণ গ্রন্থের মুখবন্ধে যে লিখিয়াছেন 'এ লেখার কোন্‌ কোন্‌ অংশকে লেখক স্বয়ং গ্রাহ্য এবং ত্যাজ্য ব'লে স্বীকার করেছে সেটা জানিয়ে রেখে দিলুম' তাহার নিদর্শনস্বরূপ লেখকের নির্দেশ-চিহ্নাঙ্কিত ও তাঁহার কৃত সংশোধন-সংবলিত য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড, ও উক্ত সংশোধিত পাঠের প্রতিলিপি— তাহাও ওইরূপ চিহ্ন ও সংশোধন-যুক্ত— শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। এগুলি অবশ্য পাশ্চাত্য ভ্রমণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগোত্রীয়।

কাল-মৃগয়া। / (গীতি-নাট্য।) / বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে / অভিনয়ার্থ / রচিত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও / প্রকাশিত। / অগ্রহায়ণ ১২৮৯। / মূল্য চারি আনা।

এই পুস্তিকার আখ্যাপত্র নাই। উপরে মুদ্রিত বিবরণ মলাট হইতে গৃহীত। মলাট-সংবলিত এক কপি পুস্তিকা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে। রবীন্দ্র-ভারতী-সমিতির সংগ্রহে মলাটহীন এক কপি আছে।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ ৩৮।

প্রকাশ [৫ ডিসেম্বর ১৮৮২]। মুদ্রণসংখ্যা ২৫০

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে কাল-মৃগয়া প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত।… এই সম্মিলনী উপলক্ষ্যেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়।…

"বাল্মীকিপ্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরও একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথকর্ত্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে ষ্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল; ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।"

কালমৃগয়া হইতে কোন্ কোন্ গান বিশুদ্ধ বা পরিবর্তিত আকারে বাল্মীকিপ্রতিভায় গৃহীত হয়, বাল্মীকিপ্রতিভার বিবরণে তাহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

কালমৃগয়া অভিনয়ের (২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২) বিবরণ ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ২৭ ডিসেম্বর স্টেট্‌সম্যান পত্রে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল—

A Conversazione :—A *Conversaxione* of Bengali authors was held at the house of Baboo Debendra Nath Tagore, at

No. 6, Dwarkanath Tagore's Street, Jorasanko, on Saturday evening last. There was a large gathering of Bengali authors, editors and other gentlemen. A short melodrama named Kalmrigaya, or "The fatal hunt", was written for the occasion by Baboo Rabindranath Tagore, well-known to the literary world. The drama was based upon a story from the *Ramayana* News. The *dramatis personae* were represented by the members of the Tagore family, both male and female. All the parts were well sustained. [১]

মন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (১৩৩৪ । পৃ. ১২০-১২১) এই অভিনয়ে পাত্রপাত্রীরূপে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের উল্লেখ করিয়াছেন—

"১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে 'কালমৃগয়া'র অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের, রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনির, হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ঋতেন্দ্রনাথ ও কন্যা অভিজ্ঞা দেবী যথাক্রমে অন্ধমুনির পুত্র কন্যার এবং পরিবারস্থ বালিকাগণ বনদেবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

মন্মথনাথ অভিনয়ের সমসাময়িক একটি বিবরণও তাঁহার গ্রন্থে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন—

" এতৎপ্রসঙ্গে 'ভারতবন্ধু' নামক তৎকালীন এক সংবাদপত্র হইতে কিয়দংশ এ স্থলে উদ্‌ধৃত করা যাইতে পারে :—

" 'বিদ্বজ্জন-সমাগম। গত শনিবার রাত্রে ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে বিদ্বজ্জন সমাগম হইয়াছিল। এই সমাগম উপলক্ষে "কালমৃগয়া" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাট্যগীতি রচিত হইয়া ঐ রাত্রে অভিনীত হয়। অভিনয় অনেকাংশে সুন্দর হইয়াছিল। গৃহদেবীরা বনদেবী সাজিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বিদূষকের অভিনয়ের শেষাংশ ভাল হয় নাই। মুনিকুমার পিতার নিমিত্ত জল আনিতে গেলে লীলা তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে অন্ধমুনির নিকট যেরূপে গান গাহিয়াছিল, তাহা শুনিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়।' "

---

১ As reprinted in *The Statesman*, December 27, 1932, in the section "Fifty Years Ago". জীবনস্মৃতিতে উদ্‌ধৃত।

কাল-মৃগয়া দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে (বিশ্বভারতী। আশ্বিন ১৩৪৭) সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হয়। পরে গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডেও (আশ্বিন ১৩৫৭) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। স্বরবিতান ২৯ খণ্ডে (আষাঢ় ১৩৬০) এই গীতিনাট্য স্বরলিপি-সহ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; কাল-মৃগয়ার স্বরলিপি প্রসঙ্গে তথ্যাদি উক্ত স্বরবিতানে দ্রষ্টব্য।

সন্ধ্যা সঙ্গীত। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / সন ১২৮৮[১]

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, বিজ্ঞাপন, সূচীপত্র, উপহার-কবিতা [৮০], ১৩২, [৩]
প্রকাশ ৫ জুলাই ১৮৮২। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য ॥০

'বিজ্ঞাপনে' লিখিত হইয়াছে—

"বিজ্ঞাপন।

"আমার রচিত কবিতার মধ্যে যেগুলি সন্ধ্যা-সঙ্গীত নামে উক্ত হইতে পারে, সেইগুলিই এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশ কবিতাই গত দুই বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে, কেবল "বিষ ও সুধা" নামক দীর্ঘ কবিতাটি বাল্যকালের রচনা।

গ্রন্থকার।"

সূচী

১. উপহার [১]। অয়ি সন্ধ্যে [প্রবেশক]
২. গান আরম্ভ। ডাকি তোরে আয়রে হেথায়
ভারতী। পৌষ ১২৮৮। 'কবিতা সাধনা' নামে
৩. সন্ধ্যা। ব্যথা বড় বাজিয়াছে প্রাণে
৪. তারকার আত্মহত্যা। জ্যোতির্ম্ময় তীর হ'তে আঁধার সাগরে
ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৫. আশার নৈরাশ্য। ওরে আশা, কেন তোর হেন দীন বেশ
ভারতী। শ্রাবণ ১২৮৮

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জীতে (শনিবারের চিঠি। কার্তিক ১৩৪৬) লক্ষ্য করিয়াছেন যে "পুস্তকের প্রকাশকাল ১২৮৮, কিন্তু 'সন্ধ্যা সঙ্গীতের' একটি কবিতা (আমি-হারা) ১২৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় সন্ধ্যা সঙ্গীতের প্রকাশকাল ৫ জুলাই ১৮৮২, অর্থাৎ ২২ আষাঢ় ১২৮৯।" ভারতীতে সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাবলীর প্রকাশের সূচী ওই রচনা হইতে গৃহীত।

৬. পরিত্যক্ত। চলে গেল! আর কিছু নাই কহিবার

৭. সুখের বিলাপ। অবশ নয়ন নিমীলিয়া

ভারতী। আষাঢ় ১২৮৮

৮. হৃদয়ের গীতধ্বনি [গীতিধ্বনি]। ওকি সুরে গান গাস্‌ হৃদয় আমার

৯. দুঃখ আবাহন। আয় দুঃখ, আয় তুই

ভারতী। ফাল্গুন ১২৮৭

১০. শান্তি-গীত। ঘুমা' দুঃখ, হৃদয়ের ধন

১১. অসহ্য ভালবাসা। বুঝেছি গো বুঝেছি স্বজনি

১২. হলাহল। এমন ক'দিন কাটে আর

১৩. পাষাণী। ঘৃণা হলাহল যদি পাই

১৪. অনুগ্রহ। এই যে জগত হেরি আমি

ভারতী। মাঘ ১২৮৮

১৫. আবার। তুমি কেন আইলে হেথায়

১৬. দুদিন। আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহার জাল[১]

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭

১৭. পরাজয় সঙ্গীত। ভাল করে যুঝিলিনে, হল তোরি পরাজয়

ভারতী। কার্তিক ১২৮৮

১৮. শিশির। শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে

ভারতী। ভাদ্র ১২৮৮

১৯. সংগ্রাম সঙ্গীত। হৃদয়ের সাথে আজি

ভারতী। ফাল্গুন ১২৮৮

২০. আমি-হারা। পরাণের অন্ধকার অরণ্য মাঝারে

ভারতী। বৈশাখ ১২৮৯

২১. কেন গান গাই। গুরুভার মন লয়ে, কত বা বেড়াবি বয়ে

২২. কেন গান শুনাই। এস সখি, এস মোর কাছে

---

১ 'কবিতাটির লেখকের নাম ছিল—শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য্য'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬

২৩. গান সমাপন। জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখিনি আর
ভারতী। অগ্রহায়ণ ১২৮৮

বিষ ও সুধা flyleaf-এর পর

২৪. বিষ ও সুধা। অস্ত গেল দিনমণি। সন্ধ্যা আসি ধীরে

গ্রন্থ 'সমাপ্ত' হইবার পর

২৫. উপহার [২]। ভুলে গেছি, কবে তুমি

সংস্করণ

১৮১৪ শকাব্দে [১৮৯২, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ] সন্ধ্যা সঙ্গীতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়—

সন্ধ্যা সঙ্গীত। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / দ্বিতীয় সংস্করণ। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ৫৫ নং অপর চিৎপুর রোড। / জ্যৈষ্ঠ ১৮১৪ শক। / মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

বিষ ও সুধা কবিতাটি এই সংস্করণে বর্জ্জিত হয়, আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। কতকগুলি কবিতার সংস্কার হয়।[১]

১৩০৩ [১৮৯৬] সালে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত সন্ধ্যাসঙ্গীত বস্তুত এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ, এইরূপ অনুমান হয়।

এই সংস্করণে 'কেন গান গাই' ও 'কেন গান শুনাই' এই কবিতা দুটি বর্জ্জিত হয়, আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে ১৩১০ সালে [১৯০৩] প্রকাশিত মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থ' উল্লেখযোগ্য—

১ দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্রকাব্যে পাঠভেদ/সন্ধ্যাসংগীত', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, রবীন্দ্র-সংখ্যা (১৩৭১)। ইহাতে বিভিন্ন সংস্করণে পরিত্যক্ত কবিতা পুনর্মুদ্রিত এবং বিভিন্ন কবিতায় যে-সকল পরিবর্তন হয় তাহা আনুপূর্বিক সংকলিত।

গ্রন্থাকারে পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ সন্ধ্যাসংগীতের প্রকাশ, ১৯৬৯ [১৩৭৬]।

"বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না; যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আশঙ্কার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা [মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত] নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে; কেবল সন্ধ্যাসঙ্গীতে-প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।" —জীবনস্মৃতি, সন্ধ্যাসংগীত অধ্যায়।

কবিতা কয়টি এই—

উপহার [১][১]
গান আরম্ভ[২]
তারকার আত্মহত্যা
আশার নৈরাশ্য
সুখের বিলাপ
আবার
পরাজয়-সঙ্গীত
শিশির
সংগ্রাম সঙ্গীত
আমি-হারা[৩]

[১৯১১] সালে সন্ধ্যাসঙ্গীতের একটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়—

সন্ধ্যা সঙ্গীত / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / মূল্য বার আনা

আখ্যাপত্রের পিছনে—

প্রকাশক / শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র / ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস / ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা / কান্তিক প্রেস / ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা / শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

---

১ 'সন্ধ্যা' নামে

২ 'আবাহন' নামে

৩ 'পথভ্রষ্ট' নামে

'দ্বিতীয় সংস্করণে' ও ১৩০৩ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে ক্রমশ যে তিনটি কবিতা বর্জিত হয় সেগুলি ছাড়া অন্য সব কবিতাই এই মুদ্রণে আছে।

১৯১৫ সালে ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সন্ধ্যাসংগীত অন্তর্ভুক্ত হয়। কবিতা-সংখ্যা ১৯১১ সংস্করণের অনুরূপ।

১৩৪৬ [১৯৩৯] সালে বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সন্ধ্যাসংগীত অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশ্বভারতী-পুনর্মুদ্রণ (ভাদ্র ১৩৩৪) অবলম্বনে ইহা মুদ্রণার্থ দেওয়া হয়; প্রুফ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের প্রায় আদ্যোপান্ত বিশেষভাবে সংস্কার করেন এবং "সন্ধ্যা" ("ব্যথা বড় বাজিয়াছে প্রাণে") কবিতাটি প্রথমে সংশোধন করিতে আরম্ভ করিয়া পরে "এ কবিতাটি/ অসহ্য পুনরাবৃত্তি/সংশোধনের অতীত/এটা পরিত্যাজ্য" প্রুফে এই মন্তব্য লিখিয়া, কবিতাটিকে সম্পূর্ণই বর্জন করেন।[১] গ্রন্থের আরম্ভে মুদ্রিত "উপহার" ("অয়ি সন্ধ্যে, অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী") কবিতার নামকরণ করেন 'সন্ধ্যা'।[২]

১৯৬৯ সালে সন্ধ্যাসংগীতের একটি পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়—

সন্ধ্যা-সংগীত / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ / কলিকাতা

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ ১৬৪

প্রকাশ ১৯৬৯। মুদ্রণসংখ্যা ১১০০। মূল্য ৭.০০ টাকা

আখ্যাপত্রের পিছনে— রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্প ২...

পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ ১৯৬৯

পাঠান্তরপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয় / শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় / কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত

১৬৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে—

---

১ দ্রষ্টব্য সন্ধ্যাসংগীত পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ। বিশ্বভারতী। ১৯৬৯।

২ ১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থেও কবিতাটি এই নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

পরবাসী ক্ষীণ আয়ু একটি মুমূর্ষু বায়ু
স্বদেশ কানন পানে ধায়
শ্রান্ত পদ উঠিতে না চায় ;
যেমনি কাননে পশে, ফুলবধূটির পাশে,
শেষ কথা বলিতে বলিতে
তখনি অমনি ম'রে যায় ;
তেমনি, তেমনি ক'রে এসো,
কবিতা রে, বধূটি আমার,
ম্লান মুখে করুণা বসিয়া
চোখে ধীরে ঝরে অশ্রু ধার।
দুটি শুধু পড়িবে নিশ্বাস,
দুটি শুধু বাহিরিবে বাণী,
বাহু দুটি হৃদয়ে জড়ায়ে
মরমে রাখিবি মুখখানি !

সন্ধ্যা

[illegible]
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়।

[illegible]
তোর কাছে কহি মনকথা,
তোর কাছে করি প্রসারিত
প্রাণের নিভৃত নীরবতা।
তোর গান শুনিতে শুনিতে
তোর তারা গুণিতে গুণিতে,
নয়ন মুদিয়া আসে মোর,
হৃদয় হইয়া আসে ভোর—
স্বপন-গোধূলিময় প্রাণ
হারায় প্রাণের মাঝে তোর !
একটি কথাও নাই মুখে,
চেয়ে শুধু রোস্ মুখ পানে
অনিমেষ আনত নয়ানে।
ধীরে শুধু ফেলিস্ নিশ্বাস,
ধীরে শুধু কানে কানে গা'স্
ঘুম-পাড়াবার মৃদু গান,

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সন্ধ্যাসংগীতের প্রুফে
'সন্ধ্যা' কবিতা বর্জন ও সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য

প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ/৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ / মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় / নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্‌ প্রাইভেট লিমিটেড / ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩

'বর্তমান সংস্করণে কবির জীবিতকালে শেষ সংস্করণের, অর্থাৎ রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডের (বিশ্বভারতী। ১৩৪৬।১৯৩৯) পাঠ মুদ্রিত।… মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে অন্যান্য সংস্করণের যেখানে যেখানে পার্থক্য দেখা যায় পাদটীকায় যথাসাধ্য তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।'

'সন্ধ্যাসংগীতের বিভিন্ন সংস্করণে ক্রমশ চারিটি কবিতা সম্পূর্ণই বর্জিত হইয়াছে— সন্ধ্যা, কেন গান গাই, কেন গান শুনাই, বিষ ও সুধা।… কবিতা চারিটির প্রথম সংস্করণ -ধৃত পাঠ পুনর্মুদ্রিত হইল।… 'বিষ ও সুধা' একমাত্র প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণ -কালে বর্জিত হয়।'

কবির মন্তব্য

কাব্যগ্রন্থ, প্রথম খণ্ড (১৯১৫ : আশ্বিন ১৩২১) ॥ ভূমিকা

"সন্ধ্যা-সঙ্গীতের পূর্ব্ববর্ত্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যা-সঙ্গীতকেও বাদ দিতাম। কিন্তু সকল জিনিষেরই একটা আরম্ভ ত আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা এবং দুর্ব্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়।

"সন্ধ্যা-সঙ্গীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে সুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে— গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছে। তখন শক্তি অল্প, বাধা বিস্তর,— নিজের কাব্যরূপকে তখনো স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই নাই, ভালো মন্দ বিচার করিবার কোনো আদর্শ মনের মধ্যে ছিল না। তাহা ছাড়া, প্রথম রচনার সকলের চেয়ে মস্ত দোষ এই যে তাহার মধ্যে সত্যের অভাব থাকে। কেননা সত্যকে মানুষ ক্রমে ক্রমে পায়— অথচ সত্যকে পাইবার পূর্ব্বেই তাহার কর্ম্ম আরম্ভ হইয়া থাকে; সেই কর্ম্মের মধ্যে আবর্জ্জনার ভাগই বেশি থাকে।

"মানুষের জীবন তাহার প্রতিদিনের আবর্জ্জনা প্রতিদিন মোচন করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিয়া চলে। যুবা আপনার শৈশবের হামাগুড়িকে জমাইয়া রাখে না। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যভাণ্ডারে আবর্জ্জনাগুলাকে একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায় না। যাহা একবার প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে বিদায় করা কঠিন।

"অতএব সন্ধ্যা-সঙ্গীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা গেল। ইহার কবিতাগুলির মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যদি তাহার পরবর্ত্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সে জন্য ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।..."

জীবনস্মৃতি ॥ সন্ধ্যাসংগীত অধ্যায়

"নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ যে-অবস্থার কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, মোহিতবাবুকর্ত্তৃক সম্পাদিত আমার গ্রন্থাবলীতে সেই অবস্থার কবিতাগুলি 'হৃদয়-অরণ্য' নামের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রভাতসংগীতে 'পুনর্ম্মিলন' নামক কবিতায় আছে—

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।
সে-বন আঁধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।

হৃদয়-অরণ্য নাম এই কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

"এইরূপে বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে; কেবল সন্ধ্যাসঙ্গীতে -প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

"একসময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জ্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।

"এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনাআপনি সেই-সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।

"একটা শ্লেট লইয়া কবিতা লিখিতাম। সেটাও বোধ হয় একটা মুক্তির লক্ষণ। তাহার আগে কোমর বাঁধিয়া যখন খাতায় কবিতা লিখিতাম তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই রীতিমত কাব্য লিখিবার একটা পণ ছিল, কবিযশের পাকা সেহায় সেগুলি জমা হইতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া মনে মনে হিসাব মিলাইবার একটা চিন্তা ছিল, কিন্তু শ্লেটে যাহা লিখিতাম তাহা লিখিবার খেয়ালেই লেখা। শ্লেট জিনিসটা বলে, 'ভয় কী তোমার, যাহা খুশি তাহাই লেখো-না, হাত বুলাইলেই তো মুছিয়া যাইবে।'

"কিন্তু এমনি করিয়া দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল; আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল, 'বাঁচিয়া গেলাম, যাহা লিখিতেছি এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।'

"ইহাকে কেহ যেন গর্ব্বোচ্ছ্বাস বলিয়া মনে না করেন। পূর্ব্বের অনেক রচনায় বরঞ্চ গর্ব্ব ছিল, কারণ গর্ব্বই সে-সব লেখার শেষ বেতন। নিজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হঠাৎ নিঃসংশয়তা অনুভব করিবার যে-পরিতৃপ্তি তাহাকে অহংকার বলিব না। ছেলের প্রতি মা-বাপের প্রথম যে-আনন্দ সে ছেলে সুন্দর বলিয়া নহে, ছেলে যথার্থ আমারই বলিয়া। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহারা গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু সে আর-একটা জিনিস। এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটাখালের মতো সিধা চলে না, আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম, কিন্তু এখন লেশমাত্র সংকোচ বোধ হইল না। স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় নিয়মকে ভাঙে, তাহার পরে নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে, তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।

"আমার সেই উচ্ছৃঙ্খল কবিতা শোনাইবার একজনমাত্র লোক তখন ছিলেন— অক্ষয়বাবু। তিনি হঠাৎ আমার এই লেখাগুলি দেখিয়া ভারি খুশি হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কাছ হইতে অনুমোদন পাইয়া আমার পথ আরও প্রশস্ত হইয়া গেল।

"বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক, যেমন—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

তিনমাত্রা জিনিসটা দুইমাত্রার মতো চৌকা নহে, তাহা গোলার মতো গোল, এইজন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়, তাহার এই বেগবান গতির নৃত্য যেন ঘন ঘন ঝংকারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিকেলে ধাবমান হওয়ার মতো। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। মনে কোনো ভয়ডর যেন ছিল না। লিখিয়া গিয়াছি, কাহারও কাছে কোনো জবাবদিহির কথা ভাবি নাই। কোনোপ্রকার পূর্ব্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে-জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে, যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিসকে পাই নাই। হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম, আমার হাতে শৃঙ্খল পরানো নাই। সেইজন্যই হাতটাকে যেমন-খুশি ব্যবহার করিতে পারি এই আনন্দটাকে প্রকাশ করিবার জন্যই হাতটাকে যথেচ্ছ ছুঁড়িয়াছি।

"আমার কাব্য লেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্যহিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব, মূর্ত্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।"

চিঠিপত্র ৯ ॥ শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র : ১৫ নভেম্বর ১৯৩১

"...লিখেচ সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রভাতসঙ্গীত ছবি ও গান পড়চ। অঙ্কুর যদিও উদ্ভিদ জাতীয় তবু তাকে গাছ বলা চলে না, ঐ লেখাগুলিও তেমনি কাকুতি

কিন্তু কাব্য নয়। ওতে এই সহজ কথাটার প্রমাণ হয় যে এক সময়ে আমি বালক ছিলুম। অমৃতং বালভাষিতং বলে একটা কথা আছে— কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হলে সেই বালভাষিতকে কেউ রক্ষা করে না— করলেও সেই অমৃত ভদ্রলোকের পাতে দেবার যোগ্য থাকে না।”

সঞ্চয়িতা (১৩৩৮) ॥ ভূমিকা

“…সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চল্‌চে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ। বালক যদি প্রধানদের সভায় গিয়ে ছেলেমানুষী করে তবে সেটা সহ্য করা বালকদের পক্ষেও ভালো নয় প্রধানদের পক্ষেও নয়। এও সেই রকম। ঐ তিনটি কবিতাগ্রন্থের আর কোনো অপরাধ নেই কেবল একটি অপরাধ লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখী হ’য়ে ওঠে নি, এটাতে কেউ দোষ দেবে না কিন্তু তাকে পাখী বল্লে দোষ দিতেই হবে।

“ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই সঙ্কলনে ঐ তিনটি বইয়ের যে কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না।…”

রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, আশ্বিন ১৩৪৬ ॥ ভূমিকা

“এই গ্রন্থাবলীতে আমার কাব্যরচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। তার পূর্বেও অনেক লেখা লিখেছি কিন্তু সেগুলিকে লুপ্ত করবার চেষ্টা করেছি অনাদরে। হাতের অক্ষর পাকাবার যে খাতা ছিল বাল্যকালে সেগুলিকে যেমন অনাদরে রাখি নি এও তেমনি। সেগুলি ছিল যাকে বলে কপিবুক, বাইরে থেকে মডেল লেখা নকল করবার সাধনায়। কাঁচা বয়সে পরের লেখা মকৃশ করে আমরা অক্ষর ছেঁদে থাকি বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধ্যেও নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে পরিণতিক্রমে সেইটেই বাইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ণ করে স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেইরকম কপিবুকের কবিতা।

“সেই কপিবুক যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসংগীত। তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস

ধরে নি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে। সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ প'রে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।"

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট। / উপন্যাস। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। / প্রণীত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / পৌষ ১৮০৪ শক।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র [২], উপহার ৵০, ৩০৪, উপসংহার [১]

প্রকাশ ১১ জানুয়ারি ১৮৮৩। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য ১।০

গ্রন্থোৎসর্গ

এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি 'শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী শ্রীচরণেষু' উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গপত্র ও উৎসর্গ-কবিতা রবীন্দ্রগ্রন্থাবলীতেও (১৩১১) ছিল, পরে বাদ যায়, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৪৬) প্রকাশকালে পুনরায় সংকলিত হয়।[১] বর্তমানে বউ-ঠাকুরানীর হাটে উহা মুদ্রিত হয়।

ভ্রমসংশোধন, তৃতীয় ছত্র : অশুদ্ধ, 'বিমল প্রশান্ত সুখে', শুদ্ধ 'মুখে'। ভ্রমটি 'দ্বিতীয় সংস্করণ' হইতে প্রবেশ করিয়াছিল।

সাময়িক পত্রে প্রকাশ

বউ-ঠাকুরানীর হাট প্রথমে ভারতী পত্রে (কার্তিক ১২৮৮-আশ্বিন ১২৮৯) মুদ্রিত হইয়াছিল।

সংস্করণ

১৮৮৭ সালে এই গ্রন্থের 'দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশিত হয়—

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট। / (রাজা বসন্ত রায় ১ / উপন্যাস। /) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। / দ্বিতীয় সংস্করণ। / কলিকাতা / শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী এণ্ড কোং / পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা। / ৫৪নং কলেজষ্ট্রীট। / ১৮৮৭

---

১ চতুর্থ ছত্রে 'দেখিবারে আশ' স্থলে 'দেখিবারে মন' পাঠ-পরিবর্তন-সহ।

আখ্যাপত্রের পিছনে

১০০ নং বহুবাজারষ্ট্রীট ইণ্ডিয়াপ্রেসে / শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত। / এবং ৫৪ নং কলেজষ্ট্রীটে / শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী এণ্ড কোং দ্বারা / প্রকাশিত।

এই 'দ্বিতীয় সংস্করণ', পরিচ্ছেদ-সংখ্যা, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ইত্যাদি হইতে যতদূর জানা যায়, বস্তুতঃ পুনর্মুদ্রণ।[১]

আখ্যাপত্রে যে 'রাজা বসন্ত রায়' শব্দগুলি যোগ করা হইয়াছে তাহার কারণ এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে— ইহার কিছুকাল পূর্বে বউ-ঠাকুরানীর হাটের কেদারনাথ চৌধুরী -কৃত যে নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়' সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া (৩ জুলাই ১৮৮৬, ন্যাশনাল রঙ্গমঞ্চ)[২] জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহা যে এই গ্রন্থেরই কাহিনী অবলম্বনে রচিত পাঠকের নিকটে সে কথার নির্দেশ।

পরবর্তীকালে বউ-ঠাকুরানীর হাটের প্রভূত সংস্কার সাধিত হয়। কোনো কোনো পরিচ্ছেদ বর্জিত হয়, কোনো পরিচ্ছেদ অংশত স্থানান্তরিত, অন্য পরিচ্ছেদের সহিত যুক্ত বা অংশত বর্জিত হয়, বিভিন্ন পরিচ্ছেদের অনেক অংশ বর্জিত বা পরিবর্ধিত হয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডের (বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৪৬) গ্রন্থপরিচয় অংশে লিখিত হইয়াছিল—

"প্রথম সংস্করণের প্রথম পরিচ্ছেদ বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণে [শ্রাবণ ১৩৩৯] নাই; কাহিনীটির শেষ দৃশ্যের এক অংশ প্রথম পরিচ্ছেদেই নিবদ্ধ করা হইয়াছিল; তাহা চত্বারিংশ [বর্তমান সপ্তত্রিংশ] পরিচ্ছেদেও ভাষান্তরে লিপিবদ্ধ ছিল।

---

১ রবীন্দ্রভারতী-সমিতির সংগ্রহে বউ-ঠাকুরানীর হাট গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের যে কপি আছে তাহাতে দুই স্থানে সংশোধন আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর বলিয়া অনুমান হয়; কতকগুলি স্থানে নীল পেনসিলে কাটিয়া দেওয়া, তাহাও রবীন্দ্রনাথের হওয়াই সম্ভব। এ পরিবর্তনগুলি "দ্বিতীয় সংস্করণে" করা হয় নাই। পরবর্তীকালে ওই সংশোধনগুলি করা হইয়াছে।

২ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (১৯৪৫), পৃ. ৩৯

"প্রথম সংস্করণের সপ্তদশ পরিচ্ছেদ বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণে নাই।

"প্রথম সংস্করণের ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ পূর্বতন (প্রথম সংস্করণে ২৫শ ও বর্তমান সংস্করণে ২৩শ) পরিচ্ছেদের শেষে যুক্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট অংশ বর্জিত।

"এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন পরিচ্ছেদে অনেক অংশ পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে।"[১]

নাট্যরূপ

বউ-ঠাকুরানীর হাটের কাহিনী অবলম্বনে কবি-কৃত নাটক প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬); বউ-ঠাকুরানীর হাটে মুদ্রিত অনেক গান ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তের পুনর্লিখিত রূপ পরিত্রাণ (১৩৩৬)। কেদারনাথ চৌধুরী -কৃত নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়'-এর কথা পূর্বে প্রসঙ্গত উল্লিখিত হইয়াছে; ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না আমাদের জানা নাই।

কবির মন্তব্য

রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণের জন্য কবি বউ-ঠাকুরানীর হাটের 'সূচনা' লিখিয়া দিয়াছিলেন (রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩৪৬); নিম্নে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল—

"অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।

"প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারি প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বউ-ঠাকুরানীর হাট গল্পে— একটা রোম্যাণ্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্প বয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চারিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট

১ অপিচ উল্লেখযোগ্য যে, "উপসংহার" অংশ শেষ পরিচ্ছেদের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

কাঠামোর মধ্যে। আজো হয়তো এই গল্পটার দিকে ফিরে চাওয়া যেতে পারে। এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি; সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়ে নি তাতে। কিন্তু আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে। বুদ্ধির বাধাহীন পথে তার খেয়াল যা তা কাণ্ড করত বসে, তার থেকে প্রাথমিক মনের একটা কিছু কারিগরি বেরিয়ে পড়ে।

"সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে— এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।

"এই উপলক্ষে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস-লেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।"

বউ-ঠাকুরানীর হাটে ব্যবহৃত গান

বউ-ঠাকুরানীর হাটে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে নিম্নলিখিত গানগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে—

১. বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ
২. আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম অনেক দিনের পরে
৩. মলিন মুখে ফুটুক হাসি জুড়াক দুনয়ন

৪. সারা বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা
৫. ওরে যেতে হবে আর দেরী নাই
৬. আমার যাবার সময় হল আমায় কেন রাখিস ধরে
৭. মা আমি তোর কি করেছি
৮. আমিই শুধু রইনু বাকী
৯. আর কি আমি ছাড়ব তোরে
১০. আজ আমার আনন্দ দেখে কে।

এতদ্‌ব্যতীত বউ-ঠাকুরানীর হাটের ভারতী ১২৮৮ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত কিস্তি হইতে একটি গান গীতবিতানে (তৃতীয় খণ্ড, আশ্বিন ১৩৫৭) মুদ্রিত হইয়াছে—

১১. কবরীতে ফুল শুকালো

প্রভাত সঙ্গীত। / শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / বৈশাখ ১৮০৫ শক।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, সূচীপত্র, অশুদ্ধি-শোধন, গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন, [।৶০], উপহার-কবিতা ২, প্রবেশক-কবিতা ॥৵০, ১২০

প্রকাশ [১১ মে ১৮৮৩]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০ ? মূল্য আট আনা

সূচী

১. স্নেহ উপহার ॥ আয়রে বাছা কোলে বসে চা' মোর মুখ পানে [গ্রন্থোৎসর্গ]

২. প্রভাত বিহঙ্গের গান (আহ্বান সঙ্গীত)। ওরে তুই জগৎফুলের কীট [প্রবেশক]

৩. নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। আজি এ প্রভাতে প্রভাত-বিহগ[১]
ভারতী। অগ্রহায়ণ ১২৮৯
অভিমানিনী নির্ঝরিণী। মহান্ জলধি জলে[২]
ভারতী। অগ্রহায়ণ ১২৮৯

৪. প্রভাত-উৎসব। হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
ভারতী। পৌষ ১২৮৯

৫. অনন্ত জীবন। অধিক করি না আশা
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। পৌষ ১৮০৪ শক

৬. অনন্ত মরণ। কোটি কোটি ছোট ছোট মরণেরে লয়ে
ভারতী। আশ্বিন ১২৮৯

১ "রবীন্দ্রকাব্যে পাঠভেদ, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" (দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৩৬৯) প্রবন্ধে প্রভাতসংগীতের বিভিন্ন সংস্করণে কবিতাটির পাঠ-পরিবর্তনের বিশদ বিবরণ সংকলিত হইয়াছে।

২ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে বলিয়া সংখ্যাযুক্ত হইল না। পরে উদ্ধৃত গ্রন্থকারের 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

৭. পুনর্ম্মিলন। কিসের হরষ কোলাহল
ভারতী। চৈত্র ১২৮৯

৮. প্রতিধ্বনি। অয়ি প্রতিধ্বনি

৯. মহাস্বপ্ন। পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন
ভারতী। মাঘ ১২৮৮

১০. সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। দেশ-শূন্য, কাল-শূন্য, জ্যোতি-শূন্য মহাশূন্য-'পরি
ভারতী। চৈত্র ১২৮৮

১১-১৫. [বিদেশী ফুলের গুচ্ছ]

কবি। ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া। Victor Hugo
ভারতী। আষাঢ় ১২৮৮

বিসর্জ্জন। যে তোরে বাসেরে ভাল। Victor Hugo
ভারতী। আষাঢ় ১২৮৮

তারা ও আঁখি।[১] কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস। Victor Hugo
ভারতী। আষাঢ় ১২৮৮

সূর্য্য ও ফুল। মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম। Victor Hugo
ভারতী। আষাঢ় ১২৮৮

সম্মিলন। সেথায় কপোত-বধূ লতার আড়ালে। Shelley
ভারতী। কার্ত্তিক ১২৮৮

১৬. স্রোত। জগত-স্রোতে ভেসে চল'
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বৈশাখ ১৮০৫ শক

১৭. শরতে প্রকৃতি। কই গো প্রকৃতি রাণী
ভারতী। আশ্বিন ১২৮৭

১৮. চেয়ে থাকা। মনেতে সাধ যে দিকে চাই

১৯. শীত। পাখী বলে আমি চলিলাম
ভারতী। মাঘ ১২৮৭

২০. সাধ। অরুণময়ী তরুণ উষা
ভারতী। বৈশাখ ১২৯০

---

১ সূচীপত্রে আঁখি ও তারা। গ্রন্থে তারা ও আঁখি।

২১. সমাপন। আজ আমি কথা কহিব না[১]

গ্রন্থকারের 'বিজ্ঞাপন'

বিজ্ঞাপন

প্রভাত-সঙ্গীত প্রকাশিত হইল। "অভিমানিনী নির্ঝরিণী" নামক কবিতাটি আমার লিখিত নহে। "নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ" রচিত হইলে পর আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু[২] তাহারই প্রসঙ্গ ক্রমে "অভিমানিনী নির্ঝরিণী" রচনা করেন। উভয় কবিতাই ভারতীতে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে যে একটি আজন্ম-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন না করিয়া দুটিকেই একত্র রক্ষা করিলাম।

"শরতে-প্রকৃতি", "শীত", ও গুটিকতক অনুবাদ ব্যতীত প্রভাত-সঙ্গীতের আর সমুদয় কবিতা গুলিই সম্প্রতি লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার।

সংস্করণ

চৈত্র ১৮১৩ শকে প্রভাত-সঙ্গীতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়—

প্রভাত-সঙ্গীত। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / দ্বিতীয় সংস্করণ। / (সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত) / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত/ ও শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের / দ্বারা প্রকাশিত। / চৈত্র ১৮১৩ শক। / মূল্য ৷৷০ আট আনা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, উৎসর্গপত্র, সূচীপত্র [৬], প্রবেশক-কবিতা ৷৷/০, ৯৬

প্রকাশ [১১ এপ্রিল ১৮৯২]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য আট আনা।

---

১ সাময়িক পত্রে প্রভাতসংগীতের কবিতাপ্রকাশের সূচী প্রধানত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস -রচিত রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী (পৌষ-মাঘ ১৩৪৬) হইতে গৃহীত।

২ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

দ্বিতীয় সংস্করণে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি বর্জিত হয়—

স্নেহ-উপহার[১]

শরতে প্রকৃতি

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা অভিমানিনী নির্ঝরিণীও বর্জিত হয়।

'স্রোত' কবিতাটি অনুবাদগুচ্ছের পূর্বে বসানো হয়।

১৩০৩ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীকে প্রভাতসংগীতের তৃতীয় সংস্করণ বলা যাইতে পারে— এই সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে নিম্নলিখিত কবিতা-গুলি বর্জিত হয়—

মহাস্বপ্ন

চেয়ে থাকা

'প্রভাত বিহঙ্গের গান (আহ্বান সঙ্গীত)' কবিতাটির নাম শুধু 'আহ্বান সঙ্গীত' করা হইয়াছে।

এই কাব্যগ্রন্থাবলীতে প্রভাতসংগীতে প্রকাশিত অনুবাদগুলি, অন্যত্র প্রকাশিত অনুবাদ -সহ, একটি স্বতন্ত্র 'অনুবাদ' বিভাগে মুদ্রিত, তবে প্রভাতসংগীতের 'সম্মিলন' বর্জিত।

অতঃপর উল্লেখযোগ্য, ১৩১০ সালে প্রকাশিত মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ।

"মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাতসঙ্গীতের কবিতাগুলিকে নিষ্ক্রমণ নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্ত্তা।" —জীবনস্মৃতি, প্রভাতসঙ্গীত অধ্যায়।

নিষ্ক্রমণ ভাগে নির্বাচিত কবিতাগুলি এই—

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

প্রভাত-উৎসব

অনন্ত জীবন

পুনর্ম্মিলন

স্রোত

প্রতিধ্বনি

এই কাব্যগ্রন্থের সপ্তম ভাগে 'শিশু' গ্রন্থে খণ্ডিত আকারে 'শীত' ও 'সাধ'

---

১ বর্তমান বিবরণের 'গ্রন্থোৎসর্গ' বিভাগে পুনর্মুদ্রিত হইল।

কবিতা গৃহীত হইয়াছে।

প্রভাতসংগীতে প্রকাশিত অনুবাদ-কবিতা 'বিসর্জ্জন', এবং 'সূর্য্য ও ফুল' উক্ত 'শিশু' বিভাগে মুদ্রিত।

[১৯১১] সালে প্রভাতসংগীতের একটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়—

প্রভাত সঙ্গীত / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / মূল্য ছয় আনা।

আখ্যাপত্রের পিছনে

প্রকাশক / শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র / ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস / ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা / কান্তিক প্রেস/ ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা / শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

প্রকাশ [২০ ডিসেম্বর ১৯১১]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য ছয় আনা

ইহাকে প্রভাতসংগীতের নূতন সংস্করণ বলা যাইতে পারে। কবিতা-সংখ্যায় ইহা দ্বিতীয় সংস্করণের অনুরূপ, তবে 'শীত' কবিতাটি শিশু হইতে প্রভাতসংগীতে পুনর্গৃহীত হয় নাই।

১৯১৫ সালে ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থে'র প্রথম খণ্ডে প্রভাতসংগীত অন্তর্ভুক্ত হয়, ইহার কবিতা-সংখ্যা ১৯১১ সংস্করণের অনুরূপ।

১৯৩৯ সালে বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে প্রভাতসংগীত অন্তর্ভুক্ত হয়, বিশ্বভারতী-পুনর্মুদ্রণ (অগ্রহায়ণ ১৩৪৫) অবলম্বনে ইহা মুদ্রিত হয়। অনুবাদ কয়টি বর্জিত হয় ও স্বতন্ত্র অনুবাদ-বিভাগের অপেক্ষায় থাকে।

কোনো কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কিছু পরিবর্তন করেন।

গ্রন্থোৎসর্গ

প্রথম সংস্করণে 'স্নেহ-উপহার' কবিতাসহ গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল—

শ্রীমতী ইন্দিরা—

প্রাণাধিকাসু

বাব্‌লা।

আয়রে বাছা কোলে বসে চা' মোর মুখ পানে,

হাসি-খুসী প্রাণ খানি তোর প্রভাত ডেকে আনে।

আমায় দেখে আসিস্ ছুটে, আমায় বাসিস্ ভালো,
কোথা হ'তে পড়লি প্রাণে তুইরে উষার আলো!

দেখ্‌রে, প্রাণে, স্নেহের মত, শাদা শাদা জুঁই ফুটেছে।
দেখ্‌রে, আমার গানের সাথে ফুলের গন্ধ জড়িয়ে গেছে।
গেঁথেছিরে গানের মালা, ভোরের বেলা বনে এসে
মনে বড় সাধ হয়েছে পরাব তোর এলোকেশে!
গানের সাথে ফুলের সাথে মুখখানি মানাবে ভাল,
আয়রে তবে আয়রে মেয়ে দেখ্‌রে চেয়ে রাত পোহালো!
কচি মুখটি ঘিরে দেব ললিত রাগিণী দিয়ে,
বাপের কাছে মায়ের কাছে দেখিয়ে আস্‌বি ছুটে গিয়ে!

চাঁদনি রাতে বেড়াই ছাতে মুখ খানি তোর মনে পড়ে,
তোর কথাটাই কিলিবিলি মনের মধ্যে নড়ে চড়ে!
হাসি হাসি মুখখানি তোর ভেসে ভেসে বেড়ায় কাছে,
হাসি যেন এগিয়ে এল, মুখটি যেন পিছিয়ে আছে!
কচি প্রাণের আনন্দ তোর, ভাঙ্গা বুকে দে ছড়িয়ে,
ছোট দুটি হাত দিয়ে তোর, গলাটি মোর ধর্ জড়িয়ে!
বিজন প্রাণের দ্বারে ব'সে করবিরে তুই ছেলেখেলা,
চুপ করে তাই বসে বসে দেখ্‌ব আমি সন্ধেবেলা।
কোথায় আছিস্ সাড়া দেরে, বুকের কাছে আয়রে তবে,
তোর মুখেতে গানগুলি মোর কেমন শোনায় শুন্‌তে হবে!

আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একটা বাব্‌লা গাছের মত,
বড় বড় কাঁটার ভয়ে তফাৎ থাকে লতা যত।
সকাল হলে মনের সুখে ডালে ডালে ডাকে পাখী,
(আমার) কাঁটা ডালে কেউ ডাকে না চুপ করে তাই দাঁড়িয়ে থাকি!
নেইবা লতা এল কাছে, নেইবা পাখী বস্‌ল শাখে,
যদি আমার বুকের কাছে বাব্‌লা ফুলটি ফুটে থাকে!
বাতাসেতে দুলে দুলে ছড়িয়ে দেয়রে মিষ্টি হাসি,
কাঁটা-জন্ম ভুলে গিয়ে তাই দেখে হরষে ভাসি!

দূর কর ছাই, ঝোঁকের মাথায় বলে ফেল্লেম কত কি যে ?
কথাগুলো ঠেকৃচে যেন চোখের জলে ভিজে ভিজে !

রবি কাকা।

কবির মন্তব্য

জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে প্রভাতসংগীতের প্রথম কবিতা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছিলেন—

"একটি অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্ত্তির দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে !"

মানুষের ধর্ম গ্রন্থের অন্তর্গত 'মানবসত্য' প্রবন্ধে প্রভাতসংগীত বিষয়ে লিখিয়াছেন—

"সেই সময়ে [প্রভাতসংগীত রচনার অব্যবহিত পূর্বে] এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে যে-ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে—"প্রভাতসঙ্গীতে"র মধ্যে। তখন স্বতঃই যে-ভাব আপনাকে প্রকাশ করেচে, তাই ধরা পড়েচে প্রভাত-সংগীতে।"

এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি নানা স্থানে লিখিয়াছেন, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ও প্রভাতসংগীতের অন্য কোনো কোনো কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—প্রধানত জীবনস্মৃতির (১৩১৯, ১৯১২) 'প্রভাত সঙ্গীত' অধ্যায়ে, The Religion of Man (১৯৩১) গ্রন্থের 'The Vision' অধ্যায়ে, মানুষের ধর্ম (১৯৩৩) গ্রন্থের 'মানবসত্য' অধ্যায়ে এ-সকল সন্নিবিষ্ট আছে ; জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে এ বিষয়ে প্রচলিত-জীবনস্মৃতির অতিরিক্ত কিছু মন্তব্য[১] আছে ; রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে (১৩৪৬, ১৯৩৯) প্রভাতসংগীত প্রকাশ-কালে তাহার ভূমিকায় ('কবির ভণিতা') এই গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন।

এই সকল মন্তব্যের কতকগুলি উদ্‌ধৃত হইল।

---

১ বিশ্বভারতী পত্রিকার কার্তিক-পৌষ ১৩৫০ সংখ্যায় সংকলিত 'জীবনস্মৃতির খসড়া'য় মুদ্রিত হয়। জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয় ও তথ্যপঞ্জীও দ্রষ্টব্য।

জীবনস্মৃতির খসড়া পাণ্ডুলিপি

আমি সেইদিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" লিখিলাম।

সেদিন আমাদের বাড়ির সম্মুখে একটা গাধার বাচ্ছা বাঁধা ছিল, হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া একটি বাছুর আসিয়া তাহার ঘাড় চাটিয়া দিতে আরম্ভ করিল। এই অপরিচিত মূঢ় পশুশাবকটির ভাষাহীন স্নেহ-সম্ভাষণ দৃশ্যে একটা বিশ্বব্যাপী রহস্যবার্ত্তা আমার বুকের পাঁজরগুলার ভিতর দিয়া যেন বাজিয়া উঠিতে লাগিল।...

প্রভাত হল যেই কি জানি হল একি!
আকাশ পানে চাই কি জানি কারে দেখি!
প্রভাত বায়ু বহে কি জানি কি যে কহে,
মরম মাঝে মোর কি জানি কি যে হল!

এই উচ্ছ্বাস ও এই ভাষাকে বিদ্রূপ করা যাইতে পারে কিন্তু যে বালক ইহা রচনা করিয়াছিল তাহার পক্ষে ইহা কিছুই মিথ্যা ছিল না।...

দার্জিলিঙে প্রভাতসঙ্গীতের একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম প্রতিধ্বনি। সে কবিতা অনেকের কাছে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া ঠেকে। আমি তাহার যে অর্থ অনুমান করিয়াছি এই উপলক্ষ্যে তাহা বলিতে ইচ্ছা করি।

জগৎকে সাক্ষাৎ বস্তুরূপে যে দেখিতেছি— মাটিকে মাটি, জলকে জল, অগ্নিকে অগ্নি বলিয়া জানিতেছি তাহাতে আমাদের আবশ্যকের কাজ চলে সন্দেহ নাই। অনেকের পক্ষে অন্তত অধিকাংশ সময়ে জগৎ কেবল আবশ্যকের জগৎ হইয়াই থাকে। কিন্তু এই জগৎই যখন আমাদিগকে সৌন্দর্য্যে বিহ্বল রহস্যে অভিভূত করে তখন ইহা কেবল আমাদের পেট ভরায় না অন্তরঙ্গভাবে আমাদের অন্তঃকরণকে আলিঙ্গন করে— বস্তু যেন তখন তাহার বস্তুত্বের মুখোশ ফেলিয়া দিয়া চিত্তাবে আমাদের চিত্তকে প্রণয়-সম্ভাষণ করে। বস্তুজগৎ ভাবের অন্তঃপুরে সেই যে একটা বহু দূরের আভাস বহন করিয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়া প্রবেশ করে তাহাকেই আমি প্রতিধ্বনি বলিতেছি। জগতের এই মূর্ত্তি ফসলের কথা বলে না, ভূগোলবিবরণ ও ইতিবৃত্তের কথা বলে না— যেখানকার কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে আকুল করিয়া দেয় সে কোথাকার কথা? সে কোন্ জায়গা, যেখানে বিশ্বজগতের সমস্ত ধ্বনি প্রয়াণ করিতেছে এবং সেখান হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীতরূপে প্রতি-

ধ্বনিত হইয়া ভাবুকের অন্তঃকরণকে সেই রহস্যনিকেতনের দিকে আহ্বান করিতেছে!

অরণ্যের, পর্ব্বতের, সমুদ্রের গান,—
ঝটিকার বজ্রগীতিস্বর,—
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,—
চেতনার, নিদ্রার মর্ম্মর,—
বসন্তের, বরষার, শরতের গান,—
জীবনের, মরণের স্বর,—
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচর,—
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহ তপনের,
কোটি কোটি তারার সঙ্গীত,—
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানি রে হতেছে মিলিত!
সেইখানে একবার বসাইবি মোরে,—
সেই মহা আঁধার নিশায়
শুনিব রে আঁখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত
তোর মুখে কেমন শুনায়!

বিশ্বের সমস্ত আলোকের অতীত যে অসীম অব্যক্ত সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন, ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ— সেই বিশ্বলোকের অন্তরালের অন্তঃপুরে এই সমস্তই প্রয়াণ করিয়া সেখানকার কি আনন্দের আভাস সংগ্রহ পূর্ব্বক ভাবুকের অন্তঃকরণে নূতনভাবে অবতীর্ণ হইতেছে। জগৎটা যখন সেই অনির্ব্বচনীয়ের মধ্য দিয়া আমাদের মনে আসে তখন আমাদিগকে ব্যাকুল করে। তাহাকেই কবি বলিয়াছে:—

তোর মুখে পাখীদের শুনিয়া সঙ্গীত,
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,
গভীর রহস্যময় মরণের গান,
বালকের মধুমাখা স্বর,—
তোর মুখে জগতের সঙ্গীত শুনিয়া
তোরে আমি ভালবাসিয়াছি

তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি!

পাখীর ডাক শুধু ধ্বনিমাত্র, বায়ুর তরঙ্গ, কিন্তু তাহা যে গান হইয়া উঠিয়া আমার অন্তঃকরণকে মুগ্ধ করিতেছে এ ব্যাপারটা কোথা হইতে ঘটিল? পাখীর ডাক কোন্ আনন্দগুহার মধ্য হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া জগতের পরপার হইতে আমার এই ভাললাগাটা বহন করিয়া আনিল? এই সমস্ত ভাললাগার ভিতর হইতে যথার্থত কাহাকে আমার ভাল লাগিতেছে—তাহাকে বিশ্বময় খুঁজিয়া ফিরিতেছি কিন্তু দেখিতে পাই কই! কোথায় সে ছলনা করিয়া আছে!

জ্যোৎস্না-কুসুমবনে একাকী বসিয়া থাকি
আঁখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে—
বল্ মোরে বল্ অয়ি মোহিনী ছলনা
সে কি তোর তরে?
বিরামের গান গেয়ে সায়াহ্নবায়
কোথা বয়ে যায়!
তারি সাথে কেন মোর প্রাণ হু হু করে,
সে কি তোর তরে?
বাতাসে সুরভি ভাসে, আঁধারে কত না তারা,
আকাশে অসীম নীরবতা,—
তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায়
সে কি তোরি কথা?
ফুল হতে গন্ধ তার বারেক বাহিরে এলে
আর ফুলে ফিরিতে না পারে,
ঘুরে ঘুরে মরে চারিধারে;
তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি
ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়,
সে কি তোরে চায়?

জগতের সৌন্দর্য্য আমাদের মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে সে আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য কোন্ খানে? যেখান হইতে এই সৌন্দর্য্য প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে।...

আমি দেখিতেছি প্রভাতসঙ্গীতের প্রথম কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' আমার কবিতার আমার হৃদয়ের এই যাত্রাপথটির একটি রূপক-মানচিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল। এক সময় ছিল যখন হৃদয় আপনার অন্ধকার গুহার মধ্যে আপনি বদ্ধ ছিল :

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ-'পরে।

তাহার পর বাহিরের বিশ্ব কোন্ এক ছিদ্র বাহিয়া আলোকের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর ;
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখীর গান !
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

তাহার পর জাগ্রত দৃষ্টিতে যখন বিশ্বকে সে দেখিল— তখন প্রথম-দর্শনের আনন্দ-আবেগ।

প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
আলিঙ্গন তরে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়,
প্রভাতকিরণে পাগল হইয়া
জগৎ-মাঝারে লুটিতে চায় !

তাহার পরে দুই শ্যামল কূলের মধ্য দিয়া বিবিধ রূপ, বিবিধ সুখ, বিবিধ ভোগ, বিবিধ লেখার ভিতর দিয়া

যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব।
কে জানে কাহার কাছে !

শেষকালে যাত্রার পরিণামক্ষণে মহাসাগরের গান শুনা যায়—

সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

একটি অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্ত্তির দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে!

জীবনস্মৃতি ॥ প্রভাতসংগীত অধ্যায়

গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাসঙ্গীত ছাড়া কিছু-কিছু গদ্যও লিখিতাম। সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে, সেও একরকম যা খুশি তাই লেখা। ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এও সেইরকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটো ছোটো স্বল্পায়ু রঙিন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম; মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব— কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা। এই ছোটো ছোটো গদ্য লেখাগুলা এক সময়ে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থ-আকারে বাহির হইয়াছে; প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।

বোধ করি এই সময়েই 'বউঠাকুরানীর হাট' নামে এক বড়ো নবেল লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম।

এইরূপে গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়া গেলে জ্যোতিদাদা কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গি জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এখানেও একটু একটু করিয়া বউঠাকুরানীর হাট ও একটি একটি করিয়া সন্ধ্যাসঙ্গীত লিখিতেছি, এমন সময়ে আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কী উলটপালট হইয়া গেল।

একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্য্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল এ কি কেবলমাত্র সায়াহ্নের আলোকসম্পাতের একটি জাদু মাত্র। কখনোই তা নয়। আমি বেশ দেখিতে

পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে, আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা-কিছুকেই দেখিতে শুনিতে ছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছে বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে—তাহা আনন্দময়, সুন্দর। তাহার পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া জগৎকে দর্শকের মতো দেখিতে চেষ্টা করিতাম, তখন মনটা খুশি হইয়া উঠিত। আমার মনে আছে, জগৎটাকে কেমন করিয়া দেখিলে যে ঠিকমত দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে নিজের ভারলাঘব হয়, সেই কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করেছিলাম— কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হই নাই, তাহা জানি। এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, তাহা আজ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্য্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। সেইদিনই কিম্বা তাহার পরের দিন একটা ঘটনা ঘটিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। একটি লোক ছিল সে মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, "আচ্ছা মশায়, আপনি কি ঈশ্বরকে কখনো স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।" আমাকে স্বীকার করিতেই হইত, দেখি নাই; তখন সে বলিত, "আমি দেখিয়াছি।" যদি জিজ্ঞাসা করিতাম "কিরূপ দেখিয়াছ", সে উত্তর করিত, চোখের সম্মুখে বিজ্‌বিজ্‌ করিতে থাকেন। এরূপ মানুষের সঙ্গে তত্ত্বালোচনায়

কালযাপন সকল সময়ে প্রীতিকর হইতে পারে না। বিশেষত, তখন আমি প্রায় লেখার ঝোঁকে থাকিতাম। কিন্তু, লোকটা ভালোমানুষ ছিল বলিয়া তাহাকে বাধা দিতে পারিতাম না, সমস্ত সহিয়া যাইতাম।

এইবার, মধ্যাহ্নকালে সেই লোকটি যখন আসিল তখন আমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, "এসো এসো।" সে যে নির্বোধ এবং অদ্ভুতরকমের ব্যক্তি, তাহার সেই বহিরাবরণটি যেন খুলিয়া গেছে। আমি যাহাকে দেখিয়া খুশি হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম সে তাহার ভিতরকার লোক— আমার সঙ্গে তাহার অনৈক্য নাই, আত্মীয়তা আছে। যখন তাহাকে দেখিয়া আমার কোনো পীড়া বোধ হইল না, মনে হইল না যে আমার সময় নষ্ট হইবে, তখন আমার ভারি আনন্দ হইল— বোধ হইল, এই আমার মিথ্যা জাল কাটিয়া গেল, এতদিন এই সম্বন্ধে নিজেকে বারবার যে কষ্ট দিয়াছি তাহা অলীক এবং অনাবশ্যক।

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিলসমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গ-লীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর-এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না— বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারি দিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।

সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে-গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই; এখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ-সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে— সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্য্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে,

একটা গোরু আর-একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে-একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।...

প্রভাতসংগীতের গান থামিয়া গেল, শুধু তার দূর প্রতিধ্বনিস্বরূপ 'প্রতিধ্বনি' নামে একটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম। সেটা এমনি একটা অবোধ্য ব্যাপার হইয়াছিল যে, একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থনির্ণয় করিবার ভার লইয়াছিল। হতাশ হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন আমার কাছ হইতে গোপনে অর্থ বুঝিয়া লইবার জন্য আসিয়াছিল। আমার সহায়তায় সে বেচারা যে বাজি জিতিতে পারিয়াছিল, এমন আমার বোধ হয় না। ইহার মধ্যে সুখের বিষয় এই যে, দুজনের কাহাকেও হারের টাকা দিতে হইল না। হায় রে, যেদিন পদ্মের উপরে এবং বর্ষার সরোবরের উপরে কবিতা লিখিয়াছিলাম সেই অত্যন্ত পরিষ্কার রচনার দিন কতদূরে চলিয়া গিয়াছে!

কিছু-একটা বুঝাইবার জন্য কেহ তো কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এইজন্য কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে 'বুঝিলাম না' তখন বিষম মুশকিলে পড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া বলে 'কিছু বুঝিলাম না', তাহাকে এই কথা বলিতে হয়, ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ। উত্তর শুনি, 'সে তো জানি, কিন্তু খামকা গন্ধই বা কেন, ইহার মানেটা কী।' হয় ইহার জবাব বন্ধ করিতে হয়, নয় খুব একটু ঘোরালো করিয়া বলিতে হয়, প্রকৃতির ভিতরকার আনন্দ এমনি করিয়া গন্ধ হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু মুশকিল এই যে, মানুষকে যে-কথা দিয়া কবিতা লিখিতে হয় সে-কথার যে মানে আছে। এইজন্যই তো ছন্দোবন্ধ প্রভৃতি নানা উপায়ে কথা কহিবার স্বাভাবিক পদ্ধতি উলটপালট করিয়া দিয়া কবিকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, যাহাতে কথার ভাবটা বড়ো হইয়া কথার অর্থটাকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবটা তত্ত্বও নহে, বিজ্ঞানও নহে, কোনোপ্রকারের কাজের জিনিস নহে, তাহা

চোখের জল ও মুখের হাসির মতো অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান কিম্বা আর-কোনো বুদ্ধিসাধ্য জিনিস মিলাইয়া দিতে পার তো দাও, কিন্তু সেটা গৌণ। খেয়ানৌকায় পার হইবার সময় যদি মাছ ধরিয়া লইতে পার তো সে তোমার বাহাদুরি, কিন্তু তাই বলিয়া খেয়ানৌকা জেলেডিঙি নয়; খেয়ানৌকায় মাছ রপ্তানি হইতেছে না বলিয়া পাটুনিকে গালি দিলে অবিচার করা হয়।

প্রতিধ্বনি কবিতাটা আমার অনেকদিনের লেখা; সেটা কাহারও চোখে পড়ে না সুতরাং তাহার জন্য কাহারও কাছে আজ আমাকে জবাবদিহি করিতে হয় না। সেটা ভালোমন্দ যেমনি হোক, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি, ইচ্ছা করিয়া পাঠকদের ধাঁধা লাগাইবার জন্য সে কবিতাটা লেখা হয় নাই এবং কোনো গভীর তত্ত্বকথা ফাঁকি দিয়া কবিতায় বলিয়া লইবার প্রয়াসও তাহা নহে।

আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে-একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর-কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি এবং কহিয়াছে—

ওগো প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না।

বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি জাগিতেছে— প্রিয়মুখ হইতে, বিশ্বের সমুদয় সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া যাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। কোনো বস্তুকে নয় কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালোবাসি; কেননা ইহা যে দেখা গেছে, একদিন যাহার দিকে তাকাই নাই আর-একদিন সেই একই বস্তু আমাদের সমস্ত মন ভুলাইয়াছে।

এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনা-পুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন্-একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে

কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে— এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্য্যে ব্যাকুল্ করে। গুণী যখন পূর্ণহৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন সেই এক আনন্দ ; আবার যখন সেই গানের ধারা তাঁহারই হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তখন সে এক দ্বিগুণতর আনন্দ। বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটেকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে, আমরা জগতের পরম পরিণামটিকে যেন অনির্ব্বচনীয়রূপে জানিতে পারি। যেখানে আমাদের সেই উপলব্ধি সেইখানে আমাদের প্রীতি ; সেখানে আমাদেরও মন সেই অসীমের অভিমুখীন আনন্দস্রোতের টানে উতলা হইয়া সেই দিকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চায়। সৌন্দর্য্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য্য। যে-সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে, তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দ্দিষ্ট ; তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইত অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য্য, তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘর-ছাড়া করিয়া দেয়। প্রতিধ্বনি কবিতার মধ্যে আমার মনের এই অনুভূতিই রূপকে ও গানে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে-চেষ্টার ফলটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এমন আশা করা যায় না, কারণ চেষ্টাটাই আপনাকে আপনি স্পষ্ট করিয়া জানিত না।

আরও কিছু অধিক বয়সে প্রভাতসঙ্গীত সম্বন্ধে একটা পত্র লিখিয়াছিলাম, সেটার এক অংশ এখানে উদ্ধৃত করি—

" 'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্ব্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে, সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়— যেমন নবদন্তোদ্গতা রেণুকা মনে করছেন, সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে দিতে পারেন। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায়, মনটা যথার্থ কী চায় এবং কী চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন ক'রে জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোনোকিছুর ভিতরে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়। প্রভাতসঙ্গীতে আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস,

সেইজন্যে ওটাতে আর-কিছুমাত্র বাছবিচার বাধ্যব্যবধান নেই।"[১]

প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা সাধারণভাবের ব্যাপ্ত আনন্দ ক্রমে আমাদিগকে বিশেষ পরিচয়ের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়— বিলের জল ক্রমে যেন নদী হইয়া বাহির হইতে চায়— তখন পূর্ব্বরাগ অনুরাগে পরিণত হয়। বস্তুত, অনুরাগ পূর্ব্বরাগের অপেক্ষা এক হিসাবে সংকীর্ণ। তাহা একগ্রাসে সমস্তটা না লইয়া ক্রমে ক্রমে খণ্ডে খণ্ডে চাখিয়া লইতে থাকে। প্রেম তখন একাগ্র হইয়া অংশের মধ্যেই সমগ্রকে, সীমার মধ্যেই অসীমকে উপভোগ করিতে পারে। তখন তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষ বিশেষের মধ্য দিয়াই অপ্রত্যক্ষ অশেষের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন সে যাহা পায় তাহা কেবল নিজের মনের একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাবানন্দ নহে— বাহিরের সহিত, প্রত্যক্ষের সহিত একান্ত মিলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের ভাবটি সর্ব্বাঙ্গীণ সত্য হইয়া উঠে।

মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাতসঙ্গীতের কবিতাগুলিকে 'নিষ্ক্রমণ' নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্ত্তা। তার পরে সুখ-দুঃখ-আলোক-অন্ধকারে সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে-একে খণ্ডে-খণ্ডে নানা সুরে ও নানা ছন্দে বিচিত্রভাবে বিশ্বের মিলন ঘটিয়াছে— অবশেষে এই বহুবিচিত্রের নানা বাঁধানো ঘাটের ভিতর দিয়া পরিচয়ের ধারা বহিয়া চলিতে চলিতে নিশ্চয়ই আর-একদিন আবার একবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া পৌঁছিবে, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি অনির্দ্দিষ্ট আভাসের ব্যাপ্তি নহে, তাহা পরিপূর্ণ সত্যের পরিব্যাপ্তি।

আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। নর্ম্মাল ইস্কুল হইতে চারিটার পর ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম, ঘন সজল নীলমেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে— মনটা তখনই এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে আবৃত হইয়া গেল— সেই মুহূর্ত্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগি করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে-মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত

১ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৪৫। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯।

তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাতসমুদ্র তেরোনদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল, তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্ত্তন শুরু হইল; চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুগ্ণ হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে-সামঞ্জস্যটা ভাঙ্গিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধ দ্বার জানি না কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম। সহজকে দুরূহ করিয়া তুলিয়া যখন পাওয়া যায় তখনই পাওয়া সার্থক হয়। এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাতসঙ্গীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন বিচ্ছেদ ও পুনর্ম্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল। শেষ হইয়া গেল বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এই পালাটাই আবার আরও একটু বিচিত্র হইয়া শুরু হইয়া, আবার আরও একটা দুরূহতর সমস্যার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণামে পৌঁছিতে চলিল। বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে— পর্ব্বে পর্ব্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে— প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায়, কেন্দ্রটা একই।...

ভূমিকা: কাব্যগ্রন্থ (১৯১৫): আশ্বিন ১৩২১

প্রভাতসঙ্গীতের কবিতাগুলি অস্পষ্ট কল্পনার কুহেলিকা হইতে বাহির হইবার পথে আসিয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে অস্ফুটতা জড়িত হইয়া রহিল তাহা মোচন করিবার উপায় নাই। ত্যাগ করিতে হইলে অধিকাংশই ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ নির্ব্বাসন দণ্ড দিবার মেয়াদ এখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এই আমার কাব্যসংগ্রহে এমন অনেক রচনা স্থান পাইল যাহারা কেবলমাত্র পরিত্যক্ত নদীপথের নুড়িগুলির মতো পথের ইতিহাস নির্দ্দেশ করিবে কিন্তু রসধারাকে রক্ষা করিবে না।

'মানবসত্য'। মানুষের ধর্ম

... সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে, যে-ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে—"প্রভাতসঙ্গীতে"র মধ্যে। তখন স্বতই যে-ভাব আপনাকে প্রকাশ করেছে তাই ধরা পড়েছে প্রভাতসঙ্গীতে। পরবর্তী কালে চিন্তা করে লিখলে তার উপর ততটা নির্ভর করা যেত না। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, "প্রভাতসঙ্গীত" থেকে যে কবিতা শোনাব তা কেবল তখনকার ছবিকে স্পষ্ট দেখাবার জন্যে, কাব্য হিসাবে তার মূল্য অত্যন্ত সামান্য। আমার কাছে এর একমাত্র মূল্য এই যে, তখনকার কালে আমার মনে যে-একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস এসেছিল তা এতে ব্যক্ত হয়েছে। তার ভাব অসংলগ্ন, ভাষা কাঁচা, যেন হাৎড়ে হাৎড়ে বলবার চেষ্টা। কিন্তু "চেষ্টা" বললেও ঠিক হবে না, বস্তুত চেষ্টা নেই তাতে, অস্ফুটবাক্ মন বিনা চেষ্টায় যেমন ক'রে পারে ভাবকে ব্যক্ত করেছে, সাহিত্যের আদর্শ থেকে বিচার করলে স্থান পাওয়ার যোগ্য সে মোটেই নয়।

যে কবিতাগুলো পড়ব তা একটু কুণ্ঠিতভাবেই শোনাব, উৎসাহের সঙ্গে নয়। প্রথম দিনেই যা লিখেছি সেই কবিতাটাই আগে পড়ি। অবশ্য ঠিক প্রথম দিনেরই লেখা কি না, আমার পক্ষে জোর করে বলা শক্ত। রচনার কাল সম্বন্ধে আমার উপর নির্ভর করা চলে না, আমার কাব্যের ঐতিহাসিক যাঁরা তাঁরা সে কথা ভালো জানেন। হৃদয় যখন উদ্‌বেল হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য ভাবোচ্ছ্বাসে, এ হচ্ছে তখনকার লেখা। এ'কে এখনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। আমি বলেছি আমাদের এক দিক 'অহং', আর-একটা দিক 'আত্মা'। 'অহং' যেন খণ্ডাকাশ, ঘরের মধ্যেকার আকাশ, যা নিয়ে বিষয়-কর্ম মামলা-মকদ্দমা, এই সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই ; সেই আকাশ অসীম, বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে-ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বলতে যে-বিরাট পুরুষ, তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে— এক আমাতেই বদ্ধ, আর-এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে

পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ, যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।

জাগিয়া দেখিনু আমি, আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ-'পরে।

এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

গভীর— গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপনগীতি বিজন হৃদয়ে মোর।

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে লীলা, সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা, নানা নাম দিই তাকে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন, সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে সেই অহং-এর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখি নি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা, যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এল বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন

কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে, অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাট পুরুষ। সেই যে মহামানব, তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে। এই যে ডাক পড়ল, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে? এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে; ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার ক'রে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে শেষে পড়ে এক জায়গায় যেখানে—

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়—
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল। 'মানবধর্ম' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।

এর দু-চার দিন পরেই লিখেছি 'প্রভাত উৎসব।' একই কথা, আর-একটু স্পষ্ট করে লেখা—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।

এই তো সমস্তই মানুষের হৃদয়ের তরঙ্গলীলা। মানুষের মধ্যে স্নেহ প্রেম ভক্তির যে সম্বন্ধ সেটা তো আছেই। তাকে বিশেষ করে দেখা, বড়ো ভূমিকার মধ্যে দেখা, যার মধ্যে সে তার একটা ঐক্য, একটা তাৎপর্য লাভ করে। সেদিন যে দু-জন মুটের কথা বলেছি, তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখলুম, সে সখ্যের আনন্দ, অর্থাৎ এমন-কিছু যার উৎস সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্তের গভীরে। সেইটে দেখেই খুশি হয়েছিলুম। আরো খুশি হয়েছিলুম এইজন্যে যে, যাদের মধ্যে ওই আনন্দটা দেখলুম, তাদের বরাবর চোখে পড়ে না, তাদের অকিঞ্চিৎকর বলেই দেখে এসেছি। যে-মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলুম, অমনি

পরম সৌন্দর্যকে অনুভব করলুম। মানবসম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন। সে দেখা বালকের কাঁচা লেখায় আকুবাকু ক'রে নিজেকে প্রকাশ করেছে কোনোরকমে, পরিস্ফুট হয় নি। সে সময়ে আভাসে যা অনুভব করেছি, তাই লিখেছি। আমি যে যা-খুশি গেয়েছি, তা নয়। এ গান দুদণ্ডের নয়, এর অবসান নেই। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, এর অনুবৃত্তি আছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গে সকল মানুষের যোগ আছে। গান থামলেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।

কাল গান ফুরাইবে, তা বলে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত।
...
কিসের হরষ-কোলাহল
শুধাই তোদের, তোরা বল্।
আনন্দ-মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হতেছে কভু লীন,
চাহিয়া ধরণী-পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর-এক দিন।

এই যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্ছে, তা দেখি নি বহুদিন, সেদিন দেখলুম। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। "রসো বৈ সঃ।" রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্যে তাকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই অনুভূতিকে প্রকাশের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু ভালোরকম প্রকাশ করতে পারি নি। যা বলেছি অসম্পূর্ণ ভাবে বলেছি।

প্রভাতসঙ্গীতের শেষের কবিতা—

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হেরো আজি ভোরবেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারিদিকে,
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুখশোক।
আজ আমি গান গাহিব না।

এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, মন তখন কী ভাবে আবিষ্ট হয়েছিল, কোন্ সত্যকে মন স্পর্শ করেছিল। যা-কিছু হচ্ছে সেই মহামানবে মিলছে, আবার ফিরেও আসছে সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নানা রসে সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে। এটা উপলব্ধি হয়েছিল অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়। সে সময় বালকের মন এই অনুভূতি দ্বারা যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তারই অসম্পূর্ণ প্রকাশ প্রভাত-সঙ্গীতের মধ্যে। সেদিন অক্সফোর্ডে যা বলেছি[১], তা চিন্তা করে বলা। অনুভূতি থেকে উদ্ধার করে অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপর খাড়া করে সেটা বলা। কিন্তু, তার আরম্ভ ছিল এখানে। তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে তর্কের কিছু নেই। সেই দেখাকে তখন সত্যরূপে জেনেছি। এখনও বাসনা আছে, হয়তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে কোনো-এক শুভমুহূর্তে আবার তেমনি পরিপূর্ণভাবে কখনো দেখতে পাব। এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেইজন্যেই "আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি" উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখেছি তা নিয়ে তর্ক কেন— স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা, তার মৃত্যু নেই।

কবির ভণিতা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১

কড়ি ও কোমল রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয় নি। কাঁচা বয়সে মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীরের বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল; এইজন্যে ওগুলো হয়েছে ঢেউওয়ালা জলের উপরকার প্রতিবিম্বের মতো আঁকা-বাঁকা; ওরা মূর্ত হয়ে ওঠে নি সুতরাং কাব্যের পদবীতে পৌঁছতে পারে নি। সেইজন্যে আমার মত এই যে, কড়ি ও কোমলের পর থেকেই আমার কাব্য রচনা ভালো মন্দ সব কিছু নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বন করেছে।

প্রভাতসংগীতে যে অবস্থায় আমার প্রথম বিকাশোন্মুখ মন অপরিণত ভাবনা নিয়ে অপরিস্ফুট রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল তার কথা আজো আমার মনে আছে।

---

১ হিবার্ট লেক্‌চার্স, ১৯৩০

তার পূর্বে সন্ধ্যাসংগীতের পর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন চলছিল। প্রভাতসংগীতের ঋতুতে আপনাআপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা-আধটা মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় সে, ফসলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনাচাষের জমিতে। সেই সময়কার কথা মনে পড়ছে যখন কোথা থেকে কতকগুলো মত মনের অন্দরমহলে জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ঐগুলোর নাম, অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ, প্রতিধ্বনি। অনন্ত জীবন বলতে আমার মনে এই একটা ভাব এসেছিল, বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্বচরাচর গোচর-অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন মালা গাঁথা। এই ভাবনাটা ভিতরে ভিতরে মনকে খুব দোলা দিয়েছিল। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে একটা ধারণা আমার মধ্যে জেগে উঠেছিল যে আমার প্রতিমুহূর্তের সমস্ত ভালোমন্দ, আমার প্রতিদিনের সুখদুঃখের সমস্ত অভিজ্ঞতা চিরকালের মতো অনবরত একটা সৃষ্টিরূপ ধরছে, প্রকাশ-অপ্রকাশের নিত্য ওঠাপড়া নিয়ে যে সৃষ্টির স্বরূপ। এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই মনে হল মৃত্যু তা হলে কী? এক রকম করে তার উত্তর এসেছিল এই যে জীবন সব কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব কিছুকে চালায়। প্রতিমুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে, গাঁথা পড়ছে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। মুহূর্ত-কালীন মৃত্যুপরম্পরা দিয়ে মর্ত্যজীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবাল দ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে— আমার চেতনার সূত্রটিকে নিয়ে মৃত্যু এক-এক ফোঁড়ে এক-এক লোককে সম্বন্ধসূত্রে গাঁথবে। মনে আছে এই চিন্তায় আমার মনকে খুব আনন্দ দিয়েছিল। প্রতিধ্বনি কবিতা লিখেছিলুম যখন প্রথম গিয়েছিলুম দার্জিলিঙে। যে ভাবে তখন আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই যে, বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোন্ কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে রূপ হয়ে ধ্বনি হয়ে। এই ভাবগুলো যদিও অস্পষ্ট তবু আমার মনের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল, মুখে মুখে কোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাও করেছি। কিন্তু এ-

সকল ভাবনা তখন কী গদ্যে কী পদ্যে আলোচনা করবার সময় হয় নি, তখনো পাই নি ভাষাভারতীর প্রসাদ। তাই বলে রাখছি প্রভাতসংগীতে এ সমস্ত লেখার আর কোনো মূল্য যদি থাকে, সে ষোলো আনা সাহিত্যিক মূল্য নয়।

প্রভাতসংগীত হইতে বর্জিত কবিতা

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রথম সংস্করণ-ভুক্ত 'শরতে প্রকৃতি' কবিতা দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়। কবিতাটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হইল। প্রভাতসংগীতের প্রথম সংস্করণের (১৮৮৩) গ্রন্থকারের 'বিজ্ঞাপন' হইতে জানা যায় 'শরতে প্রকৃতি' "সম্প্রতি লিখিত" নহে, অর্থাৎ এটিকে 'কৈশোরক' রচনা বলা যাইতে পারে।

শরতে প্রকৃতি

কই গো প্রকৃতি রাণী, দেখি দেখি মুখ খানি,
কেন গো বিষাদ ছায়া রয়েছে অধর ছুঁয়ে ?
মুখানি মলিন কেন গো ?
এই যে মুহূর্ত্ত আগে হাসিতে ছিলে গো দেখি
পলক না পালটিতে সহসা নেহারি একি—
সরমে বিলীন যেন গো !
কেন তনু খানি ঢাকা, শুভ্র কুহেলিকা বাসে
মৃদু বিষাদের ভারে সুধীরে মুদিয়া আসে
নয়ন-নলিন হেন গো ?

ওই দেখ চেয়ে দেখ— একবার চেয়ে দেখ—
চাঁদের অধর দুটি হাসিতে ভাসিয়া যায়।
নিশীথের প্রাণে গিয়া সে হাসি মিশিয়া যায়।
সে হাসির কোলে বসি কানন গোলাপগুলি
আধ' আধ' কথা কহে সোহাগেতে দুলি দুলি !

সে হাসির পায়ে পড়ি নদীর লহরীগণ
যার যত কথা আছে বলিতে আকুল মন।

সে হাসির শিশু দুটি লতিকা মণ্ডপে গিয়া
আঁধারে ভাবিয়া সারা বাহিরিবে কোথা দিয়া !
সে হাসি অলসে ঢলি দিগন্তে পড়িয়া নুয়ে,
মেঘের অধর প্রান্ত একটু রয়েছে ছুঁয়ে।
বল তুমি কেন তবে,
এমন মলিন র'বে ?
বিষাদ স্বপন দেখে হাসির কোলেতে শুয়ে।
ঘোমটাটি খোল' খোল'
মুখ খানি তোল' তোল'
চাঁদের মুখের পানে চাও এক বার !
বল দেখি কারে হেরি এত হাসি তার !
নিলাজ বসন্ত যবে কুসুমে কুসুম ময়—
মাতিয়া নিজের রূপে হাসিয়া আকুল হয়,
মলয় মরমে মরি,
ফিরে হাহাকার করি—
বনের হৃদয় হোতে সৌরভ-উচ্ছ্বাস বয় !
তারে হেরি হয় না সে এমন হরষে ভোর,
কি চোখে দেখেছে চাঁদ ওই মুখ খানি তোর !
তুই তবু কেন কেন
দারুণ বিরাগে যেন
চাসনে চাঁদের হাসি চাঁদের আদর !
নাই তোর ফুল বাস,
নাইক প্রেমের হাস,
পাপিয়া আড়ালে বসি শুনায় না প্রেম গান !
কি দুখেতে উদাসিনী
যৌবনেতে সন্ন্যাসিনী !
কাহার ধেয়ানে মগ্ন শুভ্র বস্ত্র পরিধান ?

এক কালে ছিল তোর কুসুমিত মধু মাস—
হৃদয়ে ফুটিত তোর অজস্র ফুলের রাশ ;—

যৌবন উচ্ছ্বাসে ভোর
প্রাণের সুরভি তোর
পথিক সমীরে সব দিলি তুই বিলাইয়া!
শেষে গ্রীষ্ম তাপে জ্বলি
শুকাইল ফুল কলি,
সর্ব্বস্ব যাহারে দিলি সেও গেল পলাইয়া!
চেতনা পাইয়া শেষে সর্ব্বস্ব-হারা
সারাটি বরষা তুই কাঁদিয়া হইলি সারা!
এত দিন পরে বুঝি শুকাইল অশ্রুধারা!
আজ বুঝি মনে মনে করিলি দারুণ পণ
যোগিনী হইবি তুই পাষাণে বাঁধিবি মন!
বসন্তের ছেলেখেলা ভাল নাহি লাগে আর—
চপল চঞ্চল হাসি ফুলময় অলঙ্কার!
এখন যে হাসি হাস' আজি বিরাগের দিন,
শুভ্র শান্ত সুবিমল বাসনা লালসা হীন।
এত যে করিলি পণ—
তবুও ত ক্ষণে ক্ষণ
সেদিনের স্মৃতি-ছায়া হৃদয়ে বেড়ায় ভাসি।
প্রশান্ত মুখের পরে
কুহেলিকা ছায়া পড়ে—
ভাবনার মেঘ উঠে সহসা আলোক নাশি—
মুহূর্ত্তে কিসের লাগি
আবার উঠিস জাগি
আবার অধরে ফুটে সেই সে পুরানো হাসি!

ঘুমায়ে পড়িস যবে বিহ্বল রজনী শেষে,
অতি মৃদু পা টিপিয়া উষা আসে হেসে হেসে,
অতিশয় সাবধানে দুইটি আঙুল দিয়া
কুয়াশা ঘোমটা তোর দেয় ধীরে সরাইয়া!
অমনি তরুণ রবি পাশে আসি মৃদুগতি

মুদিত নয়ন তোর চুমে ধীরে ধীরে অতি।
শিহরিয়া কাঁপি উঠি
মেলিস নয়ন ছুটি
রাঙা হোয়ে ওঠে তোর কপোল-কুসুম-দল
শরমে আকুল ঝরে শিশির-নয়ন জল।

সুদূর আলয় হোতে তাড়াতাড়ি খেলা ভুলি
মাঝে মাঝে ছুটে আসে ত্বদণ্ডের মেঘ গুলি।
চমকি দাঁড়ায়ে থাকে, ওই মুখ পানে চায়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে কাঁদিয়া মরিয়া যায়!
কিসের বিরাগ এত, কি তপে আছিস ভোর!
এত কোরে সেধে সেধে
এত কোরে কেঁদে কেঁদে
যোগিনি, কিছুতে তবু ভাঙ্গিবে না পণ তোর?
যোগিনী, কিছুতে কিরে ফিরিবে না মন তোর?

১১

বিবিধ প্রসঙ্গ। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ভাদ্র ১৮০৫ শক।

পৃষ্ঠাসংখ্যা॥ আখ্যাপত্র [২], সূচীপত্র ৵০, ১৪৯

প্রকাশ ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য ॥০

গ্রন্থোৎসর্গ

এই গ্রন্থের স্বতন্ত্র উৎসর্গপত্র নাই। শেষ প্রবন্ধ 'সমাপন ও উৎসর্গ'র শেষ অংশ 'উৎসর্গ' বলিয়া গণনীয়—

"আর আমার পাঠকদিগের[১] মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। এ ভাবগুলির সঙ্গে তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে! সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুইজনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গম্ভীরস্বরে গভীর আলোচনা? সেই দুই জনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া! একদিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান?[২] তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছুদিনের গোটাকতক সুখ দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক একদিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ

১ রচনার পূর্বাংশে পাঠকদের উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা অংশত এই—

"মনে মনে মিলন হয় এমন লোক সচরাচর কই দেখিতে পাই? এই জন্য মনের ভাবগুলিকে যথাসাধ্য সাজাইয়া চারিদিকে পাঠাইয়া দিতেছি যদি কাহারো ভাল লাগে। যাঁহারা আমার যথার্থ বন্ধু, আমার প্রাণের লোক, কেবলমাত্র দৈব বশতই যাঁহাদের সহিত আমার কোনকালে দেখা হয় নাই, তাঁহাদের সহিত যদি মিলন হয়! সেই সকল পরমাত্মীয়দিগকে উদ্দেশ করিয়া আমার এই প্রাণের ফুলগুলি উৎসর্গ করি।"

২ দ্র. জীবনস্মৃতি "গঙ্গাতীর" অধ্যায়।

তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না! আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।"

এই উৎসর্গ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে।

সূচী

২৫.	ধরা কথা	ভারতী। আশ্বিন ১২৮৮
২৬.	অন্ত্যেষ্টি সৎকার	ভারতী। আশ্বিন ১২৮৮
২৭.	দ্রুত বুদ্ধি	ভারতী। আশ্বিন ১২৮৮
২৮.	লজ্জা ভূষণ	ভারতী। মাঘ ১২৮৮
২৯.	ঘর ও বাসাবাড়ি	ভারতী। মাঘ ১২৮৮
৩০.	নিরহঙ্কার আত্মম্ভরিতা	ভারতী। মাঘ ১২৮৮
৩১.	আত্মময় আত্মবিস্মৃতি	ভারতী। মাঘ ১২৮৮
৩২.	ছোট ভাব	ভারতী। পৌষ ১২৮৮
৩৩.	জগতের জন্ম মৃত্যু	ভারতী। পৌষ ১২৮৮
৩৪.	অসংখ্য জগৎ	ভারতী। পৌষ ১২৮৮
৩৫.	জগতের জমিদারী	ভারতী। পৌষ ১২৮৮
৩৬.	প্রকৃতি পুরুষ	ভারতী। চৈত্র ১২৮৮
৩৭.	জগৎ পীড়া	ভারতী। চৈত্র ১২৮৮
৩৮.	সমাপন ও উৎসর্গ[১]	

পুনর্মুদ্রণ

রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডের (আশ্বিন ১৩৪৭) অন্তর্গত হইয়া বিবিধ প্রসঙ্গ পুনরায় প্রকাশিত হয়।

কবির মন্তব্য

জীবনস্মৃতিতে 'প্রভাতসঙ্গীত' অধ্যায়ের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বিবিধ প্রসঙ্গ বিষয়ে লিখিয়াছেন—

"গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাসঙ্গীত ছাড়া কিছু কিছু গদ্যও লিখিতাম। সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে ; সেও একরকম যা-খুসি তাই লেখা। ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এও সেইরকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোট ছোট স্বল্পায়ু রঙিন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে

১ গ্রন্থমধ্যে প্রবন্ধের নাম 'সমাপন' ; সূচীতে 'সমাপন ও উৎসর্গ'।

বিবিধ প্রসঙ্গের প্রবন্ধগুলির ভারতী পত্রে প্রকাশের নির্দেশ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস লিখিত রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি পৌষ ১৩৪৬ হইতে গৃহীত।

কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম; মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব— কি লিখিব সে খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা। এই ছোট ছোট গদ্য লেখাগুলা এক সময়ে বিবিধ প্রসঙ্গ নামে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে; প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।"

উক্ত 'প্রভাতসঙ্গীত' অধ্যায়ের পরিশেষে লিখিয়াছেন—

"যখন সন্ধ্যাসঙ্গীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য বিবিধ প্রসঙ্গ নামে বাহির হইতেছিল। আর, প্রভাতসঙ্গীত যখন লিখিতেছিলাম কিম্বা তাহার কিছু পর হইতে ওইরূপ গদ্য লেখাগুলি আলোচনা নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।"

ছবি ও গান। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ফাল্গুন ১৮০৫ শক। / মূল্য ১ এক টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ [৬], ৵০, ১০৪

প্রকাশ [২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০

গ্রন্থোৎসর্গ

উৎসর্গ

গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম।

যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত,

তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।

এই উৎসর্গ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের 'বিজ্ঞাপন'

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতাগুলি গত বৎসরে লিখিত হয়। কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্ব্বেকার লেখা, এই নিমিত্ত তাহারা কিছু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

ছন্দের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই পুস্তকের কোন কোন গানে ছন্দ নাই বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে সকল পাঠকের কান আছে, তাঁহারা ছন্দ খুঁজিয়া লইবেন, দেখিতে পাইবেন বাঁধাবাঁধি ছন্দ অপেক্ষা তাহা শুনিতে মধুর ;— হসন্ত বর্ণকে অকারান্ত করিয়া পড়িলে কোন কোন স্থলে ছন্দের ব্যাঘাত হইবে।

গ্রন্থকার।

সূচী

৩০. অভিসার (ব্রজভাষা)। "মরণরে / তুঁহু মম শ্যাম সমান"

সাময়িক পত্রে প্রকাশসূচী[১]

১.	দুহুঁ	ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১২৯০
২.	কে	ভারতী। ভাদ্র ১২৯০
১৩.	সুখের স্মৃতি	ভারতী। কার্তিক ১২৯০
১৪.	যোগী	ভারতী। আশ্বিন ১২৯০
২৫.	পূর্ণিমায়	ভারতী। পৌষ ১২৯০
২৮.	নিশীথ জগৎ	ভারতী। শ্রাবণ ১২৯০
২৯.	নিশীথ চেতনা	ভারতী। আষাঢ় ১২৯০
৩০.	অভিসার	ভারতী। শ্রাবণ ১২৮৮

সংস্করণ

১৩০১ সালে কড়ি ও কোমল গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়—'কড়ি ও কোমল। / ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের / পদাবলী সম্বলিত।' দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিত হয়—'ছবি ও গান, ভানুসিংহের পদাবলী ও কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ঐ তিন গ্রন্থের যে সকল কবিতা পাঠক সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য জ্ঞান করি, তাহাই এই গ্রন্থে একত্র প্রকাশিত হইল। কবিতাগুলি স্থানে স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্জ্জন করা হইয়াছে।'

ছবি ও গান হইতে এই আটটি কবিতা বর্তমান গ্রন্থে গৃহীত হয়—

১. সুখের স্মৃতি
২. যোগী
৩. স্মৃতি-প্রতিমা
৪. স্নেহময়ী
৫. রাহুর প্রেম
৬. মধ্যাহ্নে
৭. পোড়ো বাড়ি
৮. নিশীথ-চেতনা

---

১ এই তালিকা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস প্রণীত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬ হইতে গৃহীত।

ইহার কয়েকটি কবিতায় পরিবর্জন ও পরিবর্তন সাধিত হয়।[১]

ব্রজভাষায় লিখিত [১] তুঁহু ও [৩০] অভিসার পরে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর অন্তর্গত ও ছবি ও গান হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আদরিণী কবিতার পরিশেষে 'সমাপন' নামে মুদ্রিত 'ফুলটি ঝরে গেছে রে' গানটি পরে 'রবিচ্ছায়া' (১২৯২)-র অন্তর্গত ও ছবি ও গান হইতে বর্জিত হয়; বর্তমানে উহা গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত।

১৩০৩ সালে প্রকাশিত 'কাব্য-গ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত ছবি ও গানে নিম্নোক্ত নয়টি কবিতা বর্জিত হয়— গ্রামে; আদরিণী; খেলা; বিদায়; বিরহ; মাতাল; বাদল; আবছায়া; আচ্ছন্ন। তুঁহু ও অভিসার যথাক্রমে রসাবেশ ও মরণ নামে এই গ্রন্থাবলীতে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর স্বতন্ত্র পুনর্মুদ্রণে বা ১৯১৫ সালের কাব্যগ্রন্থে এই-সকল বর্জন অনুসৃত হয় নাই, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর অন্তর্গত ব্রজভাষায় লিখিত কবিতা দুইটি ও পূর্বোল্লিখিত সমাপন বাদে অন্য কবিতা ও গান ছবি ও গানে মুদ্রিত হইতে থাকে। বিশ্বভারতী-সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীতে প্রকাশকালে (প্রথম খণ্ড, আশ্বিন ১৩৪৬) রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে বিরহ কবিতাটি বর্জিত হয়।[২]

---

১ ইহা লক্ষণীয় যে, এই-সকল পরিবর্জন ও পরিবর্তন, পরবর্তী কালে ছবি ও গানের স্বতন্ত্র পুনর্মুদ্রণের সময় ব্যবহৃত হয় নাই। তাহার একটি কারণ এই অনুমান হয় যে, ওই স্বতন্ত্র পুনর্মুদ্রণের সময় এই 'দ্বিতীয় সংস্করণ' লক্ষ্য-গোচর হয় নাই।

২ বর্জিত কবিতাটি এই—

ধীরে ধীরে প্রভাত হল, আঁধার মিলায়ে গেল
উষা হাসে কনক বরণী,
বকুল গাছের তলে, কুসুম রাশির পরে,
বসিয়া পড়িল সে রমণী!
আঁখি দিয়ে ঝরঝরে অশ্রুবারি ঝরে পড়ে
ভেঙ্গে যেতে চায় যেন বুক,
রাঙ্গা রাঙ্গা অধর দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে কত,
করতলে সকরুণ মুখ!

ছবি ও গান -এ প্রকাশিত গান

এই গ্রন্থে চারিটি গান আছে— ১-৩ ও ৩০ -সংখ্যক রচনা।

কবির মন্তব্য

প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র। ২১ মে ১৮৯০। চিঠিপত্র ৫

আমার "ছবি ও গান" আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে ত মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল। আমি জান্‌তুম না আমি কোথায় যাচ্চি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। একটা বাতাসের হিল্লোলে এক রাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়া-মন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিলনা। কেবলি একটা

অরুণ আঁখির পরে, অরুণের আভা পড়ে,
কেশপাশে অরুণ লুকায়,
দুই হাতে মুখ ঢাকে, কার নাম ধরে ডাকে,
কেন তার সাড়া নাহি পায়!
বহিছে প্রভাত বায় আঁচল লুটিয়ে যায়,
মাথায় ঝরিয়ে পড়ে ফুল,
ডালপালা দোলে ধীরে, কাননে সরসী তীরে
ফুটে ওঠে মল্লিকা মুকুল!
পা-দুখানি ছড়াইয়া পূরবের পানে চেয়ে,
ললিতে প্রাণের গান গায়।
গাহিতে গাহিতে গান, সব যেন অবসান,
যেন সব-কিছু ভুলে যায়!
প্রাণ যেন গানে মিশে, অনন্ত আকাশে মাঝে
উদাসী হইয়ে চলে যায়,
বসে বসে শুধু গান গায়।

সৌন্দর্য্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধ হয় এরকম অবস্থা হয়।

উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আনমনে—
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন মুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।[১]

সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেই নব যৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। "ছবি ও গান" পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে এমন আমার কোন পুরোণো লেখায় হয় না। তার থেকে বুঝতে পারি সে নেশা এখনো এক জায়গায় আছে— তবে কিনা, সে নেশা

Hath been cooled a long age
In the deep delved heart

আমি সত্যি সত্যি বুঝ্‌তে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিকজাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিকজাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে Shelleyর Skylark আর একটা হচ্ছে Wordsworthএর Skylark। একজন অনন্তসুধা প্রার্থনা করচে, আর একজন অনন্তসুধা দান করচে। সুতরাং

১ "জাগ্রত স্বপ্ন", ছবি ও গান। প্রথম সংস্করণে উদ্‌ধৃতাংশের দ্বিতীয় স্তবকের পাঠ এইরূপ—

চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন-কুসুম প্রাণে বিকশিত,
কুসুমের পরে ফেলিব চরণ,
যৌবন মাধুরী ভরে!
চারিদিকে মোর মাধবী মালতী
সৌরভে আকুল করে!

স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক— আর যে সৌন্দর্য্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ— যে যেটা অধিক করে অনুভব করে। আমার বোধ হয় মেয়েরা আপনার পূর্ণতা অধিক অনুভব করে (এই জন্যে তারা যা'কে তা'কে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারে) পুরুষরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে এইজন্যে জ্ঞান বল, প্রেম বল কিছুতেই তাদের আর অসন্তোষ ঘোচেনা। কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাক্‌লেই ভাল হয় কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না— ভাল কবিমাত্রেরই মধ্যে সে সামঞ্জস্য আছে— নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Idealএর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার Centrifugal force Idealএর দিকে Real-কে নিয়ে যায় এবং অনুরাগের Centripetal force Realএর দিকে Ideal-কে আকর্ষণ করে— কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তুমি ঠিক বলেছ "আর্ত্তস্বর" এবং "রাহুর প্রেম" "ছবি ও গানে"র মধ্যে অসঙ্গত হয়েছে, এদের মধ্যে যে একটা তীব্রতা আছে অন্যান্য গানের মধুরতার সঙ্গে তার অনৈক্য হয়েছে। আরেকটা কবিতা আছে সেটা আর এক রকমে অসঙ্গত— যথা "পোড়ো বাড়ি।"

প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র। [১৮৯০]। চিঠিপত্র ৫

তোমার এবারকার চিঠিতেও "ছবি ও গানে"র কথা আছে— বিষয়টা আমার পক্ষে খুব মনোরম সন্দেহ নেই। আজকাল যে সকল কবিতা লিখ্‌চি তা ছবি ও গান থেকে এত তফাৎ যে, আমি ভাবি, আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্চে না, ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন চলেছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারচি আমি যেন আর একটা পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি।

জীবনস্মৃতি। ১৩১৯

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১২৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর।

ছবি ও গান নাম ধরিয়া আমার যে-কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।

চৌরঙ্গীর নিকটবর্ত্তী সার্কুলর রোডের একটি বাগানবাড়িতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানলার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত— সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।

নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলি রঙ ছড়াইয়া পড়িত। তা হউক, তবু ছেলেরা যখন প্রথম রঙের বাক্স উপহার পায় তখন যেমন-তেমন করিয়া নানাপ্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া ওঠে; আমিও সেই দিন নবযৌবনের নানান্ রঙের বাক্সটা নূতন পাইয়া আপন মনে কেবলি রকম-বেরকম ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশ বছর বয়সের সঙ্গে এই ছবিগুলাকে আজ মিলাইয়া দেখিলে হয়তো ইহাদের কাঁচা লাইন ও ঝাপসা রঙের ভিতর দিয়াও একটা কিছু চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্রভাতসঙ্গীতে একটা পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। ছবি ও গান হইতে পালাটা আবার আর একরকম করিয়া শুরু হইল। একটা জিনিসের আরম্ভের আয়োজনে বিস্তর বাহুল্য থাকে। কাজ যত অগ্রসর হইতে থাকে তত সে-সমস্ত সরিয়া পড়ে। এই নূতন পালার প্রথমের দিকে বোধ করি বিস্তর বাজে জিনিস আছে। সেগুলি যদি গাছের পাতা হইত তবে নিশ্চয়ই ঝরিয়া

যাইত। কিন্তু বইয়ের পাতা তো অত সহজে ঝরে না, তাহার দিন ফুরাইলেও সে টিকিয়া থাকে। নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গানে আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন সাদা কথাকেও গভীর করিয়া তোলে তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা ছবি ও গান-এ ফুটিয়াছে। না, ঠিক তাহা নহে। নিজের মনের তারটা যখন সুরে বাঁধা থাকে তখন বিশ্বসঙ্গীতের ঝঙ্কার সকল জায়গা হইতে উঠিয়াই তাহাতে অনুরণন তোলে। সেদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরে কিছুই তুচ্ছ ছিল না। এক-একদিন হঠাৎ যাহা চোখে পড়িত দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার প্রাণের একটা সুর মিলিতেছে। ছোটো শিশু যেমন ধুলা বালি ঝিনুক শামুক যাহা খুশি তাহাই লইয়া খেলিতে পারে কেননা তাহার মনের ভিতরেই খেলা জাগিতেছে; সে আপনার অন্তরের খেলার আনন্দদ্বারা জগতের আনন্দখেলাকে সত্যভাবেই আবিষ্কার করিতে পারে, এইজন্য সর্ব্বত্রই তাহার আয়োজন; তেমনি অন্তরের মধ্যে যেদিন আমাদের যৌবনের গান নানাসুরে ভরিয়া উঠে তখনি আমরা সেই বোধের দ্বারা সত্য করিয়া দেখিতে পাই যে, বিশ্ববীণার হাজার লক্ষ তার নিত্যসুরে যেখানে বাঁধা নাই এমন জায়গাই নাই —তখন যাহা চোখে পড়ে, যাহা হাতের কাছে আসে তাহাতেই আসর জমিয়া ওঠে, দূরে যাইতে হয় না।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র। ১৫ নভেম্বর ১৯৩১। চিঠিপত্র ৯

…ছবি ও গানে তুমি আমার ভাঙা ছন্দ দেখে হেসেছ— ভেবেচ ছেলেরা হাঁটতে গিয়ে যেমন পড়ে, ওর ছন্দঃপতনও তেমনি। ঠিক তা নয়— আমি আজন্মকাল বিদ্রোহী— বালকবয়সেও স্পর্দ্ধার সঙ্গের বাঁধা ছন্দের শাসন অস্বীকার করেই কবি-লীলা সুরু করেচি— বাঁধনে ধরা দিতে আপত্তি করি নে যদি ধরা না দেবারও স্বাধীনতা থাকে। ঘরে বাস করতে হয় বলেই যদি বাগানে বেরোলেই লোকে চারদিক থেকে তেড়ে আসে তাহলে সেটা তো হোলো জেলখানা। বস্তুত কাব্যে দেয়াল-ছাঁদা ঘরও কবির, নির্দেয়াল বাগানও তার। আমার কবিতায় কোথাও কোথাও ছন্দের দেয়াল দেওয়া নেই বলে মনে কোরো না ইঁটের পাঁজা পোড়ে নি, মিস্ত্রির মজুরীর অভাব।

ভূমিকা। সঞ্চয়িতা। পৌষ ১৩৩৮

...সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চল্‌ছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ। বালক যদি প্রধানদের সভায় গিয়ে ছেলেমানুষী করে তবে সেটা সহ্য করা বালকদের পক্ষেও ভালো নয়, প্রধানদের পক্ষেও নয়। এও সেই রকম। ওই তিনটি কবিতাগ্রন্থে আর কোনো অপরাধ নেই কেবল একটি অপরাধ লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখি হয়ে ওঠে নি— এটাতে কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু তাকে পাখি বললে দোষ দিতেই হবে।

ইতিহাস-রক্ষার খাতিরে এই সংকলনে ওই তিনটি বইয়ের যে-কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর-কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না।[১]

কবির মন্তব্য। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ (বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৪৬)

ছবি ও গান নিয়ে আমার বলবার কথাটা বলে নিই। এটা বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবে মিলছে। ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ বকে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো-আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয় নি তো।

কবি সংসারের ভিতরে তখনো প্রবেশ করে নি, তখনো সে বাতায়নবাসী। দূর থেকে যার আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের নেশা মিলিয়ে দেয়। এর কোনো-কোনোটা চোখে দেখা এক টুকরো ছবি পেনসিলে আঁকা, রবারে ঘষে দেওয়া, আর কোনো-কোনোটা সম্পূর্ণ বানানো। মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয় নি। কিন্তু সহজ হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেইজন্যে চলতি ভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষায় ও ছন্দে এই

১ সঞ্চয়িতায় ছবি ও গান হইতে একমাত্র "রাহুর প্রেম" কতক অংশ বাদ দিয়া স্থানে স্থানে পরিবর্তনান্তে সংকলিত।

একটা মেলামেশা আরম্ভ হল। ছবি ও গান কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।

কবির মন্তব্য : চৈতালি। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫ (বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭)

আমার অল্প বয়সের লেখাগুলিকে একদিন ছবি ও গান এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেম। তখন আমার মনে ছিল আমার কবিতার সহজ প্রবৃত্তিই ওই দুটি শাখায় নিজেকে প্রকাশ করা। বাইরে আমার চোখে ছবি পড়ে অন্তরে আমি গান গাই।

'পূর্ণিমায়' কবিতার জন্মকথা। জীবনস্মৃতি : "কারোয়ার"

কিছুদিনের জন্য [১৮৮৩] আমরা সদর স্ট্রীটের দল কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম।

কারোয়ার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ অংশে স্থিত কর্ণাটের প্রধান নগর। তাহা এলালতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমি মলয়াচলের দেশ। মেজদাদা তখন সেখানে জজ ছিলেন।

এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর এখানে নাগরীমূর্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই। অর্দ্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে— সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড় বড় ঝাউগাছের অরণ্য ; সেই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূলরেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। মনে আছে, একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোটো নৌকায় করিয়া আমরা কালানদী বাহিয়া উজাইয়া চলিয়াছিলাম। এক জায়গায় তীরে নামিয়া শিবাজির একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ দেখিয়া আবার নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। নিস্তব্ধ বন, পাহাড় এবং এই নির্জন সঙ্কীর্ণ নদীর স্রোতটির উপর জ্যোৎস্নারাত্রি ধ্যানাসনে বসিয়া চন্দ্রলোকের জাদুমন্ত্র পড়িয়া দিল।... ফিরিবার সময় ভাঁটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

সমুদ্রের মোহানার কাছে আসিয়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়তমর্ম্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে

থামিয়া গিয়াছে, সুদূরবিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরুশ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ, দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম।[১] বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল। সেই রাত্রেই যে কবিতাটি[২] লিখিয়াছিলাম তাহা সুদূর প্রবাসের সেই সমুদ্রতীরের একটি বিগত রজনীর সহিত বিজড়িত। সেই স্মৃতির সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠকদের কেমন লাগিবে সন্দেহ করিয়া মোহিতবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ইহা ছাপানো হয় নাই। কিন্তু আশা করি জীবনস্মৃতির মধ্যে তাহাকে এইখানে একটি আসন দিলে তাহার পক্ষে অনধিকার প্রবেশ হইবে না।

[ইহার পর কবিতাটি অংশতঃ মুদ্রিত আছে]

এ কথা এখানে বলা আবশ্যক, কোনো সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ···স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রঙ ফোটে ভালো।···

১ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনস্মৃতির জন্য ইহার একটি চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

২ "পূর্ণিমায়"

নাট্য কাব্য। / প্রকৃতির প্রতিশোধ। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / সন ১২৯১।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্রাদি, উৎসর্গ [।৵০], ৮১

প্রকাশ ২৯ এপ্রিল ১৮৮৪। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য আট আনা

উৎসর্গ

উৎসর্গ। / তোমাকে দিলাম।

এই উৎসর্গ দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী উদ্দিষ্ট হইয়াছেন এইরূপ অনুমিত হইয়াছে।

কবির মন্তব্য

আলোচনা (১২৯২, ১৮৮৫) গ্রন্থের কোনো কোনো প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রতিশোধের তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়াছেন—এই প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখিয়াছেন—

আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এককণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না, এবং কাব্যহিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কী তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্য্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে (১৩১১) রবীন্দ্রনাথ যে আত্মপরিচয় লেখেন তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—

আমি বালক বয়সে 'প্রকৃতি প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম, তখন আমি নিজে ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলাম কিনা জানি না,—কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া এই প্রত্যক্ষকে

শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।

হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে!
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে!—
যে পথে তপন শশি আলো ধরে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,—
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!

...

পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া,
যত ওড়ে— যত ওড়ে যত ঊর্দ্ধে যায়—
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে
অবশেষে শ্রান্ত দেহে নীড়ে ফিরে আসে!

জীবনস্মৃতি গ্রন্থে (১৩১৯, ১৯১২) প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

কারোয়ারে [১৮৯৩] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব-কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল— ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার

মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্য্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কী করিয়া। এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাসদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে এক দিকে যত-সব পথের লোক, যত-সব গ্রামের নরনারী— তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে, আর-এক দিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দ্দেশ্যতাময়, অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল— এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটি একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে (বিশ্বভারতী, দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩৪৬) প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে 'কবির মন্তব্যে' রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে, বদ্ধ ঘরে নিঃসঙ্গ নির্জনে। সন্ধ্যাসংগীত এবং

প্রভাতসংগীতের অনেকটা সেই অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত।

তার পরের অবস্থায় মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল। বাইরের হাওয়ায় জানলা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগল। গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে। তখনো বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি আবেগের বাষ্পপুঞ্জ থেকে। তবু দুঃস্বপ্নের মতো আপনার বাঁধন-জাল ছাড়াবার জন্যে জেগে উঠল বালকের আগ্রহ। এই সময়কার রচনা ছবি ও গান। লেখনীর সেই নূতন বহির্মুখী প্রবৃত্তি তখন কেবল ভাবুকতার অস্পষ্টতার মধ্যে বন্ধন স্বীকার করলে না। বেদনার ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের প্রয়াসে সে শ্রান্ত, কল্পনার পথে সৃষ্টি করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল বাল্মীকি-প্রতিভায়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না। কিছুকাল পরে তখন আমার বয়স বোধহয় তেইশ কিংবা চব্বিশ হবে, কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে, অর্থাৎ সে আত্মগত নয় সে কল্পনায় রূপায়িত। "হেদে গো নন্দরানী" গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস। রাখাল বালকেরা নন্দরানীর কাছে এসেছে আবদার করতে, তারা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে এই তাদের পণ। এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলায় কথা। এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়াল শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্যে প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃতির প্রতিশোধের উল্লেখ আছে—

রাজা ও রানী

…প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে।…

—রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী) প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈত্র, ১৩৪৬

মালিনী

…সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্ম জটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।

আমার এ মতের সত্যাসত্য আলোচ্য নয়। বক্তব্য এই যে, এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনাআপনি দেখা দিয়েছিল "প্রকৃতির প্রতিশোধে" সে কথা ভেবে দেখবার যোগ্য।…

—রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী) চতুর্থ খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৪৭

বাল্মীকি-প্রতিভা

…মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল-বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠছিল। বাল্মীকি-প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব, যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে। প্রকৃতির প্রতিশোধেও এই দ্বন্দ্ব। সন্ন্যাসীর মধ্যে চিরকালের যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল তার বাঁধন ছিঁড়ল। কবির মনের মধ্যে বাজছিল মানুষের জয়গান।

—রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী) প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩৪৬

বিশ্বভারতীর সাহিত্যক্লাসে অধ্যাপনার সময় বলাকা কাব্যের অন্তর্গত 'স্বর্গ ("স্বর্গ' কোথায় জানিস কি তা ভাই") কবিতা-প্রসঙ্গে প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে আলোচনা করেন নিম্নে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল—

এই স্বর্গমর্ত্ত্যের ভাবটা বহুপূর্ব্বে আমার বাল্যকাল থেকেই আমাকে অনুসরণ করেছিল।

অল্প বয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ এই আইডিয়ার ব্যাকুলতাকে আমি

একরকম করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। সন্ন্যাসী বললে, 'যে ভববন্ধন-সীমার শৃঙ্খলে আমাকে বেঁধে রাখে আমি তাকে ছিন্ন করে অসীম প্রাণকে পাবার জন্য তপস্যা করব।' সে লোকালয়কে 'তুচ্ছ মায়া' 'অন্ধতার গহ্বর' ব'লে সমস্ত ত্যাগ করে দূরে চলে গেল, আকাশের [রূপ] রস গন্ধ বর্ণচ্ছটা সব তার চৈতন্যের থেকে অপসারিত হল, সে আপনাকে আপনার মধ্যে প্রতিসংহার করে অসীমকে পাবার জন্য পণ করল। তার পর কোথা থেকে একটি ছোটো মেয়ে দেখা দিল ; সে নিরাশ্রয় ছিল, সন্ন্যাসী তাকে গুহায় নিয়ে এল। মেয়েটি তাকে ধীরে ধীরে স্নেহের বন্ধনে বাঁধল। তখন সন্ন্যাসীর মনে ধিক্‌কার হল ; সে ভাবতে লাগল যে, এই তো প্রকৃতিমায়াবিনী দূতী করে এমনি করে মেয়েটিকে পাঠিয়েছে, সে সন্ন্যাসীকে অসীম থেকে বিচ্ছিন্ন করে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করতে চায়। এই সংগ্রাম যখন চলছে তখন একদিন সে ক্রোধের বশে মেয়েটিকে ত্যাগ করল। মেয়েটি যাকে নিতান্তভাবে আশ্রয়স্থল বলে জেনেছে তার সেই অবলম্বন চলে যাওয়াতে, সে ছিন্ন লতার মতো লুটিয়ে পড়ল। সন্ন্যাসী যত দূরে সরে যেতে লাগল, ততই মেয়েটির ক্রন্দন তার হৃদয়ে এসে ধ্বনিত হতে লাগল। শেষে মেয়েটি যে বাস্তব, মায়া নয়, তা সে হৃদয়ের বেদনার আঘাতে বুঝতে পারল। মনের এই অবস্থায় সে দূরে দাঁড়িয়ে লোকালয়ের দৃশ্য দেখতে লাগল ; তার মাধুর্যে, মানুষের স্নেহ-প্রীতিসম্বন্ধের সরসতায় তার মন ভরে উঠল। সে বললে, 'ফেলে দিলুম আমার দণ্ডকমণ্ডলু, দূর হয়ে যাক এ-সব আয়োজন। সীমাকে বর্জন করে তো আমি কোনো সত্যই পাই নি। একটি ছোটো মেয়েকে স্নেহ করতে পেরেছিলুম বলেই তো সেই রসের মধ্যে অসীমকে পেয়েছি— তার বাইরে তো অনন্তস্বরূপের প্রকাশ নেই।'—এই ভাবটাই আমার নাটিকাটির মূল সুর।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এর প্রতিপাদ্য বিষয়টা বাল্যকালে আমার নানা কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। সীমার সঙ্গে যোগেই অসীমের অসীমত্ব, এ কথা ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে। অবিদ্যা বা সীমার বোধকেই একান্ত বলে জানার মধ্যে অন্ধ তামসিকতা আছে, আবার অসীমের বোধকে একান্ত করে দেখার মধ্যেও ততোধিক তামসিকতা আছে— কিন্তু যখন বিদ্যা-অবিদ্যাকে মিলিয়ে দেখব তখনই সত্যকে জানব।

সীমাকে নিন্দা করা গায়ের জোরের কথা। ঐকান্তিক (absolute) সীমা বলে কিছু নেই, সব সীমার মধ্যেই অনন্তের আবির্ভাবকে মানতে হবে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীর সীমাকে 'না' করে দেওয়ার যে মুক্তি তার মধ্যে দিয়েই সার্থকতাকে চেয়েছিল, কিন্তু এ নিয়ে যায় অন্ধকারে।

তেমনি আবার সীমা-জগৎকে অসীম থেকে বিযুক্ত করে দিয়ে তার মধ্যে বদ্ধ হলে সেও ব্যর্থতা। কাব্যে শব্দকে বাদ দিয়ে যে রসিক রসকে পেতে চায় সে কিছুই পায় না, আবার রসকে বাদ দিয়ে যে পণ্ডিত শব্দকে পেয়ে বসে তার পণ্ডতারও সীমা নেই।[১]

প্রকৃতির প্রতিশোধের গান

প্রকৃতির প্রতিশোধে নিম্নলিখিত গানগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে—

১ হেদে গো নন্দরাণী। ঝিঁঝিটি খাম্বাজ-তাল খেমটা
২ বুঝি, বেলা বহে যায়। মূলতান-তাল আড়খেমটা
৩ ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে। ছায়ানট-তাল কাওয়ালি
৪ কথা কোস্‌নে লো রাই। ভৈরবী খেমটা
৫ প্রিয়ে তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে। রামপ্রসাদী সুর
*৬ আজ তোমায় ধরব চাঁদ। সোহিনী
৭ আয় রে আয় রে সাঁঝের বা। গৌড়সারং-একতালা
৮ বনে এমন ফুল ফুটেছে। খাম্বাজ
৯ মরিলো মরি। পূরবী
১০ যোগি হে, কে তুমি হৃদি-আসনে। কেদারা
১১ মেঘেরা চ'লে চ'লে যায়। বেহাগ

প্রকৃতির প্রতিশোধের গান প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধের কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে

১ বলাকা কাব্যের কবি-কৃত এই ব্যাখ্যা ও আলোচনা শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত হইয়া শান্তিনিকেতন পত্রে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ - মাঘ ১৩৩০) প্রকাশিত হয়। পরে বলাকা কাব্যের পরিশেষে (রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৭) গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে।

* গানটি অক্ষয় চৌধুরী রচিত।

বসিয়া সুর দিয়া-দিয়া গাহিতে-গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

হ্যাদে গো নন্দরানী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও—
আমরা রাখালবালক গোষ্ঠে যাব,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালের সূর্য্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখালবালকরা মাঠে যাইতেছে— সেই সূর্য্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার, তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না; সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেইখানেই অসীমের সাজ-পরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়; সেইখানেই মাঠে-ঘাটে বনে-পর্ব্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, দূরে নয়; ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য, পীতধড়া ও বনফুলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট— কেননা, সর্ব্বত্রই যাহার আনন্দ তাহাকে কোনো বড়ো জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।

সংস্করণ

১৩০৩ সালের (১৮৯৬) কাব্য গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত প্রকৃতির প্রতিশোধ বস্তুত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহাতে প্রথম সংস্করণের চতুর্দশ দৃশ্য বর্জিত হয়— সে দৃশ্যটি এই—

অরণ্য

ঝড় বৃষ্টি

[সন্ন্যাসী] ওই যে এখনো শুনি— এখনো যে শুনি!—
কিছুতে কি এ রজনী পোহাবে না আর!
অনন্ত রজনী কিরে হেথা বসে বসে
আর কিছু শুনিব না— কেবল একটি
অনাথিনী বালিকার করুণ ক্রন্দন!
এ কি ঘোর নিদারুণ অনন্ত নরক!
একাকী এ বিশ্বমাঝে অসীম নিশীথে
সঙ্গী শুধু একটি করুণ আর্ত্তস্বর!

বাছা, ও কি ক'রে তুই রয়েছিস্ চেয়ে—
আ-মরি, মুখেতে কেন কথাটিও নেই!
আহা, সে কঠিন কথা কত বেজেছিল!—
করুণ কাতর দুটি নয়ন মেলিয়া
দারুণ বিস্ময়ে যবে চাহিয়া রহিলি
রসনা কেনরে মোর হ'লো না পাষাণ!

অন্য কোনো কোনো দৃশ্যেরও কোনো কোনো অংশ বর্জিত হইয়াছে।

নলিনী। / (নাট্য) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক / প্রণীত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / সন ১২৯১।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ [৵০], ৩৬

প্রকাশ [১০ মে ১৮৮৪]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য চার আনা

কবি-কর্তৃক পরবর্তীকালে যোগ

শ্রীবসন্তবিহারী চন্দ্র কর্তৃক উপহৃত ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একটি মুদ্রিত কপির শেষে কবির হস্তাক্ষরে লিখিত নিম্নমুদ্রিত অংশ আছে[১]—

ষষ্ঠ দৃশ্য। গ্রন্থশেষে

নীরজা। আজ আমার কি সুখের দিন! আজ আমি নিজহাতে তোমাদের মিলন করে দিলুম— পৃথিবীর মধ্যে দুজনকে আমি সুখী করতে পারলুম।

নবীন। আর তোমার নিজের সুখ দেখ্‌লে না!

নীরজা। সেইত আমার সুখ— প্রদীপ দগ্ধ হয়ে আলো দেয় তা না হলে তার আর আবশ্যক কি আছে!

নবীন। তা বটে!

কেন এলিরে! ইত্যাদি!

নীরদ। তুমি আমাকে নলিনীর হাতে সমর্পণ করলে, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় কি তাকে দিতে পারবে? তোমাকে যা দিয়েছি তা তুমি ফেরাতে পারবে

১ ইহা ইতিপূর্বে শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৮) গ্রন্থে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে; তাঁহার নিকট হইতে এই কপির সন্ধান ও এই অংশের ফোটোগ্রাফ পাই। পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে বইটি দেখিবার ও গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত গানের তালিকা প্রস্তুত করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

নীরজা। আজ আমাদের কি সুখের দিন! আজ আমি নিজহাতে তোমাদের মিলন করে দিলুম — পৃথিবীর মধ্যে দুজনকে আমি সুখী করতে পারলুম।

নবীন। আর তোমার নিজের সুখ দেখলে না?

নীরজা। সেইতো আমার সুখ — প্রদীপ দগ্ধ হয়ে আলো দেয়, তা না হলে তার আর আবশ্যক কি আছে!

নবীন। তা বটে!

[illegible] এলিয়ে! ইত্যাদি!

নীরদ। তুমি আমাকে নলিনীর হাতে সমর্পণ করলে, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় কি তাকে দিতে পারবে? তোমাকে যা দিয়েছি তা তুমি ফেরাতে পারবে না। আমাদের মিলনের মধ্যে তুমিই চিরদিন অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে জেগে থাকবে। আমাদের দুজনের এই মিলিত হৃদয়ের সমুদয় সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুজল তোমারি উদ্দেশে উৎসর্গ করে রেখে দিলুম। তোমারি পূজার জন্যে আজ আমাদের এই দুজনের জীবনের মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল।

নলিনীর মুদ্রিত কপিতে রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংযোজন

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত

না। আমাদের মিলনের মধ্যে তুমিই চিরদিন অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে জেগে থাকবে। আমাদের দুজনের এই মিলিতহৃদয়ের সমুদয় সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুজল তোমারি উদ্দেশে উৎসর্গ করে রেখে দিলুম। চিরকাল তোমারি পূজার জন্যে আজ আমাদের এই দুজনের জীবনের মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল !

গ্রন্থে ব্যবহৃত গান

নলিনীতে নিম্নলিখিত গানগুলি আছে—

হা কে ব'লে দেবে। পিলু— কাওয়ালি
ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে। পিলু
ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে। কালাংড়া
মনে রয়ে গেল মনের কথা। বেহাগড়া— কাওয়ালি

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পূর্বোল্লিখিত মুদ্রিত কপিতে কবির হস্তাক্ষরে নিম্নলিখিত গানগুলি (প্রথম ছত্র) সংযোজিত—

প্রথম দৃশ্য ॥ পৃ. ১২। নীরদের উক্তি 'কিন্তু আর নয়'-এর পরে— 'কেন রে চাস্ ফিরে ২'

প্রথম দৃশ্য ॥ পৃ. ১৩। নীরদের উক্তি 'নলিনীর সঙ্গে তুই বাড়ি যা'র পরে— 'গেল গো ফিরিল না'

দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ পৃ. ১৬। নবীনের উক্তি 'আবার কবে সে হাস্‌বে'র পরে—'কেহ কারো মন বোঝে না'

তৃতীয় দৃশ্য ॥ পৃ. ২১। নীরদের উক্তি 'এস আমরা দুজনে মিলে গান গাই'র পরে—'দেখে যা'

তৃতীয় দৃশ্য ॥ পৃ. ২২। নীরদের উক্তি 'তোমার ঐ মধুর করুণা উপভোগ করি'র পরে—'ধীরে ধীরে প্রাণে আমার'

পৃ. ২৭। নীরদের উক্তি 'আমাদের ভয় কিসের ?'-এর পরে—'দুখের মিলন'

পঞ্চম দৃশ্য ॥ পৃ. ৩২। নীরদের উক্তি 'একটা গান গাই'র পরে—'ঐ বুঝি'

পৃ. ৩৫। নীরজার উক্তি 'আমি তোর দিদি হই বোন'-এর পরে—'কিছুই ত হল না'

ষষ্ঠ দৃশ্য ॥ নবসংযোজিত অংশে ॥ 'কেন এলি রে'

সম্ভবত কোনো সময়ে অভিনয়ের প্রস্তাবকালে এই গানগুলি ও পূর্বোদ্ধৃত অংশ যোজিত হয়।

নলিনী ও মায়ার খেলা

কয়েক বৎসর পরে লিখিত মায়ার খেলাকে (১৮৮৮) নলিনীর 'গীতিনাট্যরূপ' বলা যাইতে পারে। মায়ার খেলার বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"আমার পূর্ব্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।"

পুনর্মুদ্রণ। সংস্করণ

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩৪৭) নলিনী পুনর্মুদ্রিত হয়।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে নলিনীর কতকাংশের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ইহা উপহার দিয়াছিলেন। ইহার একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত, রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংযোজন-সংবলিত মুদ্রিত কপির কথা এই বিবরণের অন্যত্র উল্লিখিত।

১৫

শৈশব সঙ্গীত। / শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / সন ১২৯১।

[মলাটেও এইরূপ]

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, ভূমিকা, উপহার, সূচীপত্র [॥০], ১৪৯ শুদ্ধিপত্র [১]
প্রকাশ ২৯ মে ১৮৮৪। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য এক টাকা

গ্রন্থকারের ভূমিকা

ভূমিকা

এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশবসঙ্গীত বলা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু নামের জন্য বেশী কিছু আসে যায় না। কবিতা গুলির স্থানে স্থানে অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছি, সাধারণের পাঠ্য হইবে না বিবেচনায় ছাপাই নাই। হয়ত বা এই গ্রন্থে এমন অনেক কবিতা ছাপা হইয়া থাকিবে যাহা ঠিক প্রকাশের যোগ্য নহে। কিন্তু লেখকের পক্ষে নিজের লেখা ঠিকটি বুঝিয়া উঠা অসম্ভব ব্যাপার— বিশেষতঃ বাল্যকালের লেখার উপর কেমন-একটু বিশেষ মায়া থাকে যাহাতে কতকটা অন্ধ করিয়া রাখে। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আমি যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই।

গ্রন্থকার

গ্রন্থোৎসর্গ

উপহার

এ কবিতা গুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই, মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।

এই উপহারের উদ্দিষ্ট জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে।

সূচী

১ ফুলবালা (গাথা)। "তরল জলদে বিমল চাঁদিমা"

ভারতী। কার্তিক ১২৮৫[১]

২ অতীত ও ভবিষ্যৎ। "কেমন গো আমাদের ছোট সে কুটীরখানি"

৩ দিক্‌বালা। "দূর আকাশের পথ উঠিছে জলদ রথ"

ভারতী। আষাঢ় ১২৮৫

৪ প্রতিশোধ (গাথা)। "গভীর রজনী, নীরব ধরণী"

ভারতী। শ্রাবণ ১২৮৫

৫ ছিন্ন লতিকা। "সাধের কাননে মোর রোপণ করিয়াছিনু"[২]

ভারতী। অগ্রহায়ণ ১২৮৪

৬ ভারতী-বন্দনা। "আজিকে তোমার মানস সরসে"

ভারতী। মাঘ ১২৮৪

৭ লীলা (গাথা)। "সাধিনু—কাঁদিনু—কত না করিনু—"

ভারতী। আশ্বিন ১২৮৫

৮ ফুলের ধ্যান। "মুদিয়া আঁখির পাতা"

৯ অপ্সরা-প্রেম (গাথা)। "রজনীর পরে আসিছে দিবস"

ভারতী। ফাল্গুন ১২৮৫

১০ প্রভাতী। "শুন নলিনী খোল গো আঁখি"

১১ কামিনী ফুল। "ছিছি সখা কি করিলে"

ভারতী। ভাদ্র ১২৮৭

১২ লাজময়ী। "কাছে তার যাই যদি"

১৩ প্রেম-মরীচিকা। "ওকথা বোল না তারে"

ভারতী। ফাল্গুন ১২৮৬

১৪ গোলাপ-বালা (গোলাপের প্রতি বুল্‌বুল্‌)।
"বলি ও আমার গোলাপবালা"

ভারতী। অগ্রহায়ণ ১২৮৭

---

১ সাময়িক পত্রে প্রকাশসূচী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস -সংকলিত রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬ হইতে গৃহীত।

২ 'কামিনী ফুল' [১১] কবিতার পর 'ছিন্ন লতিকা' [৫] কিছু কিছু পাঠ-পরিবর্তনসহ পুনরায় মুদ্রিত।

১৫ হর-হৃদে কালিকা। "কে তুইলো হর-হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে"
ভারতী। আশ্বিন ১২৮৭

১৬ ভগ্নতরী (গাথা)। "ডুবিছে তপন, আসিছে আঁধার"
ভারতী। আষাঢ় ১২৮৬

১৭ পথিক। "উঠ, জাগ' তবে—উঠ', জাগ' সবে—"
ভারতী। পৌষ ১২৮৭

সংস্করণ / পুনর্মুদ্রণ

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩৪৭) শৈশব সঙ্গীত প্রথম পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহার কতকগুলি কবিতা ও গান, অনেক ক্ষেত্রেই কিছু পরিবর্তনান্তে ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীর কৈশোরক অংশে রবীন্দ্রনাথ স্থান দিয়াছিলেন[১]। পথিক কবিতাটি কিছু কিছু পরিবর্তন-পরিবর্জনান্তে ১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থেও স্থান পাইয়াছিল (প্রথম খণ্ড, যাত্রা বিভাগে : "হের ওই হের, প্রভাত এসেছে")।

	শৈশবসঙ্গীত	কাব্যগ্রন্থ (১৩০৩), 'কৈশোরক'
১	'ফুলবালা'র অন্তর্গত গান "গোলাপ ফুল—ফুটিয়ে আছে"	"নির্ব্বন্ধ"
২	'অপরাধ-প্রেম'-এর অন্তর্গত "গীত" "কেন গো সাগর এমন চপল"	"সান্ত্বনা"
৩	'অপ্সরা প্রেম'-এর অন্তর্গত অপ্সরার উক্তি "হল না গো হল না"	"সোহাগ"
৪	'অপ্সরার-প্রেম'-এর অন্তর্গত গান "সোনার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে আমার"	"বিদায় গান"
৫	'প্রভাতী', "শুন নলিনী খোল গো আঁখি"	"প্রভাতী"
৬	'কামিনী ফুল', "ছি ছি সখা কি করিলে"	"কামিনী"
৭	'লাজময়ী', "কাছে তার যাই যদি"[২]	"লাজময়ী"

১ দ্র. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৮, পৃ. ৪০, পাদটীকা ৩।

২ এটি ভগ্নহৃদয়ে পূর্বে মুদ্রিত, দ্র. ভগ্নহৃদয় বিবরণ।

৮	'প্রেম-মরীচিকা', "ওকথা বোল না তারে"	"প্রেম-মরীচিকা"
৯	'গোলাপ বালা', "বলি ও আমার গোলাপ-বালা"	"নিশীথ গীতি"
১০	'পথিক', "উঠ, জাগ তবে—উঠ জাগ সবে"	"পথিক"

শৈশবসঙ্গীতে গান

১ গোলাপ ফুল—ফুটিয়ে আছে। 'ফুল-বালা'র অন্তর্গত

২ দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো তোরা। 'ফুলবালা'র অন্তর্গত

৩ সোনার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে আমার

৪ শুন নলিনী খোল গো আঁখি

৫ ও কথা বোল না তারে। রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ

৬ বলি ও আমার গোলাপ বালা। রাগিণী বেহাগ

৭ পাগলিনী তোর লাগি কি আমি করিব বল। 'ভগ্নতরী'র অন্তর্গত[১]

৮ ওই কথা বল সখা বল আর বার। ভগ্নতরীর অন্তর্গত

ইহা ছাড়া 'অপ্সরা প্রেম' কবিতায় একটি সুদীর্ঘ "গীত" আছে— "কেন গো সাগর এমন চপল"।[১]

---

১ শৈশবসঙ্গীতের (১২৯২) পরবৎসরে প্রকাশিত গীত সংগ্রহ 'রবিচ্ছায়া'য় পাওয়া যায় না।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। / শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা / মুদ্রিত। / সন ১২৯১

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, উৎসর্গ, প্রকাশকের বিজ্ঞাপন [৬], সূচীপত্র ৵০, ৬০

প্রকাশ ১ জুলাই ১৮৮৪। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য আট আনা

সূচীপত্র

ভারতী। অগ্রহায়ণ ১২৮৪

---

১ ১৩০৩ সালে কাব্য গ্রন্থাবলীতে ভানুসিংহের যে পদগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলির শিরোনামও প্রদত্ত হয়। সূচীতে এগুলি [১-১৪, ১৭-২১] অন্তর্ভুক্ত হইল। 'কো তুঁহু' [২২] শিরোনাম অবশ্য কড়ি ও কোমলেই ছিল। ছবি ও গানে গৃহীত পদ দুইটির শিরোনাম যথাস্থানে পাদটীকায় উল্লিখিত।

২ পরবর্তীকালে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর সকল গানের সুর পাওয়া যায় নাই। যে ৯টির সুর পাওয়া গিয়াছে তাহা স্বরবিতান ২১ খণ্ডে (১৩৫৮) মুদ্রিত হয়। প্রথম প্রকাশকালে সকল গানে সুরনির্দেশ ছিল। প্রথম ছত্রের পর তাহা মুদ্রিত হইল।

* যে গানগুলির সুর পাওয়া গিয়াছে ও স্বরলিপি গ্রন্থ (স্বরবিতান ২১)-ভুক্ত হইয়াছে সেগুলি তারকা-চিহ্নিত হইল।

৯ [প্রতীক্ষা] সতিমির রজনী, সচকিত সজনী। মিশ্র জয়জয়ন্তী*
ভারতী। ফাল্গুন ১২৮৪

১০ [ব্যাকুলতা] বজাও রে মোহন বাঁশী। মূলতান*
ভারতী। পৌষ ১২৮৪

১১ [রসাবেশ] আজু সখি মুহু মুহু। মিশ্র বেহাগ[1]*
ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১২৯০

১২ [নিদ্রা] গহির নীদমে বিবশ শ্যাম মম। খাম্বাজ

১৩ [অভিসার] সজনি গো— শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা। মল্লার*
ভারতী। আশ্বিন ১২৮৪

১৪ [বর্ষা] বাদর বরখন নীরদ গরজন। মল্লার
ভারতী। চৈত্র ১২৮৪

১৫ সখিরে— পিরীত বুঝবে কে। টোড়ি
ভারতী। ফাল্গুন ১২৮৪

১৬ হম সখি দারিদ নারী। ভৈরবী
ভারতী। মাঘ ১২৮৪

১৭ [অনুতপ্তা] মাধব্। না কহ আদর বাণী। বাহার
ভারতী। বৈশাখ ১২৮৬

১৮ [বিদায়] সখিলো, সখিলো, নিকরুণ মাধব। দেশ
ভারতী। অগ্রহায়ণ ১২৮৭

১৯ [দূতীর প্রতি] বার বার সখি বারণ করনু। ইমনকল্যাণ
ভারতী। বৈশাখ ১২৮৫

২০ [সংশয়] দেখলো সজনী চাঁদনি রজনী। বেহাগ
ভারতী। বৈশাখ ১২৮৭

২১ [মরণ] মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান[2]। পূরবী*
ভারতী। শ্রাবণ ১২৮৮

---

১ বর্তমান গ্রন্থভুক্ত হইবার পূর্বে 'তুহুঁ' নামে প্রথম সংস্করণ ছবি ও গান (ফাল্গুন ১৮০৫ শক। ১৮৮৪) গ্রন্থভুক্ত।

২ বর্তমান গ্রন্থভুক্ত হইবার পূর্বে 'অভিসার' নামে প্রথম সংস্করণ ছবি ও গান গ্রন্থভুক্ত।

নিম্নলিখিত পদটি প্রথম সংস্করণ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীভুক্ত ছিল না —প্রথমে কড়ি ও কোমল গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ (১২৯৩/১৮৮৬)-ভুক্ত ছিল।

[২২] [কো তুহুঁ][১] কো তুহুঁ বোলবি মোয় [ইমনকল্যাণ][২]

প্রচার ১২৯২-৯৩[৩]

পাণ্ডুলিপি

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মালতী পুঁথিতে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ১২-সংখ্যক পদ 'গহির নীদমে অবশ শ্যাম মম' পাওয়া গিয়াছে।

সংস্করণ

১৩০১ সালে কড়ি ও কোমল গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়— 'কড়ি ও কোমল। / ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের / পদাবলী সম্বলিত।' এই দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিত হয়— 'ছবি ও গান, ভানুসিংহের পদাবলী ও কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ঐ তিন গ্রন্থের যে সকল কবিতা পাঠক সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য জ্ঞান করি, তাহাই এই গ্রন্থে একত্র প্রকাশিত হইল। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করা হইয়াছে। তিনখানি বহি লেখকের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের লেখা, তন্মধ্যে ভানুসিংহের পদাবলী অপেক্ষাকৃত শৈশবের রচনা।[৪]

ভানুসিংহের নিম্নলিখিত নয়টি পদ এই গ্রন্থে রক্ষিত হয়—

মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান
সজনি সজনি রাধিকালো
শুনলো শুনলো বালিকা
বজাও রে মোহন বাঁশী

১ সঞ্চয়িতায় 'প্রশ্ন' শিরোনামে।

২ ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত গান-এ (১৯০৯) এই সুরের উল্লেখ আছে।

৩ ভানুসিংহের পদাবলীর সাময়িক পত্রে প্রকাশবিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস লিখিত রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ হইতে গৃহীত।

৪ কাব্যগ্রন্থাবলীর (১৩০৩) ভূমিকায় উল্লেখ আছে, 'ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫।১৬ বৎসর বয়সের লেখা— আবার তাহার মধ্যে গুটিকতক পরবর্ত্তীকালের লেখাও আছে'।

বঁধুয়া হিয়া পর আওরে
গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
আজু সখি মুহু মুহু
[সজনি গো] শাঙন গগনে
কো তুঁহু

ভানুসিংহের পদাবলী ১৩০৩ সালে প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়— ইহাকে উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। উহাতে বাইশটি পদের মধ্যে কুড়িটি পদ আছে, [১৫] সখিরে— পিরীত বুঝবে কে ও [১৬] হম সখি দারিদ নারী নাই। [১২] গহির নীদমে-র প্রথম বারো ছত্র বর্জিত, নূতন আকারে পদটির প্রথম ছত্র 'শ্যাম মুখে তব মধুর অধরমে'; [২০] 'দেখলো সজনী চাঁদনি রজনী'-র প্রথমাংশ পুনর্লিখিত, নূতন আকারে ইহার প্রথম ছত্র 'হম যব না রব সজনী'।

[১৯১১] সালে স্বতন্ত্র পুনর্মুদ্রিত ভানুসিংহের পদাবলী ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থের অনুরূপ— ইহাই পরে, যথা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে, পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থে ও ১৯১৫ সালের কাব্যগ্রন্থে ইতিমধ্যে ভানুসিংহের কবিতার আরো বর্জন হয়।

বর্তমানে গীতবিতানের বিভিন্ন খণ্ডে 'ভানুসিংহের পদাবলী' সম্পূর্ণ মুদ্রিত। সঞ্চয়িতায় (১৩৩৮) রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পদাবলী হইতে 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' ও 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' নির্বাচন করেন, এবং ভূমিকায় লেখেন—

"ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই সঙ্কলনে ঐ তিনটি বইয়ের [সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রভাতসঙ্গীত এবং ছবি ও গান] যে কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তাছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা।"

১৩৭৬ বঙ্গাব্দে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর একটি পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়—

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ / কলিকাতা

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ ১১৬

প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭৬। মুদ্রণসংখ্যা ১১০০। মূল্য ৬·০০ টাকা

আখ্যাপত্রের পিছনে—রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প ৩…

পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ ১৩৭৬

পাঠান্তর ও গ্রন্থপরিচয় / শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক / সংকলিত ও সম্পাদিত

১১৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে

প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ/৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ / মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় / নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড / ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩

'বর্তমান সংস্করণে মূল পাঠ হিসাবে রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম মুদ্রণের (১৩৪৬) পাঠ গৃহীত হইয়াছে। তবে যে-সকল স্থলে মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্ট হইয়াছে… সে-ক্ষেত্রে মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করিয়া পাঠ গৃহীত হইয়াছে এবং পাদটীকায় তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।… ভানুসিংহের পদগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে ও সংকলনে বারংবার মুদ্রণকালে স্বভাবতই সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। এই সংশোধন বা পরিবর্তনের সমুদয় বিবরণ বিভিন্ন পদের পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে।'

এই সংস্করণের 'বর্জিত কবিতা' অংশে প্রথম সংস্করণভুক্ত ও পরবর্তী সকল সংস্করণে বর্জিত দুটি পদ 'সখিরে পিরীত বুঝবে কে' ও 'হম সখি দারিদ নারী' সংযোজিত এবং ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বলিয়া প্রচারিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' ব্যঙ্গরচনাটি 'পরিশিষ্টে' মুদ্রিত।

কবির মন্তব্য

জীবনস্মৃতিতে ভানুসিংহের কবিতা অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্ব্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্ত্তাদের রচনা

সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরাজ বালককবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলাম। তাঁহার কাব্য যে কিরূপ তাহা জানিতাম না; বোধ করি অক্ষয়বাবুও বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং জানিলে বোধ হয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোলোবছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ওই আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম; তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কা মাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।"

পূর্ব্বলিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম, "সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা।

বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "নিতান্ত মন্দ হয় নাই।"...

ভানুসিংহ যিনিই হুউন, তাঁহার লেখা যদি বর্ত্তমান আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্ত্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাংমাত্র।

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (বিশ্বভারতী, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৪৭) ভানুসিংহের পদাবলীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন, আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময় নির্ণয় সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা তখনো ছিল এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাল অনুমান করা অনেকটা সহজ। বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোলোর কাছাকাছি, বিলাতে যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক তখন আমি চোদ্দোয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। অথচ আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম। দাদাদের ডেস্ক থেকে যখন সেগুলি অন্তর্ধান করত তখন তাঁরা তা লক্ষ্য করতেন না।

পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হত আমার কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিই নি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারি নি। যদি ফিরে পেতুম তা হলে দেখাতে পারতুম কোথাও কোথাও যেখানে তিনি নিজের ইচ্ছামত মানে করেছেন ভুল করেছেন। এটা আমার নিজের মত।

তার পরের সোপানে ওঠা গেল পদাবলীর জালিয়াতিতে। অক্ষয়বাবুর কাছে শুনেছিলুম বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প। তাঁকে নকল করবার লোভ হয়েছিল। এ কথা মনেই ছিল না যে ঠিকমত নকল করতে হলেও শুধু ভাষায় নয় ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথুনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পড়ে। পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয় তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এইজন্যে ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে বহন করে এসেছি। এ'কে সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি।

প্রথম গানটি লিখেছিলুম একটা স্লেটের উপরে অন্তঃপুরের কোণের ঘরে—

গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে।

মনে বিশ্বাস হল চ্যাটার্টনের চেয়ে পিছিয়ে থাকব না।

এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।

"ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী"

১২৯১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা নবজীবন পত্রে বিনাস্বাক্ষরে যে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' ব্যঙ্গরচনা প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল। রচনাটি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই তাঁহার রচনা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল; রচনার এই কয়েক ছত্রও লক্ষ্য করিবার বিষয়—"…ভানুসিংহ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন।…" প্রবন্ধের তৃতীয় পাদটীকাও দ্রষ্টব্য।

ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী

ভারতবর্ষে কোন্ মূর্খ বা কোন্ পণ্ডিত কোন্ খ্রীষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন বা মরিয়াছিলেন, তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না ইহা স্থির। এ বিষয়ে পণ্ডিতবর হচিন্‌সন সাহেব যে অতি পরমাশ্চর্য্য সারগর্ভ গবেষণাপূর্ণ যুক্তিবহুল কথা বলিয়াছেন তাহা এইখানে উদ্ধৃত করি— "প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলে আমরা প্রাচীন কালের বিষয় অতি অল্পই জানিতে পারি!"*

আমাদের দেশে যে ইতিহাস ছিল না, এবং ইতিহাস না থাকিলে যে কিছুই জানা যায় না তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব চূড়ামণি অতি প্রাচীন কবি ভানুসিংহ ঠাকুরের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। ভারতবর্ষের এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। কৃতকার্য্য হইয়াছি এই ত আমাদের বিশ্বাস। যাহা আমরা স্থির করিয়াছি, তাহা যে পরম সত্য তদ্‌বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

কোন্ সময়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে নির্ণয় করিতে হয়। কেহ বলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পূর্ব্বে, কেহ বলে পরে। যদি পূর্ব্বে হয় ত কত পূর্ব্বে ও যদি পরে হয় ত কত পরে? বহুবিধ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এ সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়; যথা—

প্রথমত— চারি বেদ। ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব।

বেদ চারি কি তিন, এ বিষয়ে কিছুই স্থির হয় নাই। আমরা স্থির করিয়াছি, কিন্তু অনেকেই করেন নাই। বেদ যে তিন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঋগ্‌বেদে আছে— 'ঋষয় স্ত্রয়ী বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি।' চতুর্থ শতপথ ব্রাহ্মণে কি লেখা আছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেদের সূত্র যাঁহারা অবসর মতে পড়িয়া থাকেন, তাঁহারাও দেখিয়া থাকিবেন তন্মধ্যে অথর্ব্ব বেদের সূত্রপাত নাই। যাহা হউক, প্রমাণ হইল বেদ তিন বই নয়।

---

* Memoires of Cattermob Cruikshank Hutchinson Vol V. P. 1058.

ইংরাজিতে বানান ভুল যদি কিছু থাকে, পাঠকেরা জানিবেন তাহা মুদ্রাকরের দোষ। ভবানী মাষ্টারের কাছে আমি দেড় বৎসর যাবৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলাম, বাঙ্গালা আমাকে পড়িতে হয় নাই; কাঁটাগাছের মত বিনা চাসে আপনিই গজাইয়া উঠিয়াছে।

এক্ষণে সেই তিন বেদে ভানুসিংহের বিষয় কি কি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক্‌। বেদে ছন্দ আছে মন্ত্র আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সূত্র আছে, কিন্তু ভানুসিংহের কোন কথা নাই।* এমন কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্তু ইতিহাস রচনায় অনভিজ্ঞতা বশত ভানুসিংহের কোন উল্লেখ নাই।†

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে নন্দবংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দীর সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবে— কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভানুসিংহের কোন কথা তাহাতে দেখিতে পাইলাম না।‡ যদি কোন দুঃসাহসিক পাঠক বলেন যে হাঁ, তাহাতে ভানুসিংহের কথা আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিন— তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধারা নগরাধিপ ভোজরাজার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়— কালিদাস, কর্পূর, কলিঙ্গ, কোকিল, শ্রীদচন্দ্র। এমন কি মুচকুন্দ, ময়ূর ও দামোদরের নামও তাহাতে পাওয়া গেল, কিন্তু ভানুসিংহের নাম কোথাও পাওয়া গেল না।§

বিশ্বগুণাদর্শ দেখ—মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুরারি পুরসরো ভারবিঃ সারবিত্তঃ
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ

দেখ, ইহাতেও ভানুসিংহের নাম নাই।**

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উল্লেখ স্থলে ভানুসিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—

---

* See English Translation of Hitopadesha by H. M. Dibdin. Vol. 3, Page 551.

† কোন কোন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা ভানুর নামান্তর হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক।

‡ Vide Pictorial Handbook of Modern Geography. Vol. 1, Page 139.

§ See Hong-chang-ching By kong-fu.

** সাহনামা, দ্বিতীয় সর্গ।

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কু বেতাল ভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতা বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্ণব বিক্রমস্ত।

কই, ইহার মধ্যেও ত ভানুসিংহের নাম পাওয়া গেল না।✝ তবে, কোন কোন ভাবুক ব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভানুসিংহ একই ব্যক্তি হইবেন। এ সন্দেহ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়।

অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস ও সুশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অতএব কেহ যেন আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন— দোষ কেবল গ্রন্থগুলির।

ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়িবাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খ্রীষ্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্ব্বে। পরম পণ্ডিতবর সনাতনবাবু বলেন খ্রীষ্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্ব্বলোক পূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণ বাবু বলেন ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ, হয় খ্রীষ্ট শতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্ব্বে, না হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোন সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোন কোন মূর্খ নির্ব্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোন বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না, যে এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহা হউক, ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীল পুরাণের একাদশ সর্গে বৈতস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে।* তবেই দেখা যাইতেছে তিনি ভানুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভানুর কত পুরুষ পরে ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা দুঃসাধ্য। রামকে রাঘব বলা হইয়া থাকে। রঘুর তিন পুরুষ পরে রাম। মনে করা যাক্, বৈতস ভানুর

✝ Peterhoff's Chromkroptologisheder Unterlutungeln.

* See the Grammar of the Red Indian Tchouk-Tchouk-Hmhm-Hmhm Language. Conjongation of Verbs. Vol. 3. page 999.

চতুর্থ পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাক, তাহা হইলে ভানুসিংহের জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম। যিনি রাজতরঙ্গিণী পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের লোক*। তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে ভানুসিংহকে আরও প্রাচীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। 'গমন করিলাম' হইতে 'গেলুম' হয়। 'ভ্রাতৃজায়া' হইতে 'ভাজ' হয়। 'খুল্লতাত' হইতে 'খুড়ো' হয়। কিন্তু ছোট হইতে বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায়? অতএব নিঃসন্দেহ 'পিরীতি' শব্দ 'প্রীতি' অপেক্ষা 'তিখিনী' শব্দ 'তীক্ষ্ণ' অপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ ঋকের এক স্থলে দেখা যায় 'তীক্ষ্ণানি সায়কানি'। সকলেই জানেন অষ্টাদশ ঋক্ খ্রীষ্টের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্ত্তিত হইতে কিছু না হউক দুহাজার বৎসর লাগে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে খ্রীষ্ট জন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভানুসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল যে ভানুসিংহ ৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অথবা খ্রীষ্টাব্দের ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাঁহাকে আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভানুসিংহের আর সমস্তই ত ঠিকানা করিয়া দিলাম, এখন এইরূপ নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্মভূমির একটা ঠিকানা করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সনাতনবাবু একরূপ বলেন ও পরম ভক্তিভাজন রূপনারায়ণবাবু আর একরূপ বলেন। তাঁহাদের কথা এখানে উদ্ধৃত করিবার কোন আবশ্যকই নাই। কারণ, তাঁহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাঁহারা যে লেখা লিখিয়াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিহাস কাহাকে বলে আগে তাহাই তাঁহারা ইস্কুলে গিয়া শিখিয়া আসুন, তার পরে আমার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবেন। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি তাঁহাদের উপরে আমার বিন্দুমাত্র রাগ

* History of the Art of Embroidery and Crewel work. Appendix.

নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে আমি আনন্দিত বই রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক একবার ইচ্ছা করে তাঁহাদের লেখাগুলি চণ্ডালের দ্বারা পুড়াইয়া তাহার ভস্মশেষ কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং লেখকদ্বয়ও গলায় কলসী বাঁধিয়া তাহারই অনুগমন করেন।

সিংহল দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী ত্রিন্‌কমলীতে একটি পুরাতন কূপের মধ্যে একটি প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভানুসিংহের নামের ভ এবং হ অক্ষরটি পাওয়া গিয়াছে। বাকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুপ্ত। 'হ' টিকে কেহ বা 'ক্ষ' বলিতেছেন, কেহ বা 'ঞ্চ' বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে 'হ' তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার 'ভ'টিকে কেহ বা বলেন 'র্চ্চ', কেহ বা বলেন 'ক্লৈ', কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, 'ভানুসিংহ' শব্দের মধ্যে উক্ত দুই অক্ষর আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব ভানুসিংহ ত্রিন্‌কমলীতে বাস করিতেন, কূপের মধ্যে কিনা সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু আবার আর একটা কথা আছে। নেপালে কাটমুণ্ডের নিকটবর্ত্তী একটি পর্ব্বতে সূর্য্যের (ভানু) প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার কাছাকাছি সিংহের প্রতিমূর্ত্তিটা পাওয়া গেল না। পাষণ্ড যবনাধিকারে আমাদের কত গ্রন্থ, কত ইতিহাস, কত মন্দির ধ্বংস হইয়াছে; সেই সময়ে ঔরংজীবের আদেশানুসারে এই সিংহের প্রতিমূর্ত্তি ধ্বংস হইয়া থাকিবে। কিন্তু সম্প্রতি পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্রে চাষ করিতে করিতে সিংহের প্রতিমূর্ত্তি-খোদিত ফলক খণ্ড প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে— স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ইহা সেই নেপালের ভানু-প্রতিমূর্ত্তির অবশিষ্টাংশ, না হলে ইহার কোন অর্থ ই থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের বাসস্থান নেপালে থাকা কিছু আশ্চর্য্য নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে তিনি কার্য্যগতিকে নেপাল হইতে পেশোয়ারে যাতায়াত করিতেন কি না সে কথা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন। এবং স্নান উপলক্ষে মাঝে মাঝে ত্রিন্‌কমলীর কূপে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নহে। ভানুসিংহের বাসস্থান সম্বন্ধে অভ্রান্ত বুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী অপ্রকাশচন্দ্র বাবু যে তর্ক করেন তাহা নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভানুসিংহের স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির এক পার্শ্বে কলিকাতা শহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার সত্যতা আমরা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারি যে, ভানুসিংহ তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বটে

আমি কলিকাতায় বাস করি— কিন্তু তাহাই যদি সত্য হইবে, তাহা হইলে কলিকাতায় এত কূপ আছে কোথাও কি প্রমাণ সমেত একটা প্রস্তর ফলক পাওয়া যাইত না? শব্দশাস্ত্র অনুসারে কাটমুণ্ডু ও ত্রিনূকমলীর অপভ্রংশে কলিকাতা লিখিত হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক ভানুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল না।

ভানুসিংহের জীবনের সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। হয়ত বা অন্যান্য মতিমান লেখকেরা জানিতে পারেন কিন্তু এ লেখক বিনীত ভাবে তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কেহ বলে তাঁহার কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজারী ছিলেন।

ভানুসিংহের কবিতা সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিব না। ইহা মা সরস্বতীর চোরাই মাল। জনশ্রুতি এই যে, এ কবিতাগুলি স্বর্গে সরস্বতীর বীণায় বাস করিত। পাছে বিষ্ণুর কর্ণগোচর হয় ও তিনি দ্বিতীয় বার দ্রব হইয়া যান, এই ভয়ে লক্ষ্মীর অনুচরগণ এগুলি চুরি করিয়া লইয়া মর্ত্ত্যভূমে ভানুসিংহের মগজে গুঁজিয়া রাখিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে এগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে লিখিত, সে কথা শুনিলে হাসি আসে। বিদ্যাপতি বলিয়া এক ব্যক্তি ছিল কি না ছিল তাহাই তাঁরা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই।

যাহা হউক, ভানুসিংহের জীবনী সম্বন্ধে সমস্তই নিঃসংশয়রূপে স্থির করা গেল। তবে এই ভানুসিংহই যে বৈষ্ণব কবি তাহা না হইতেও পারে। হউক বা না হউক সে অতি সামান্য বিষয়, আসল কথাটা তো স্থির হইয়া গেল।

রামমোহন রায় /...

মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় :

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। / মূল্য ৵৹ আনা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ [৵৹], ৩৪

প্রকাশ [১৮ মার্চ ১৮৮৫]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০

এই পুস্তিকার[১] আখ্যাপত্র নাই। মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় পুস্তিকার নাম (আখ্যাপত্র-বিবরণের পরিবর্তে মুদ্রিত) ব্যতীত নিম্নলিখিত বিবরণ মুদ্রিত আছে—

"রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় ১২৯১ সালের/৫ মাঘে সিটি কলেজ গৃহে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক / এই প্রবন্ধটী পঠিত হয়।"

এই পুস্তকের 'ভূমিকা'য় আছে—

"রামমোহন রায়ের মতের উদারতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অনেকে ভুল বুঝিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মত যে অত্যন্ত উদার ছিল তাহা লেখক স্বীকারই করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রতিবাদকারিগণ পুনর্ব্বার মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন।"

এই-সকল প্রতিবাদ ১২৯১ সালের প্রচার ও নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল।[২]

সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ

এই প্রবন্ধ পরে খণ্ডিত আকারে চারিত্রপূজা (১৩১৪) গ্রন্থের অন্তর্গত হয়, পরে তথা হইতে বর্জিতও হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী) চতুর্থ খণ্ডে

---

১ রবীন্দ্রনাথের পুস্তিকা-সংখ্যা প্রভূত পরিমাণ; এগুলির বিবরণ স্বতন্ত্র একটি তালিকায় প্রকাশিত হইবে। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্বের অনুরোধে পুস্তিকাগুলি মুখ্য রচনাপঞ্জীর অন্তর্গত করা হইল।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬।

মূল পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। ভারতপথিক রামমোহন রায় (রবীন্দ্র-শতবার্ষিক সংস্করণ ১১ মাঘ ১৩৬৬) গ্রন্থে চারিত্রপূজার পরিমার্জিত পাঠ সংকলিত আছে।

সাময়িক পত্রে প্রকাশ

মাঘ ১২৯১ সংখ্যা ভারতী ও ১৮০৬ শকের চৈত্র সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

আলোচনা। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায়[১] :

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, উৎসর্গপত্র [৪], সূচীপত্র।০, ১৩৩

প্রকাশ [১৫ এপ্রিল ১৮৮৫]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য এক টাকা

গ্রন্থোৎসর্গ

উৎসর্গ।

এই গ্রন্থ পিতৃদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

সূচী

এই গ্রন্থ ছয় ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক বিভাগে ছোটো ছোটো কতকগুলি নিবন্ধ বা স্বতন্ত্র শিরোনাম-সংবলিত অনুচ্ছেদ আছে।

---

১ মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠার এই বিবরণ ও রচনাগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের নির্দেশ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস প্রণীত রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬ হইতে গৃহীত।

তুলনায় অরুচি
জগৎ সত্য
প্রেমের শিক্ষা

[২] ধর্ম্ম

ভারতী। চৈত্র ১২৯০

প্রেমের যোগ্যতা
পথ
পাপ পুণ্য
চেতনা

বিস্মৃতি
জগতের বন্ধন
জগতের ধর্ম্ম
উদাহরণ
সচেতন ধর্ম্ম[১]
অপক্ষপাত
সকলে আত্মীয়
জড় ও আত্মা
মৃত্যু
জগতের সহিত ঐক্য
মূল ধর্ম্ম
একটি রূপক

[৩] সৌন্দর্য্য ও প্রেম

ভারতী। আষাঢ় ১২৯১

সৌন্দর্য্যের কারণ
সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রেমী
মনের মিল
উপযোগিতা
আমরা সুন্দর

---

১ সূচীতে 'সচেতনতা'

সুদূর ঐক্য

সুন্দর সুন্দর করে

শান্তি

উদ্ধার

কবির কাজ

কবিতা ও তত্ত্ব

তত্ত্বের বার্দ্ধক্য

সৌন্দর্য্যের কাজ

স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক

পুরাতন কথা

জ্ঞান ও প্রেম

নগদ কড়ি

আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার

লক্ষ্মী

[৪] কথাবার্ত্তা

ভারতী। শ্রাবণ ১২৯১

সন্ধ্যাবেলায়

[৫] আত্মা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ ১৮০৬ শক

আত্মগঠন

আত্মার সীমা

মানুষ চেনা

শ্রেষ্ঠ অধিকার

নিষ্ফল আত্মা

আত্মার অমরতা

স্থায়িত্ব

[৬] বৈষ্ণব কবির গান

নবজীবন। কার্ত্তিক ১২৯১

মর্ত্ত্যের সীমানা

স্বর্গের সামগ্রী

মিলন
স্বর্গের গান
মর্ত্ত্যের বাতায়ন
সাড়া
সৌন্দর্য্যের ধৈর্য্য
জ্ঞানদাসের গান
বাঁশীর স্বর
বিপরীত
বিবাহ

কবির মন্তব্য

জীবনস্মৃতি। প্রভাতসঙ্গীত অধ্যায়

যখন সন্ধ্যাসঙ্গীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে বাহির হইতেছিল। আর, প্রভাতসঙ্গীত যখন লিখিতেছিলাম কিম্বা তাহার কিছু পর হইতে ঐরূপ গদ্য লেখাগুলি 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে-প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।

জীবনস্মৃতি। প্রকৃতির প্রতিশোধ অধ্যায়

...আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এককণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্ব-হিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না, এবং কাব্য হিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কী তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্য্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

পুনর্মুদ্রণ

হিতবাদির উপহার রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীতে (১৩১১, ১৯০৪) আলোচনা পুনর্মুদ্রিত হয়। দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডের (১৩৪৮, ১৯৪১) অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

রবিচ্ছায়া। / (সঙ্গীত) / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। / শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা / ৪৫ নং বেনেটোলা লেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। / শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। / বৈশাখ ১২৯২।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ [২], ১৶০, ১৭১

প্রকাশ [২ জুন ১৮৮৫]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য বারো আনা

'রচয়িতার নিবেদন'

বর্ত্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত অধিকাংশ গান সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না।

ইহার অনেক গানই বিস্মৃত বাল্যকালের মুহূর্ত্ত-স্থায়ী সুখ দুঃখের সহিত দুইদণ্ড খেলা করিয়া কে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল— সেই সকল শুষ্কপত্র চারিদিক হইতে জড় করিয়া বইয়ের পাতার মধ্যে তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিলে গ্রন্থকার ছাড়া আর কাহারও তাহাতে কোন আনন্দ নাই।

আমার এইরূপ মনের ভাব। এই জন্য এ গানগুলি আজ সাত আট বৎসর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, আমি ছাপাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি নিজে হইলে হয়ত ছাপাইতাম না। কিন্তু প্রকাশক মহাশয় যখন ছাপাইতেছেন, তখন আর আমার তাহাতে আপত্তি কিছু নাই। আমার পক্ষে সেত সুখেরই বিষয়। এখন প্রকাশক মহাশয়ের সঙ্গে পাঠকদের বোঝা পড়া।

অনেক কারণে গান ছাপান নিষ্ফল বোধ হয়। সুর সঙ্গে না থাকিলে গানের কথাগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তা ছাড়া গানের কবিতা সকল সময়ে পাঠ্য হয় না, কারণ সুরে ও কথায় মিলিয়া তবে গানের কবিতা গঠিত হয়। এইজন্য সুর ছাড়া গান ছাপার অক্ষরে পড়িতে অনেকস্থলে অত্যন্ত খাপছাড়া ঠেকে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার বিস্তর উদাহরণ আছে পাঠক মহাশয়দের গোচরার্থে নিবেদন করিলাম ইতি।

পুনশ্চ— অনেকগুলি গানে রাগ রাগিণীর নাম লেখা নাই। সে গানগুলিতে এখনও সুর বসান হয় নাই। সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি গান আমার দাদা— পূজনীয় শ্রীযুক্ত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুরের অনুসারে লিখিত হয়। অনেকগুলি গানে আমি নিজে সুর বসাইয়াছি, এবং কতকগুলি গান হিন্দুস্থানী গানের সুরে বসান হয়।

ভানুসিংহের সমস্ত গান এই গ্রন্থে নিবিষ্ট হইল না। কারণ সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল তাহা হইতে গুটিকয়েক গান উদ্ধৃত হইল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'প্রকাশকের বক্তব্য'

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। প্রতিবর্ষেই তাঁহার অনেকগুলি করিয়া নূতন সঙ্গীত বাহির হইতেছে। বিধাতা তাঁহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, অবকাশ দিয়াছেন তিনি বিধাতার দানের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই তাঁহার কবিতার সহিত সুপরিচিত। নূতন করিয়া আমার কিছু বলিবার বড় প্রয়োজন দেখি না। তাঁহার কবিতা গুলি সরল সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী, তাঁহার সঙ্গীত গুলি ততোধিক সরল, সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী। তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গীত গুলি তান লয় স্বরযোগে যখন গীত হয় তখন মনে হয় বুঝি স্বর্গ হইতে সে সকল সঙ্গীত আকাশ ভাসাইয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীতলে এ সংসার-দাব-দাহে দগ্ধ মানব-মণ্ডলীকে শান্তি দিবার জন্যই নামিয়া আসিতেছে। এ ঘোর সংসার কাননে 'তমস ঘন-ঘোরা-গহন-রজনীর' নাম শুনিয়া কোন পান্থ-হৃদয় না ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত হয়? বা সেই 'জীবনের ধ্রুবতারা'র উদ্দেশ পাইয়াই বা কোন অনুতপ্ত হৃদয় না আশ্বাস লাভ করে? বাস্তবিক সে সঙ্গীত শ্রবণে প্রাণ ইহলোকের অতীত হইয়া যায়, পাঠ করিলে অসাড় প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে, ঘোর সংসারমুগ্ধ প্রাণও ক্ষণকালের জন্য উদাসভাব ধারণ করে। তাঁহার স্বভাব-সঙ্গীত প্রকৃতিকে নব ভাবে সাজাইয়া হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত করে, প্রকৃতি যেন কোমল জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চক্ষের সম্মুখে আগমন করে, তাঁহার প্রণয়-সঙ্গীতগুলি সুমধুর ভাবে হৃদয়-তন্ত্রী আঘাত করে, প্রাণে বিশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার করে। এই সঙ্গীতগুলি এত দিন রচয়িতার উদাসীনতা বশতঃ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল কখনও আলোক দেখিত কি না জানি না। সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি যে সকল বিদ্যার গুণে মানব-হৃদয়ের কোমল ভাবগুলি সম্যক

প্রস্ফুটিত হয় সে গুলির আদর আমাদের দেশে ক্রমেই বাড়িতেছে ইহা অতি আনন্দের বিষয়। কিন্তু তবুও গুরুজনের নিকট গান করিতে অনেকেই সংকোচ বোধ করেন। তাহার কারণ সচরাচর দুইটি,—সামাজিক শিক্ষার অভাব, আর ভাল গানের অভাব,—শেষোক্ত কারণটি কতক পরিমাণে দূরীকরণ করা এই পুস্তকের একটি উদ্দেশ্য। সাধারণে এই সঙ্গীত গুলি গান করিয়া ও পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন, তাই সযতনে তাহা সংগ্রহ করিয়া এই **"রবিচ্ছায়া"** প্রকাশ করিলাম। ১২৯১ সনের শেষদিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্র বাবু যত গুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া গেল।

সিটিকলেজ
বৈশাখ ১২৯২। } শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র।

বইটি তিন অংশে বিভক্ত: বিবিধ সঙ্গীত, ব্রহ্মসঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত। এতদ্‌ব্যতীত একটি পরিশিষ্ট আছে।

সূচী

বিবিধ সঙ্গীত

৪৬ আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।
৪৭ সেই যদি সেই যদি ভাঙ্গিল এ পোড়া হৃদি। গৌড় সারং—ঝাঁপতাল
৪৮ ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর। পিলু—ঝাঁপতাল
৪৯ তারে দেহ গো আনি। বেহাগ—আড়াঠেকা
৫০ একবার বল সখি ভালবাসো মোরে। সাহানা—আড়াঠেকা
৫১ মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান। ভৈরবী—কাওয়ালি
৫২ সোনার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে আমার।
৫৩ এ ভালবাসার যদি দিতে প্রতিদান। কাফি—আড়াঠেকা
৫৪ কি করিব বল সখা তোমার লাগিয়া। মিশ্র ইমনকল্যাণ—কাওয়ালি
৫৫ ও কি সখা কেন মোরে কর তিরস্কার। সরফর্দ্দা—ঝাঁপতাল
৫৬ গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয় স্রোতে। বাহার—ঝাঁপতাল
৫৭ কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস।
মিশ্র ছায়ানট—কাওয়ালি
৫৮ ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এস হে। বেহাগড়া—কাওয়ালি
৫৯ ও কি সখা মুছ আঁখি। বেলোয়ার—কাওয়ালি
৬০ না স্বজনি না, আমি জানি জানি সে আসিবে না। আসোয়ারি
৬১ কেহ কারো মন বুঝে না। সিন্ধু কাফি—আড়াঠেকা
৬২ তোরা বসে গাঁথিস মালা। ললিত—আড়াঠেকা
৬৩ কেনরে চাস্ ফিরে ফিরে। ভৈরবী—আড়খেমটা
৬৪ ওকে কেন কাঁদালি। খট্—ললিত ঝাঁপতাল
৬৫ মন হোতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে।
৬৬ যাই যাই ছেড়ে দাও। আলাইয়া—আড়খেমটা
৬৭ সখি বল দেখি লো। বেহাগ—কাওয়ালি
৬৮ গেল গো—ফিরিল না চাহিল না। গৌড়মল্লার—কাওয়ালি
৬৯ হোলনা লো হোলনা সই। হাম্বীর—কাওয়ালি
৭০ হা' সখি ও আদরে। সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালি
৭১ হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর। খাম্বাজ—কাওয়ালি
৭২ সহেনা যাতনা। বেহাগ—কাওয়ালি
৭৩ এমন আর কতদিন চলে যাবেরে। সরফর্দ্দা—কাওয়ালি
৭৪ দাঁড়াও, মাথা খাও, যেওনা সখা। দেশ—কাওয়ালি

৭৫ সখা হে, কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায়। মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালি
৭৬ এতদিন পরে সখি। জয়জয়ন্তী—কাওয়ালি
৭৭ প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন। বেহাগ—কাওয়ালি
৭৮ পুরাণো সে দিনের কথা। মিশ্র—খেম্‌টা
৭৯ এত ফুল কে ফোটালে (কাননে)। মিশ্র কালাংড়া—খেমটা
৮০ আমাদের সখীরে কে নিয়ে যাবে রে। মিশ্র জয়জয়ন্তী—খেমটা
৮১ সখি সে গেল কোথায়। মিশ্র বেহাগ—খেমটা
৮২ মধুর মিলন। বেহাগ—তাল ফেরতা
৮৩ ও কেন চুরি করে যায়। বেহাগ—খেমটা
৮৪ দুজনে দেখা হল—মধু যামিনীরে। বেহাগ—আড়খেমটা
৮৫ দুজনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা পারে।
৮৬ ছেলেখেলা কোর না লো লোয়ে এ হৃদয়।
৮৭ মা একবার দাঁড়াগো। ভৈরবী—আড়াঠেকা
৮৮ কেমনে শুধিব বল তোমার এ ঋণ। সিন্ধু কাফি—আড়াঠেকা
৮৯ মরি লো মরি। মিশ্র—আড়খেমটা
৯০ বনে এমন ফুল্ল ফুটেছে। খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা
৯১ হেদে গো নন্দরাণী। মিশ্র ভৈরবী—খেমটা
৯২ মনে রয়ে গেল মনের কথা। বেহাগড়া—কাওয়ালি
৯৩ ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে। কালাংড়া-খেমটা
৯৪ ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে। পিলু—খেমটা
৯৫ হা কে বলে দেবে। পিলু—কাওয়ালি
৯৬ ওই জানালার কাছে বসে আছে। মিশ্র খাম্বাজ—একতালা
৯৭ আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে। মিশ্র কালাংড়া—একতালা
৯৮ বুঝেছি বুঝেছি সখা ভেঙ্গেছে প্রণয়। মিশ্র পিলু—আড়াঠেকা
৯৯ না সখা, মনের ব্যথা কোর'না গোপন। ইমনকল্যাণ—কাওয়ালি
১০০ কি হল আমার? বুঝিবা সখি। মিশ্রসিন্ধু—একতালা
১০১ যে ভাল বাসুক— সে ভাল বাসুক। মিশ্র—একতালা
১০২ কাছে তার যাই যদি। টৌড়ি—ঝাঁপতাল[1]

[1] এই স্বরনির্দেশ সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর হস্তাক্ষরে 'ভুল। শ্রী ইঃ দেবী' এইরূপ মন্তব্য একখানি রবিচ্ছায়া পুস্তকে লিখিত আছে।

১০৩ সখি, ভাবনা কাহারে বলে। বেহাগ খাম্বাজ—একতালা

১০৪ কে আমার সংশয় মিটায়।

১০৫ খেলা কর্—খেলা কর্। কালাংড়া—কাওয়ালি

১০৬ ক্ষমা কর মোরে সখি, সুধায়োনা আর। ঝিঁঝিট—কাওয়ালি

১০৭ সখি আর কতদিন। জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

১০৮ কতদিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে। ভৈরবী—কাওয়ালি

১০৯ নাচ্ শ্যামা, তালে তালে।

১১০ ফুলটি ঝরে গেছে রে। ভৈরবী—একতালা

১১১ আর কি আমি ছাড়ব তোরে।

১১২ বলি গো সজনি যেওনা যেওনা। খট্ একতালা

১১৩ বাঁশরী বাজাতে চাহি। মিশ্র কাফি—একতালা

১১৪ বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল।

১১৫ বুঝি বেলা বহে যায়। মুলতান—তাল আড়খেমটা

১১৬ ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে। ছায়ানট—তাল কাওয়ালি

ব্রহ্মসঙ্গীত

১ (তাঁহার) আরতি করে চন্দ্রতপন।

রাগিণী বড়হংস সারঙ্গ—তাল চৌতাল

২ তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে।

রাগিণী আসাবরি—তাল ঝাঁপতাল[১]

৩ মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ। ভৈরবী—ঝাঁপতাল

৪ চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধূলা অবসান।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

৫ দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই। রাগিণী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল

৬ অসীম কাল সাগরে ভুবন ভেসে চলেছে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল

৭ এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ। রাগিণী আসাবরি—তাল চৌতাল

---

১ রবিচ্ছায়ার একটি কপিতে ইন্দিরা দেবীর হস্তাক্ষরে সংশোধন আছে—'বাহার—আড়াঠেকা'।

৮ দেখা যদি দিলে ছেড়ো না আর।
রাগিণী বেলাবলি—তাল কাওয়ালি
৯ আঁখিজল মুছাইলে জননী। রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি
১০ ডুবি অমৃত পাথারে। রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল
১১ আঁধার রজনী পোহাল। রাগিণী খট্—তাল একতালা
১২ আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি। রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা
১৩ ওঠ ওঠরে বিফলে প্রভাত বহে যায় যে।
রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল
১৪ দিন ত চলি গেল প্রভু বৃথা। রাগিণী আসাবরি—তাল তেওট
১৫ ভবকোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে।
রাগিণী টোড়ি—তাল ঢিমেতেতালা
১৬ হাতে লয়ে দীপ অগণন। রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল
১৭ রজনী পোহাইল, চলেছে যাত্রীদল। রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল
১৮ একি সুগন্ধ হিল্লোল বহিল। রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল
১৯ আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্ব্বাদ। রাগিণী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল
২০ বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি। রাগিণী আশা ভৈরবী—তাল ঠুংরি
২১ শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ ছটামাঝে।
রাগ ভৈরব—তাল আড়াচৌতাল
২২ সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার।
রাগিণী আলাইয়া—আড়াঠেকা
২৩ কি দিব তোমায়। রাগিণী আসোয়ারি—তাল আড়াঠেকা
২৪ কেরে ওই ডাকিছে, স্নেহের রব উঠিছে।
রাগিণী আলাইয়া—তাল ধামার
২৫ সকলেরে কাছে ডাকি আনন্দ-আলয়ে থাকি।
রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল
২৬ তোমারেই প্রাণের আশা কহিব। ভজন—তাল ছেপকা
২৭ অনিমেষ আঁখি সেই সে দেখেছে। রাগিণী দেশ—আড়াঠেকা
২৮ সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে। কর্ণাটি ভজন—একতালা
২৯ বর্ষ ওই গেল চলে। রাগিণী পূরবী—আড়াঠেকা
৩০ সখা, তুমি আছ কোথা। রাগিণী টোড়ি—তাল একতালা

৩১ প্রভু এলেম কোথায়। রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা

৩২ সকলি ফুরাইল। যামিনী পোহাইল। টোড়ি—কাওয়ালি

৩৩ যাওরে অনন্তধামে মোহ মায়া পাসরি। প্রভাতী—ঝাঁপতাল

৩৪ ওরে যেতে হবে, যেতে হবেরে। ললিত—আড়াঠেকা

৩৫ আমার যাবার সময় হল। খট্—কাওয়ালি

৩৬ মা আমি তোর কি করেছি। মিশ্র বাঁরোয়া—আড়াঠেকা

৩৭ আমিই শুধু রইনু বাকী। রামপ্রসাদী সুর

৩৮ দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমিত এনেছ ডাকি।
মিশ্র ছায়ানট—ঝাঁপতাল

৩৯ তুমি কিগো পিতা আমাদের। রাগ ভয়রোঁ—তাল কাওয়ালি

৪০ আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন।
রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল

৪১ তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল

৪২ একি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ।
রাগিণী ইমনভূপালি—তাল কাওয়ালি

৪৩ দিবানিশি করিয়া যতন। রাগিণী ধুন—তাল কাওয়ালি

৪৪ কোথা আছ প্রভু? এসেছি দীনহীন।
গুজরাটী ভজন—তাল একতালা

৪৫ দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব।
রাগ ভয়রোঁ—তাল ঝাঁপতাল

৪৬ কি করিলি মোহের ছলনে। ভজন—তাল ঠুংরি

৪৭ প্রভু দয়াময়, কোথা হে দেখা দাও।[১]
রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি

১ গানটি, ১৮৩৭ শক আশ্বিন সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা বলিয়া বর্ণিত। গীতবিতান প্রথম সংস্করণের খ পরিশিষ্টে, যে গানগুলি কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া বর্ণিত হইলেও বস্তুত তাহা নয় বলিয়া উল্লিখিত, এ গানটি তাহার অন্যতম। দ্রষ্টব্য অখণ্ড গীতবিতান (বৈশাখ ১৩৭৩), জ্ঞাতব্যপঞ্জী, পৃ ৯৬৫।

৪৮ তবে কি ফিরিব ম্লানমুখে সখা।

রাগিণী দেশী টোড়ি—তাল ঢিমে তেতালা

৪৯ তাহার প্রেমে কে ডুবে আছে। রাগ ভৈরোঁ—তাল একতালা

৫০ দুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ।

রাগিণী রামকেলি—তাল ঝাঁপতাল

৫১ দাও হে হৃদয় ভরে দাও। রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি

৫২ ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়।

রাগিণী মিশ্র বেলাবতী—তাল কাওয়ালি

৫৩ বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও।

রাগিণী কর্ণাটী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি

৫৪ শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার। বেহাগ

৫৫ এ মোহ আবরণ খুলে দাও দাও হে।

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা

৫৬ আইল আজি প্রাণসখা, দেখরে নিখিল জন।

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা

৫৭ দুয়ারে বসে আছি প্রভু সারা বেলা।

রাগিণী কামোদ—তাল ধামার

৫৮ তুমি ধন্য ধন্য হে ধন্য তব প্রেম।

রাগিণী কেদারা—তাল ঝাঁপতাল

৫৯ ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল

৬০ দুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল

৬১ শুভদিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দ মনে।

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ

৬২ (আমার) হৃদয় সমুদ্র তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে। কীর্ত্তনের সুর

৬৩ আজি শুভদিনে পিতার ভবনে।

রাগিণী কর্ণাটী খাম্বাজ—তাল ফেরতা

৬৪ বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে দয়াময়।

রাগিণী কাফি কানাড়া—তাল ঢিমে তেতালা

৬৫ তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে।
রাগিণী দেশ খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল

৬৬ চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে। রাগিণী মিশ্র মল্লার—তাল রূপক

৬৭ এ পরবাসে রবে কে হায়। রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান

৬৮ সংশয় তিমির মাঝে। রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল ঠুংরি

৬৯ তুমি ছেড়ে ছিলে, ভুলে ছিলে বলে। রাগিণী দেশ—তাল একতালা

৭০ মাঝে মাঝে তব দেখা পাই। রাগিণী কাফি—তাল একতালা

৭১ এসেছে সকলে কত আশে। রাগিণী হাম্বীর—তাল চৌতাল

৭২ পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে। রাগিণী বাহার—তাল একতালা

৭৩ জগতের পুরোহিত তুমি। রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা

৭৪ তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর।
রাগিণী জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

জাতীয় সঙ্গীত

১ ঢাকো রে মুখ, চন্দ্র মা! জলদে। রাগিণী গৌড় মল্লার

২ তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ। রাগিণী জয়জয়ন্তী

৩ একি অন্ধকার এ ভারতভূমি। রাগিণী প্রভাতী—তাল একতালা

৪ মায়ের বিমল যশে যে সন্তান অরপিবে।

৫ দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে। বাহার—কাওয়ালি

৬ ও গান গাস্‌নে—গাস্‌নে—গাস্‌নে। বেহাগড়া

৭ শোন শোন আমাদের ব্যথা। মিশ্র দেশ খাম্বাজ—ঝাঁপতাল

পরিশিষ্ট

১ দীর্ঘ জীবন পথ। রাগিণী আসাবরি—তাল ঝাঁপতাল

২ দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ।
গৌড়সারং—তাল একতালা

৩ গাও বীণা, বীণা গাওরে। রাগিণী টোড়ি—তাল একতালা

৪ আজি কাঁদে কা'রা ওই শুনা যায়[১]।
রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা

---

১ "বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত"।

নামকরণ

নিম্নমুদ্রিত চিঠিতে বইটির নামকরণের ইতিহাস পাওয়া যায়—

গ্রন্থপ্রকাশক যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

রবিবাবু

…বোধহয়, আবার 'ছায়া-আলোক' ভাল শুনায় না। কি করিব অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিন। 'ছায়া' মানে হৃদয়ের প্রতিবিম্ব বুঝাইতে পারে, তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের ছায়া না বুঝাইতেও পারে, ঐ এক কথার মধ্যে আলোক আঁধার দুই থাকিতে পারে। যে নামটি ভাল বোধ হয় এই লোকের নিকট অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিবেন। নামটি একটু poetic হওয়া আবশ্যক।

২০ সে ডিসেম্বর ৮৪
২ নং বেনেটোলা লেন
কলেজস্কোয়ার

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র

রবীন্দ্রনাথের উত্তর। উপরিমুদ্রিত পত্রের শীর্ষে।

আলোছায়া বল্লে কেমন হয়? আর, "রবিচ্ছায়া" যদি বলেন সে আপনাদের অনুগ্রহ। নামকরণের ভার আপনার উপরে— যখন আপনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন তখন তার গোত্র ও নাম আপনারি দাতব্য— আমার সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১]

সমসাময়িক সমালোচনা

সঞ্জীবনী পত্রের ২০ বৈশাখ ১২৯২ সংখ্যায় এই সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল—

সমালোচনা

রবিচ্ছায়া—বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত সিটি কলেজের শিক্ষক বাবু যোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸০। রবীন্দ্রবাবু ২৫ বৎসর বয়স পার না হইতেই একজন বিখ্যাত কবি ও প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লেখক বলিয়া সাধারণের নিকট

---

১ চিঠি দুইখানি শ্রীসুভো ঠাকুর ও শ্রীরথীন্দ্র মৈত্র সংকলিত 'অতিক্রমা'য় (১৩৫১) লেখকদের হস্তাক্ষরে প্রকাশিত। পত্র দুইখানি যোগেন্দ্রনারায়ণের পুত্র শ্রীঅমল মিত্রের সংগ্রহভুক্ত ও তাঁহার সৌজন্যে পুনর্মুদ্রিত।

পরিচিত হইয়াছেন। সঙ্গীত প্রণয়নে তাঁহার যে অসাধারণ ক্ষমতা আছে তাহা "রবিচ্ছায়া" পাঠে বিশেষরূপে অবগত হইলাম। "রবিচ্ছায়া" একখানি সঙ্গীত পুস্তক। ইহাতে স্বভাব সঙ্গীত, প্রণয় সঙ্গীত ও ব্রহ্ম সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সঙ্গীত শাস্ত্রের কোনও ধার ধারি না—কিন্তু আমাদের দুই একজন বন্ধু এই গ্রন্থের যে দুই একটি সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইয়াছেন, তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি— সঙ্গীতগুলি যেমন সরল, সুমিষ্ট কবিত্বে পূর্ণ, তেমনিই মনোহারিণী রাগিণীতে সংবদ্ধ। এমন হৃদয় মুগ্ধকর সঙ্গীত বাঙ্গালীর মধ্যে আর কেহ প্রণয়ন করিতে পারেন কিনা আমরা জানি না। সংগ্রাহক মহাশয় রবিবাবুর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সঙ্গীতগুলির প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীর সঙ্গীত পিপাসা নিবৃত্তির এক বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। "রবিচ্ছায়া" বাংলা ভাষায় এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এ সৃষ্টির জন্য রবিবাবু ও যোগেন্দ্রবাবু উভয়কেই আমরা ধন্যবাদ দিতেছি।

মূল্য হ্রাস

প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই রবিচ্ছায়া হ্রাসমূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। সঞ্জীবনী পত্রে ২১ অগ্রহায়ণ ১২৯২ হইতে ৪ মাঘ ১২৯২ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে এই বিজ্ঞাপন[১] প্রকাশিত হইতে থাকে বলিয়া জানা যায়—

মূল্য কমিল রবিচ্ছায়া মূল্য কমিল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মুগ্ধ হন নাই এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী বিরল। তিনি কবিতা লিখিয়া বঙ্গ ভাষায় এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি একত্র মুদ্রিত হইয়া "রবিচ্ছায়া" নামে এত দিন বিক্রীত হইতেছিল। ইহা প্রেমসঙ্গীত, শোকসঙ্গীত ও ধর্ম্মসঙ্গীতে পরিপূর্ণ। বঙ্গবাসী যদি কখনও নির্ম্মল পবিত্র আমোদ অনুভব করিবার বাসনা থাকে, যদি কখনও হৃদয়-মনকে ক্ষণকালের নিমিত্তও সংসারের অতীত করিতে অভিলাষ হয়, যদি কখনও বিষাদময় অন্ধকার জীবনে জ্যোৎস্নালোক আনয়ন করিতে মানস থাকে, তবে আপনার জন্য বড় সুবিধার সময় আসিয়াছে। এতকাল ৸৹ আনা করিয়া "রবিচ্ছায়া" বিক্রয় হইতেছিল। অতঃপর ৷৷৹ আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। ডাকমাশুল ৴৹। নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়। ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, মোহিনী-

১ সঞ্জীবনীর সমালোচনা, বিজ্ঞাপন ও তৎসংক্রান্ত তথ্য যোগেন্দ্রনারায়ণের পুত্র শ্রীঅমল মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মোহন মজুমদারের দোকান ও ক্যানিং লাইব্রেরী, ১৩৮নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ; সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী, চীনাবাজার পদ্মচন্দ্রনাথের দোকান, ৯৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, সোমপ্রকাশ ডিপোজিটারী, ৬৬নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের দোকান, ২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।

"সঞ্জীবনী" ও "ভারত শ্রমজীবীর"[১] গ্রাহকগণ আমার নিকট মূল্য পাঠাইলে ।৵০ (ছয় আনা) মূল্যে পাইবেন। ৴০ ডাকমাশুল লাগিবে।

শ্রীশশীভূষণ বিশ্বাস
২নং বেনেটোলা লেন
পটলডাঙ্গা, কলিকাতা,
ভারত শ্রমজীবী কার্য্যালয়।

১ ভারত শ্রমজীবী পত্রের ফাল্গুন ১২৯২ সংখ্যায় রবিচ্ছায়ার একটি গান "হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ ও শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস এই তথ্য জানাইয়াছেন।

কড়ি ও কোমল। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। / শ্রীআশুতোষ চৌধুরী কর্ত্তৃক / সম্পাদিত। / ৭৮নং কলেজষ্ট্রীট্ পীপ্‌ল্‌স লাইব্রেরি হইতে / প্রকাশিত। / মূল্য এক টাকা।

আখ্যাপত্রের পিছনে

কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। / ৫৫নং অপর চিৎপুর রোড। / সন ১২৯৩।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ [।০], ।৵০, [২], ২৬৩

প্রকাশ [১৭ নভেম্বর ? ১৮৮৬]। মুদ্রণসংখ্যা ৫০০

গ্রন্থোৎসর্গ

উৎসর্গ। / শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর / দাদা মহাশয় / কর কমলেষু।

সূচী

প্রাণ ॥ মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে [প্রবেশক]

পুরাতন ॥[১] হেথা হতে যাও, পুরাতন

ভারতী।[২] চৈত্র ১২৯১

নূতন ॥ হেথাও ত পশে সূর্য্যকর

ভারতী। বৈশাখ ১২৯২

উপকথা ॥ মেঘের আড়ালে বেলা কখন্ যে যায়

ভারতী। ফাল্গুন ১২৯১

যোগিয়া ॥ বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চ'লে

ভারতী। কার্তিক ১২৯১

শরতের শুকতারা ॥ একাদশী রজনী

ভারতী। অগ্রহায়ণ ১২৯১

---

১ এই কবিতায় গ্রন্থারম্ভ। সাময়িক পত্রে 'বিদায়' নামে মুদ্রিত।

২ সাময়িক পত্রে প্রকাশের নির্দেশ প্রধানত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস-কৃত রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী (শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৬) হইতে গৃহীত। শ্রীকানাই সামন্ত-কৃত একটি সূচী দ্বারাও উপকৃত হইয়াছি।

কাঙালিনী ॥ আনন্দময়ীর আগমনে

প্রচার। কার্তিক ১২৯১

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি ॥ সম্মুখে র'য়েছে পড়ি যুগ-যুগান্তর

প্রচার। অগ্রহায়ণ ১২৯১

মথুরায় ॥ বাঁশরী বাজাতে চাহি। মিশ্রকাফি-একতালা

প্রচার। মাঘ ১২৯১

বনের ছায়া ॥ কোথারে তরুর ছায়া

কোথায় ॥ হায় কোথা যাবে

ভারতী। পৌষ ১২৯১

শাস্তি ॥ থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা

ভারতী। শ্রাবণ ১২৯২

পাষাণী মা ॥[১] হে ধরণী, জীবের জননী

বালক। আশ্বিন ও কার্তিক ১২৯২

হৃদয়ের ভাষা ॥ হৃদয়, কেন গো মোরে ছলিছ সতত

বিদেশী ফুলের গুচ্ছ

মধুর সূর্য্যের আলো, আকাশ বিমল। Shelley

ভারতী। শ্রাবণ ১২৯১

সারাদিন গিয়েছিনু বনে। Mrs. Browning

ভারতী। শ্রাবণ ১২৯১

---

১ বালকে প্রকাশিত 'আকুল আহ্বান' কবিতার একটি স্তবক। দ্র. এই সূচীতে পরে উল্লিখিত 'আকুল আহ্বান' ও 'মায়ের আশা'; এই তিনটিতে মিলিয়া বালক পত্রের 'আকুল আহ্বান' কবিতা; কড়ি ও কোমলে উহা তিন ভাগে বিভক্ত।

বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'পুষ্পাঞ্জলি' পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা উপলক্ষে শ্রীকানাই সামন্ত বালক পত্রে (আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২) প্রকাশিত 'আকুল আহ্বান' কবিতাটি সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং ইহার কোন্ অংশ কিভাবে কড়ি ও কোমলে তিনটি কবিতায় বিভক্ত হইয়াছে তাহার সম্যক বিবরণ দিয়াছেন।

আমায় রেখ না ধ'রে আর। Ernest Myers

ভারতী। শ্রাবণ ১২৯১

প্রভাতে একটি দীর্ঘশ্বাস। Aubrey De Vere

ভারতী। শ্রাবণ ১২৯১

গোলাপ হাসিয়া বলে, "আগে বৃষ্টি যাক্ চ'লে।

Augusta Webster

ভারতী। শ্রাবণ ১২৯১

এত শীঘ্র ফুটিলি কেনরে। Augusta Webster

ভারতী। শ্রাবণ ১২৯১

হাসির সময় বড় নেই। P. B. Marston

ভারতী। শ্রাবণ ১২৯১

বেঁচেছিল, হেসে হেসে। Victor Hugo

ভারতী। শ্রাবণ ১২৯১

নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুম। Moore

ভারতী। আষাঢ় ১২৮৮

ওই আদরের নামে ডেকো সখা মোরে। Mrs. Browning

ভারতী। আষাঢ় ১২৮৮

কেমনে কি হল পারিনে বলিতে। Christina Rossetti

ভারতী। কার্তিক ১২৮৮

রবির কিরণ হতে আড়াল করিয়া রেখে। Swinburne

ভারতী। কার্তিক ১২৮৮

দেখিনু যে এক আশার স্বপন। Christina Rossetti

ভারতী। কার্তিক ১২৮৮

নহে নহে, এ নহে মরণ। Hood

বাতাসে অশথ পাতা পড়িছে খসিয়া। কোন জাপানী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ॥ দিনের আলো নিবে এল

বালক। বৈশাখ ১২৯২

সাত ভাই চম্পা॥ সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে

বালক। আষাঢ় ১২৯২

পুরোনো বট ॥ লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা

বালক। ভাদ্র ১২৯২

হাসিরাশি ॥ তার নাম রেখেছি বাব্‌লা রানী

বালক। শ্রাবণ ১২৯২

মা লক্ষ্মী ॥ কার পানে, মা, চেয়ে আছ

বালক। জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

আকুল আহ্বান ॥ অভিমান ক'রে কোথায় গেলি

বালক। আশ্বিন ও কার্তিক ১২৯২

মায়ের আশা ॥[১] ফুলের দিনে সে-যে চলে গেল

বালক। আশ্বিন ও কার্তিক ১২৯২

পত্র ॥ মাগো আমার লক্ষ্মী

শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। স্টীমার। খুলনা

পত্র ॥ বসে বসে লিখ্‌লেম চিঠি

শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। স্টীমার। খুলনা।

জন্মতিথির উপহার ॥ স্নেহ-উপহার এনেছিরে দিতে

(একটি কাঠের বাক্‌স) ॥ বালক। চৈত্র ১২৯২

চিঠি ॥ চিঠি লিখ্‌ব কথা ছিল

শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। স্টীমার। "রাজহংস"। গঙ্গা

বালক। ফাল্গুন ১২৯২

পত্র ॥ জলে বাসা বেঁধেছিলেম

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিঃ স্থলচরবরেষু। 'নৌকাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত।'

ভারতী। ফাল্গুন ১২৯২

পত্র ॥[২] দামু বোস্ আর চামু বোসে

শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু

সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী। ১২৯১-৯২

---

১ দ্র. 'পাষাণী মা' কবিতার পাদটীকা ১, পৃ. ১৬৯।

২ দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৬। সঞ্জীবনীর তারিখ আনুমানিক।

বিরহীর পত্র ॥ হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি

ভারতী ও বালক। ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৩

পত্র ॥ এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা

শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। নাসিক।

পত্র ॥ চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়

শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। নাসিক।

পত্র ॥ আমার এ গান, মাগো, শুধু কি, নিমেষে

শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। নাসিক।

খেলা ॥ পথের ধারে অশথ্-তলে

পাখীর পালক ॥ খেলাধূলো সব রহিল পড়িয়া

ভারতী ও বালক। শ্রাবণ ১২৯৩

আশীর্ব্বাদ ॥ ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ

ভারতী ও বালক। বৈশাখ ১২৯৩

বসন্ত অবসান ॥ কখন্ বসন্ত গেল। সিন্ধু ভৈরবী। আড়াঠেকা

বাঁশি ॥ ওগো শোন কে বাজায়। বেহাগ। আড়াখেম্‌টা

বিরহ ॥ আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন। ভৈরবী। একতালা।

ভারতী ও বালক। ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৩

বাকি ॥ কুসুমের গিয়েছে সৌরভ

বিলাপ ॥ ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা। ঝিঁঝিট। একতালা

সারাবেলা ॥ হেলাফেলা সারা বেলা। মিশ্র ভৈরবী। আড়া খেমটা।

আকাঙ্ক্ষা ॥ আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে। যোগিয়া বিভাস।
একতালা।

তুমি ॥ তুমি কোন্ কাননের ফুল। মিশ্র বাঁরোয়া। আড়াখেমটা

ভুল ॥ বিদায় করেছ যারে। কানাড়া। যৎ

কো তুঁহু ॥ কো তুঁহু বোলবি মোয়।

গান ॥ (ওগো) কে যায় বাঁশরী বাজায়ে। মিশ্র কালাংড়া। আড়খেমটা

ছোট ফুল ॥ আমি শুধু মালা গাঁথি ছোট ছোট ফুলে

যৌবন স্বপ্ন ॥ আমার যৌবন স্বপ্ন যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ

ক্ষণিক মিলন ॥ আকাশের দুইদিক হ'তে দুই খানি মেঘ এল ভেসে

গীতোচ্ছ্বাস ॥ নীরব বাঁশরী খানি বেজেছে আবার

স্তন (১) ॥ নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল
স্তন (২) ॥ পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়
চুম্বন ॥ অধরের কানে যেন অধরের ভাষা
বিবসনা ॥ ফেল গো বসন ফেল— ঘুচাও অঞ্চল
বাহু ॥ কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহু লতা
চরণ ॥ দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়
হৃদয় আকাশ ॥ আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখী
অঞ্চলের বাতাস ॥ পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়
দেহের মিলন ॥ প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
তনু ॥ ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি
স্মৃতি ॥ ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
হৃদয়-আসন ॥ কোমল দুখানি বাহু সরমে লতায়ে
কল্পনার সাথী ॥ যখন কুসুম বনে ফির একাকিনী
হাসি ॥ সুদূর প্রবাসে আজি কেনরে কি জানি
চিত্রপটে নিদ্রিতা রমণীর চিত্র ॥ মায়ায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ আঁধার
কল্পনা-মধুপ ॥ প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুণ্ গুণ্ গান
পূর্ণ মিলন ॥ নিশিদিন কাঁদি সখি মিলনের তরে
শ্রান্তি ॥ সুখশ্রমে আমি সখি শ্রান্ত অতিশয়
বন্দী ॥ দাও খুলে দাও সখি ওই বাহু পাশ
কেন ॥ কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি
মোহ ॥ এ মোহ ক দিন থাকে, এ মায়া মিলায়
পবিত্র প্রেম ॥ ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা ও'রে, দাঁড়াও সরিয়া
পবিত্র জীবন ॥ মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন
মরীচিকা ॥ এস, ছেড়ে এস, সখি, কুসুম শয়ন
গান রচনা ॥ এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা
সন্ধ্যার বিদায় ॥ সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে
রাত্রি ॥ জগতেরে জড়াইয়া শতপাকে যামিনী-নাগিনী
বৈতরণী ॥ অশ্রু স্রোতে স্ফীত হয়ে বহে বৈতরণী
মানব-হৃদয়ের বাসনা ॥ নিশীথে রয়েছি জেগে ; দেখি অনিমিখে
সিন্ধু গর্ভ ॥ উপরে স্রোতের ভরে ভাসে চরাচর

ক্ষুদ্র অনন্ত ॥ অনন্ত দিবস রাত্রি কালের উচ্ছ্বাস
সমুদ্র ॥ কিসের অশান্তি এই মহা পারাবারে
অস্তমান রবি ॥ আজ কি তপন তুমি যাবে অস্তাচলে
অস্তাচলের পরপারে ॥ (সন্ধ্যা সূর্য্যের প্রতি)। আমার এ গান তুমি
প্রত্যাশা ॥ সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
স্বপ্নরুদ্ধ ॥ পারি না করিতে আমি সংসারের কাজ
অক্ষমতা ॥ এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা
জাগিবার চেষ্টা ॥ মা কেহ কি আছ মোর, কাছে এস তবে
কবির অহঙ্কার ॥ গান গাহি বলে কেন অহঙ্কার করা
বিজনে ॥ আমারে ডেকোনা আজি এ নহে সময়
সিন্ধুতীরে ॥ হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কানাকানি
সত্য (১) ॥ ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ ১২৯৩ : শক ১৮০৮

সত্য (২) ॥ জ্বালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবি শশি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। শ্রাবণ ১২৯৩ : শক ১৮০৮

আত্মাভিমান ॥ আপনি কণ্টক আমি, আপনি জর্জ্জর
আত্ম অপমান ॥ মোছ তবে অশ্রুজল, চাও হাসি মুখে
ক্ষুদ্র আমি ॥ বুঝেছি বুঝেছি সখা, কেন হাহাকার
প্রার্থনা ॥ তুমি কাছে নাই বলে হের সখা তাই
বাসনার ফাঁদ ॥ যারে চাই, তার কাছে আমি দিই ধরা
চিরদিন ॥ কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য্য তারা

ভারতী ও বালক। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩

বঙ্গভূমির প্রতি ॥ কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে।

কাফি। কাওয়ালি

বঙ্গবাসীর প্রতি ॥ আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।

মিশ্র সিন্ধু। কাওয়ালি।

আহ্বান গীত ॥ পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ

বালক, পৌষ ১২৯২

শেষ কথা ॥ মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে

সংস্করণ *

কড়ি ও কোমল গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালে— প্রথম সংস্করণের কতকগুলি কবিতা বর্জিত হয়, ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের পদাবলীর কতকগুলি রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয়— বস্তুত এই গ্রন্থ উক্ত তিনখানি পুস্তকেরই একত্র দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ—

কড়ি ও কোমল। / ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের / পদাবলী সম্বলিত। / (দ্বিতীয় সংস্করণ) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। / কলিকাতা।/ অপার সারকুলার রোড কাশিয়াবাগান বাগানবাটীতে "ভারতী যন্ত্রে" / শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত। / সন ১৩০১। / মূল্য এক টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, উৎসর্গ, দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন, শুদ্ধিপত্র [৬], সূচিপত্র ।০, ১৮৮

প্রকাশ [১৮ জুলাই ১৮৯৪]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য এক টাকা

উৎসর্গ কড়ি ও কোমল প্রথম সংস্করণের অনুরূপ।

'দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে' লিখিত হইয়াছে—

'ছবি ও গান, ভানুসিংহের পদাবলী ও কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ঐ তিন গ্রন্থের যে সকল কবিতা পাঠক সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য জ্ঞান করি, তাহাই এই গ্রন্থে একত্র প্রকাশিত হইল। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করা হইয়াছে। তিনখানি বহি লেখকের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের লেখা, তন্মধ্যে ভানু সিংহের পদাবলী অপেক্ষাকৃত শৈশবের রচনা।'

কড়ি ও কোমলের এই দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের অনেকগুলি রচনা বর্জিত হয়।

গানগুলি এই সংস্করণে বাদ যায়। 'কো তুঁহু' ভানুসিংহের পদাবলীর অন্তর্গত রচনাগুচ্ছের সহিত এই সংস্করণে মুদ্রিত হয়। "বিদেশী ফুলের গুচ্ছ"ও বর্জিত হয়। ইহা ছাড়া পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত কবিতাগুলিও বর্জিত হয়—

শরতের শুকতারা
পাষাণী মা
মা লক্ষ্মী
মায়ের আশা
পত্র। মাগো আমার লক্ষ্মী
পত্র। বসে বসে লিখলেম চিঠি
জন্মতিথির উপহার
চিঠি। চিঠি লিখব কথা ছিল
পত্র। জলে বাসা বেঁধেছিলেম
পত্র। দামু বোস আর চামু বোসে
খেলা
বাকি
বৈতরণী
সিন্ধুগর্ভ
ক্ষুদ্র অনন্ত
জাগিবার চেষ্টা
বিজনে

কড়ি ও কোমলের দ্বিতীয় সংস্করণে বালক ১২৯২ বৈশাখ সংখ্যা হইতে 'ফুলের ঘা' ("বসন্ত বালক মুখভরা হাসিটি") মুদ্রিত হয়; পরে কড়ি ও কোমল হইতে বর্জিত ও 'শিশু' গ্রন্থে 'শীতের বিদায়' নামে গৃহীত।

১৩০৩ সালে প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থে'র অন্তর্গত কড়ি ও কোমলকে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ বলা যাইতে পারে। বঙ্গভূমির প্রতি ("কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে") ও বঙ্গবাসীর প্রতি ("আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না") এই গান দুটি এই কাব্যগ্রন্থে 'গান' বিভাগে মুদ্রিত হয়; কড়ি ও কোমল প্রথম সংস্করণের অন্যান্য গানগুলি পুনরায় কড়ি ও কোমলের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'কো তুহু' ভানুসিংহের পদাবলীর অন্তর্গত থাকে। "বিদেশী ফুলের গুচ্ছ" এই কাব্যগ্রন্থে "অনুবাদ" বিভাগে মুদ্রিত হয়। কড়ি ও কোমল দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত কোনো কোনো কবিতা কাব্যগ্রন্থে বর্জিত হয় এবং উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত কোনো কোনো কবিতা পুনর্গৃহীত হয়।

পরবর্তীকালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত সংস্করণে [১৯১১]

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে বর্জিত অনেক রচনাই পুনরায় কড়ি ও কোমলে স্থান পাইয়াছে। এইটিই সম্ভবত চতুর্থ সংস্করণ। এই সংস্করণই এখন প্রচলিত প্রথম সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত ও পরে বর্জিত কয়েকটি কবিতা মার্জিত বা পুনর্লিখিত হইয়া 'শিশু'তে স্থান পাইয়াছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে কড়ি ও কোমল প্রকাশকালে, ইহার কতকগুলি কবিতা, এই রচনাবলীর অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে বা হইবে বলিয়া, রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এই গ্রন্থ হইতে বর্জিত হয়।

কড়ি ও কোমলের অন্তর্গত গান

সূচীতে এগুলির রাগ-তালের নির্দেশ আছে। "হৃদয়-আকাশ" ("আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখী") ও "গান রচনা" ("এ শুধু অলস মায়া") এ দুটিতে এ সময় সম্ভবত সুরসংযোগ হয় নাই; শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এইরূপ জানাইয়াছেন। কাব্যগ্রন্থে (১৩০৩) কড়ি ও কোমলের যে রচনাগুলি গান তাহা বিশেষ ভাবে চিহ্নিত; এ দুটিতে সেরূপ চিহ্ন নাই। রচনা দুটি কড়ি ও কোমল দ্বিতীয় সংস্করণে আছে।

কবির মন্তব্য

জীবনস্মৃতির বিভিন্ন অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কড়ি ও কোমল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; তাহার কোনো কোনো অংশ উদ্‌ধৃত হইল:

বর্ষা ও শরৎ

···বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি।···

কিন্তু, আমি যে-সময়কার কথা বলিতেছি সে-সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, তখন শরৎঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায় —সেই শিশিরে-ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে, মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিয়া বেড়াইতেছি, সেই শরতের সকালবেলায়।—

আজি শরত-তপনে প্রভাতস্বপনে

কি জানি পরান কি যে চায়।[১]

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে, বাড়ির ঘণ্টায় তুপুর বাজিয়া গেল, একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজকর্ম্মের কোনো দাবিতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না, সেও শরতের দিনে।—

হেলাফেলা সারাবেলা

এ কি খেলা আপন-মনে।[২]

…সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা-বাদ্য লইয়া মহাসমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর, এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোটির মধ্যে যে-উৎসব তাহা মানুষের। মেঘরৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখতুঃখের আন্দোলন মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাবেগ নিশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।

আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবার অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু মাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, সানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপোষ, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই-সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।

'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।—

---

১ কড়ি ও কোমল, "আকাঙ্ক্ষা"

২ কড়ি ও কোমল, "সারাবেলা"

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।[১]

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র-জীবনের এই আত্মনিবেদন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

…আমি তখন কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই-সকল লেখায় তিনি [আশুতোষ চৌধুরী] ফরাসি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমল-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই কবিতাগুলির মূলকথা।

আশু বলিলেন, "তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্য্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব।" তাঁহারই 'পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'— এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্মকথাটি আছে।

অসম্ভব নহে। বাল্যকালে যখন ঘরের মধ্যে বদ্ধ ছিলাম তখন অন্তঃপুরের ছাদের প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বাহিরের বিচিত্র পৃথিবীর দিকে উৎসুকদৃষ্টিতে হৃদয় মেলিয়া দিয়াছি। যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবনলোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিল না, আমি প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলাম। খেয়ানৌকা পাল তুলিয়া ঢেউয়ের উপর দিয়া পাড়ি দিতেছে, তীরে দাঁড়াইয়া আমার মন বুঝি তাহার পাটনিকে হাত বাড়াইয়া ডাক পাড়িত। জীবন যে জীবনযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে চায়।

কড়ি ও কোমল

…বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরৌদ্রের খেলা আছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই, এদিকে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল

---

১ কড়ি ও কোমল, "প্রাণ"

তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ্গ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল।...

সঞ্চয়িতার (১৩৩৮) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কড়ি ও কোমল সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—

"কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্তু সেই পর্ব্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।"

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে (বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৪৬) প্রভাতসংগীত সম্বন্ধে 'কবির ভণিতা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"কড়ি ও কোমল রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয় নি। কাঁচা বয়সে মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে কিন্তু যে উপাদান তাদেরকে শরীরের বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল; এইজন্যে ওগুলো হয়েছে ঢেউওয়ালা জলের উপরকার প্রতিবিম্বের মতো আঁকাবাঁকা; ওরা মূর্ত হয়ে ওঠে নি, সুতরাং কাব্যের পদবীতে পৌঁছতে পারে নি। সেইজন্যে আমার মত এই যে, কড়ি ও কোমলের পর থেকেই আমার কাব্যরচনা ভালো মন্দ সব কিছু নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বন করেছে।"

রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে (বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৪৬) কড়ি ও কোমল সম্বন্ধে মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। মনে পড়ে তখনকার দিনে নিজের মনের একটা উদ্বেল অবস্থা। তখন আমার বেশভূষায় আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর, তার খুঁটোয় বাঁধা ভোরবেলায় তোলা এক মুঠো বেল ফুল, পায়ে এক জোড়া চটি। মনে আছে থ্যাকারের

দোকানে বই কিনতে গেছি কিন্তু এর বেশি পরিচ্ছন্নতা নেই, এতে ইংরেজ দোকানদারের স্বীকৃত আদবকায়দার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ হত। এই আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা কড়ি ও কোমলের কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই রীতির কবিতা তখনো প্রচলিত ছিল না। সেইজন্যেই কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সাহিত্য-বিচারকদের কাছ থেকে কটুভাষায় ভর্ৎসনা সহ্য করেছিলুম। সে সব যে উপেক্ষা করেছি অনায়াসে সে কেবল যৌবনের তেজে। আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক। তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো একটা কাব্যরীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণই ভুলে ছিলুম। আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অভ্যস্ত। তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। বড়োদাদার স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধ হয় মিল ছিল না, সেইজন্যে ভালোলাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারে নি। তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল। তার সঙ্গে বাহিরের কোনো মিশ্রণ যদি ঘটে থাকে তো সে গৌণভাবে।

এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি-প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বরাবর প্রবাহিত হয়েছে—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,—

যা নৈবেদ্যে আর এক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে

যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।

শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত একখানি পত্রে ("চৈত্র ১৩৩৭") কড়ি ও কোমলের "প্রাণ" কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"বহুকাল আগে "কড়ি ও কোমল"-এর একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'

তার মানে এই, মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্যেই মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডীগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারিনে। স্বাজাত্যের খুঁটি গাড়ি ক'রে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠ্‌ল না, কেন না অমরতা তাঁরই মধ্যে যে মানব সর্ব্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হ'য়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।…"

সমসাময়িক সমালোচনা

কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হইবার বৎসরাধিক কাল পরে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ঐ গ্রন্থকে ব্যঙ্গ করিয়া "…মিঠে কড়া" কবিতা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন (কড়ি ও কোমল, ১৭ নভেম্বর ১৮৮৬ ; মিঠে কড়া ১৭ এপ্রিল ১৮৮৮)। নিম্নে ওই পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুদ্রিত হইল—

> [কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ]। **ইহা কড়িও নহে, কোমলও নহে, পুরো সুরে মিঠেকড়া।** রাহু-রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্রে, শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সন ১৩০১। মূল্য এক আনা মাত্র। পৃ. ২৪

প্রথম প্রকাশ-তারিখ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসাধক চরিতমালার ৬৮-সংখ্যক গ্রন্থে বেঙ্গল লাইব্রেরি তালিকা হইতে দিয়াছেন ১৭ এপ্রিল ১৮৮৮।

রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল প্রথম সংস্করণ (১২৯৩) সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-কবিতার সমষ্টি। কবিতার দৃষ্টান্ত—

"উড়িস্‌নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা।
তোর বক্ বকম্ আর ফোঁস ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা!

তাও ছাপালি ; গ্রন্থ হ'ল
নগদ মূল্য এক টাকা !!!—রাহু"
"…চুনোগলি হার মেনেছে
মৌলিকতা দেখে ॥
যত মুদি মালা বাংলা পড়ে
রবি ঠাকুর লেখে।—রাহু"[১]

'মিঠেকড়া' পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের 'কবি-ভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথ সেন ১২৯৮ সালের আষাঢ় সংখ্যা সাহিত্যে 'শ্রীকাকাতুয়া দেবশর্মা' ছদ্মনামে 'রবিরাহু' নামে একটি কবিতা লেখেন।[২] তাহার শেষ কয়েক ছত্র—

বায়স কহিল হর্ষে, "শোন পক্ষী সব,
আম্রের মদিরা নিয়ে ওই যে ডাকিছে।
উহু! উহু! শুনে ওর কুহু কুহু রব,
আমার বায়স-প্রাণ ফাটিয়া যাইছে।"
"O birdie, O birdie, what name ownest thou ?"
The Jackdaw replied, "I am called রবিরাহু।"

১ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও রবীন্দ্রনাথের অপর একটি বিষয়ে যোগাযোগের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যে প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ ক্রমশ প্রকাশ করেন, কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ তাহার পাঠক ছিলেন, জীবনস্মৃতিতে সে কথা উল্লিখিত আছে—"বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি…টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।"

১২৮৮ সালের ভারতী পত্রে শ্রাবণ ও ভাদ্র-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ "প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ" প্রবন্ধে ও কার্তিক-সংখ্যায় "বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট" প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের বিদ্যাপতি খণ্ডের (১৮৭৪) বিস্তারিত সমালোচনা করেন। "টীকার যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিইনি।"

এই সমালোচনা প্রকাশিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে, ১২৯৩ সালে (কড়ি ও কোমল এই সালে প্রকাশিত হয় ; মিঠে কড়া পুস্তিকাকারে সম্ভবত প্রকাশিত হয় ১২৯৪ সালে) সাবিত্রী লাইব্রেরিতে পঠিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ সাবিত্রী গ্রন্থে নিম্নমুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—

'বিজ্ঞাপন।

বিদ্যাপতির পদাবলী।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

শ্রীগোবিন্দ লাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রায় দশ বৎসরকাল রবীন্দ্রবাবু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।...ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত কয়েকটী সংস্করণে পদের বা টীকার যত ভুল আছে, এই গ্রন্থে প্রায় সে সমস্ত সংশোধিত হইল।...

১৫০ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত।

মূল্য আট আনা মাত্র।

অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

পিপেল্‌স্‌ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।'

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত এই গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত, এমন-কি, প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট, হইলেও শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই সময়েই বিদ্যাপতির পদাবলী "প্রকাশের কল্পনা" করিতেছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত "বিদ্যাপতি" প্রকাশিত হয় অবশ্য অনেক পরে, ১৩০১ সালে। ১৩০৫ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন—

"...শ্রীযুক্তবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কয়েকটী পরামর্শ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার একখানি পুরাতন খাতা দিয়াও আমাকে বাধিত করিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে (শ্রাবণ ১৩৪৭) ভানুসিংহের পদাবলীর 'সূচনায়' লিখিয়াছেন—

বহু বৎসর ধরিয়া মিঠে কড়া পুনর্মুদ্রিত হইতে থাকে। কয়েকটি সংস্করণের প্রকাশ-তারিখ নিম্নে দেওয়া হইল—

দ্বিতীয় সংস্করণ	১৩০১
চতুর্থ সংস্করণ	১৩০৬
পঞ্চম সংস্করণ	১৯০২
ষষ্ঠ সংস্করণ	১৯০৬
সপ্তম সংস্করণ	১৩২৫

দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীসুকুমার সেনের সংগ্রহে ; চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে এবং পঞ্চম সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে।

এগুলি ছাড়াও পুস্তিকাটির সংস্করণ হইয়াছে। জাতীয় গ্রন্থাগারে অপর একখানি সংস্করণ আছে উহাও 'সপ্তম সংস্করণ' বলিয়া বর্ণিত, প্রকাশকাল ১৩২৮। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-গ্রন্থতালিকায় অপর একখানি ষষ্ঠ সংস্করণের উল্লেখ আছে। তাহার তারিখ ওই তালিকায় দেওয়া হইয়াছে ১৩২২।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রবীন্দ্র-সাগরসংগমে' গ্রন্থে (১৩৬৯) ও শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার 'কড়ি ও কোমল ও মিঠে কড়া' পুস্তিকায় (চৈত্র ১৩৭০) 'মিঠে কড়া' পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, শ্রীসুকুমার সেন, "রাহুর দ্বেষ" 'যাত্রী' রবীন্দ্র-সংখ্যা ১৩৬৪। এই প্রবন্ধে 'মিঠে কড়া'র অনেক অংশ উদ্ধৃত।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী-সম্পাদিত নব্যভারত পত্রের ১২৯৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যায়

"পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারি নি।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমল হোম ও শ্রীসুকুমার সেন ইতিপূর্বে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন।

২ বার্ষিক সূচীতে রচনাকাররূপে দেবেন্দ্রনাথ সেনের নাম মুদ্রিত। শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার "রাহুর দ্বেষ" (যাত্রী, রবীন্দ্র-সংখ্যা ১৩৬৪) প্রবন্ধে কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।

সম্পাদক কড়ি ও কোমলের একটি সমালোচনা লেখেন।[১] ইহাতে তিনি গ্রন্থের উচ্চপ্রশংসা করেন, তবে 'শ্রীমান্ দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু' "পত্র", ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত কোনো কোনো "পত্র" এই গ্রন্থের অন্তর্গত করা উচিত হয় নাই এইরূপ মন্তব্য করেন ; এই কবিতাগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই রচনাগুলি বিশেষত ইন্দিরাদেবীকে লিখিত চিঠিগুলি বাদ দিবার ফলেও রবীন্দ্রনাথ অনুযোগভাজন হইয়াছিলেন ; দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ তারিখের পত্র, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫, পৃ. ১৪৭।

---

১ রচনাটি শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রবীন্দ্রসাগর-সংগমে' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।

রাজর্ষি।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্তৃক / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / অপার চিৎপুর রোড ৫৫ নং/সন ১২৯৩।/ মূল্য ১৲ এক টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ [৵০], ২৪২

দুই খণ্ডে বিভক্ত। মোট পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ৪৪, উপসংহার, পরিশিষ্ট।

প্রথম খণ্ড ১-১৮ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯-৪৪ পরিচ্ছেদ

প্রকাশ [১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০

সাময়িক পত্রে প্রকাশ

১২৯২ সালের বালক পত্রের আষাঢ় হইতে মাঘ সংখ্যায় রাজর্ষির ১-২৬ পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়।

রাজর্ষি-প্রসঙ্গে ত্রিপুরাধিপতির সহিত পত্রালাপ

সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের শেষাংশ রচনাকালে, রবীন্দ্রনাথ 'গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার রাজত্বসময়ের সবিশেষ ইতিহাস' সংগ্রহের জন্য ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্যকে এই পত্র[১] লেখেন—

ওঁ

২৩ বৈশাখ, ১২৯৩ সন,

বুধবার।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আপনাদের রাজপরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় আছে এইরূপ শুনিতে পাই— সেইজন্য সাহসী হইয়া মহারাজকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের পূর্ব্বকার সম্বন্ধ মহারাজের স্মরণে আসে, এই আমার অভিপ্রায়।

মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া "রাজর্ষি" নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জ্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি।

---

১ চৈত্র ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ 'রবি' পত্রিকা হইতে শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 'জীবনস্মৃতি'র গ্রন্থপরিচয়ে উদ্‌ধৃত। অপিচ দ্রষ্টব্য : ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' (১৩৬৮), পৃ. ৩৯৫।

এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্বসময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করি। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার নির্ব্বাসনদশায় চট্টগ্রামের কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন যদি জানিতে পাই তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের এবং ঐতিহাসিক ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের ফটোগ্রাফ যদি পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপকার হয়।

এই পত্রের উত্তর পাইলে এবং মহারাজের সহিত আলাপ হইলে আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করিব।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
যোড়াসাঁকো।
কলিকাতা।

প্রণত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এই পত্রের বিস্তারিত উত্তর দেন,[১] এবং 'রাজ-রত্নাকর নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানি ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস' হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থিত বিবরণ তাঁহাকে পাঠান; রাজর্ষির প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল—

"মহারাজগোবিন্দমাণিক্যস্য চরিতম্[২]

"কল্যাণমাণিক্যস্য মরণাৎ ষোড়শদিনে বুধবাসরে শুভতিথ্যাদিষুতে যুবরাজো গোবিন্দনারায়ণো নানাবিধমহোৎসবৈঃ স্বকুলাচারবিধিনা সিংহাসনমারুহ্য পূর্ব্বরীত্যৈকপৃষ্ঠে শিবলিঙ্গাকৃতিখচিতামপরপৃষ্ঠে স্বমহিষীগুণবতীনামাঙ্কিতাং সুবর্ণময়ীং রজতময়ীঞ্চ মুদ্রাং প্রথমমেব প্রচারয়ামাস। ততোঽমাত্যাদয়ঃ সর্ব্বে যথাবিধি রাজোপহারং প্রদদুঃ। ভূপালোঽপি সমাগতান্ ব্রাহ্মণান্ ভিক্ষুকাদিংশ্চ ভোজ্যদানাদিভিঃ পরিতুতোষ। অথ তস্য রাজ্যাভিষেকাদীর্ষাপরতন্ত্রস্তদ্বৈমাত্রেয়ো নক্ষত্রঠাকুরো মুর্শিদাবাদাবস্থিতনবাবান্তিকং

---

১ চিঠিখানি জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত আছে। দ্র. পাদটীকা ১, পৃ. ১৮৭।

২ এই বিবরণ আরম্ভ হইবার ভূমিকাস্বরূপ এই টীকা মুদ্রিত হইয়াছিল—"ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ইতিহাস আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। পরিশিষ্ট স্বরূপে তাহা এস্থলে প্রকাশিত হইল।"

গত্বা স্বপরিচয়ং বিজ্ঞাপয়ামাস। সোঽপি ত্রিপুররাজপুত্রোঽয়মিতি সমাদৃত্য তং যথোপচারং স্বনগর্য্যাং স্থাপয়ামাস। নক্ষত্রঠাকুরস্তু প্রত্যহং নানাবিধ-কৌতুকবাক্যেন নবাবং পরিতোষিতবান্। ততঃ ক্রমেণোভয়োঃ সৌহৃদ্যে সঞ্জাতে কদাচিৎ নক্ষত্রঠাকুরো নবাবং স্বাভিলষিতং বিজ্ঞাপ্য "যদ্যহং ত্বৎসাহায্যতঃ স্বপিতৃরাজ্যং লপ্স্যে তদা প্রচুরং হস্ত্যাদ্যুপহারং তে দাস্যামী"তি প্রোবাচ। তদাকর্ণ্য নবাবঃ "বহুশোহি ত্রিপুররাজ্যমধিকর্ত্তুং কৃতযত্নোঽপি পূর্ণমনোরথো নোঽভবম্। পুনরিদানীং যদ্যেষামাত্মবিরোধঃ সঞ্জায়তে, তদানায়াসেনৈব তদ্রাজ্যং লপ্স্য" ইতি স্বাত্মনি বিচিন্ত্য তস্মৈ মহাবলপরাক্রান্তান্ সৈনিকান্ দত্বা বিগ্রহৈঃ স্বরাজ্যলাভায় স্বদেশং গন্তুমাজ্ঞাপয়ৎ। সোঽপি তদাজ্ঞপ্তঃ স্বসৈন্যস্তস্মাৎ প্রস্থায় উদয়পুররাজধানীসমীপমাগতঃ। তদাকর্ণ্য ত্রৈপুরাঃ সর্ব্বএব যুদ্ধোদ্যোগায় ভূপতিং পুনঃ পুনর্নিবেদিতবন্তঃ। সুধীরো ভূপালস্তদাকর্ণ্য "ক্ষণভঙ্গুররাজ্যসুখভোগায় ভ্রাত্রা চিরমকীর্ত্তিকরং যুদ্ধং কদাপ্যহং ন করিষ্যামি, ঈদৃশং রাজ্যভোগমপেক্ষ্য বনগমনমেব শ্রেয়ঃ" ইত্যাদি নীতিবচনৈ স্তান্ প্রবোধ্য সত্বরং স্বমহিষ্যা গুণবত্যা ভ্রাত্রাদিভিশ্চ সহ রিয়াং-দেশং গত্বা তত্রৈকাং পুরীং নির্ম্মায়োবাস। তত্রত্যা রিয়াংগণাস্তং ত্রিপুরেশং স্বজনমিব সংমেনিরে।

অত্রান্তরে কতি দিনং ছত্রমাণিক্যস্য রাজ্যাধিকারঃ, তস্মিন্ মৃতে পুনর্গোবিন্দমাণিক্যএব রাজা বভূব।

অথ রিয়াংরাজ্যাবস্থিতং গোবিন্দমাণিক্যং প্রতি তে রিয়াংগণাঃ ক্রমশো বৈরক্তিং প্রকাশয়ামাসুঃ। স চ তেষামীদৃশাচরণং দৃষ্ট্বা স্বরাজ্ঞীং সোদরং জগদ্বন্ধু-ঠাকুরং সূর্য্যপ্রতাপনারায়ণচম্পকনারায়ণরাজকুমারাভিধানান্ ভ্রাতৃপুত্রাংশ্চ গৃহীত্বা তস্মাৎ চট্টলদেশাভিমুখং জগাম। পথি জগদ্বন্ধুঠাকুরাত্মজো রাজকুমারঃ পিত্রা পুনঃপুনর্নিষিদ্ধোঽপি স্বদেশং গন্তুমুপচক্রমে। তেন ধৃষ্টাচরণেনাতিক্রুদ্ধো জগদ্বন্ধুঠাকুরশ্চ তস্য শিরশ্ছিত্বানয়নায় জামাতরমাজ্ঞাপয়ৎ। স কিয়দ্দূরে রাজকুমারমুপগম্য তং প্রতিনিবর্ত্তয়িতুং বহুশোঽচেষ্টত। তত্র বাক্পারুষ্যেণ বিবদমানয়ো স্তয়োর্যুদ্ধে সঞ্জাতে জগন্নাথো রাজকুমারস্য শিরশ্ছিত্বা শ্বশুরান্তি-কমনয়ৎ। তচ্ছিন্নমুণ্ডমবলোক্য গোবিন্দমাণিক্যস্তং তীব্রং ভর্ৎসয়ামাস। ততোমহারাজশ্চট্টলে কতি দিনমবস্থায় রসাংপ্রদেশং যযৌ। আরাকানাধিপতিস্তু স্বদেশে বন্ধোর্গোবিন্দমাণিক্যস্যাগমনং শ্রুত্বা সত্বরং তমুপস্থায় বন্ধুজনোচিতং

সৌজন্যং প্রদর্শ্য রাজধানীমুপনীয় সুখং বাসয়ামাস। অথৈকসপ্তত্যধিক-দশশতত্রৈপুরবৎসরে দিল্লীশ্বরস্য দ্বিতীয়ঃ পুত্রঃ সুলতান্‌সুজাভিধেয়ঃ স্বভ্রাত্রা আওরংজেবেন পরাজিতঃ পলায়মানঃ রসাংপ্রদেশমুপাযযৌ। কদাচিৎ গোবিন্দমাণিক্যেন সহ সভায়ামুপবিষ্টে তস্মিন্নারাকানাধিপতৌ স দিল্লীশ্বরনন্দনস্তত্রোপগম্য দণ্ডায়মান এব স্বপরিচয়ং বিজ্ঞাপিতবান্। রসাংরাজস্তু যবন ইতি তাচ্ছিল্যেন কিমপি নাচরন্ তুষ্ণীমেব স্থিতঃ। ততোগোবিন্দমাণিক্যঃ সসম্ভ্রমমুত্থায় তমভ্যর্থয়মানঃ রসাংরাজমনিচ্ছন্তমপ্যনুরুধ্য তস্মৈ মহার্হমাসনমপরং প্রাদীদপৎ। ততোযথাসময়মুত্থায় সর্ব্বে যথাস্থানং গন্তুমুদ্যতাঃ। তদা সুলতান্‌সুজা গোবিন্দমাণিক্যস্য করং ধৃত্বা প্রোবাচ ভো ভূপতে! ভবতাহমদ্য যদ্বহুমন্যতে তন্নামরণম্ বিস্মরিষ্যামি। সম্প্রতি হুয়মেব প্রিয়জনোপচারঃ, তদ্‌গৃহীত্বানুগৃহ্নাতুমামিত্যুক্ত্বা তস্মৈ মহার্হং হীরকাঙ্গুরীয়কং প্রদদৌ। ত্রিপুরেশস্তু বারম্বারমনুরুধ্যমানএব তজ্জগ্রাহ। অথ কিয়তা কালেন স সুলতান্‌সুজা আরাকানাধিপস্য দুহিতরমুদ্বাহ্য পরমসুখেন তদ্রাজধান্যামুবাস। পুনঃ স দুষ্টমতির্য্যদ্যহং কেনাপ্যুপায়েন শ্বশুরং হন্তুং শক্নোমি তদেতদ্রাজ্যং সকলমেবাধিকরিষ্যামীতি নিশ্চিত্য তং হন্তুং চত্বারিংশৎ যোদ্ধপুরুষান্ সংজগ্রাহ। অথৈকদা স রাজকুমার্য্যাঃ পিত্রালয়গমনচ্ছলেন বহুদোলাঃ সংগৃহ্য প্রত্যেকং দোলাসু সশস্ত্রং মল্লদ্বয়ং প্রবেশ্য রাজবাট্যাং প্রস্থাপিতবান্। অথ তাসু ক্রমেণ ষষ্ঠদ্বারমতিক্রম্য সপ্তমদ্বারং প্রবেষ্টুমুদ্যতেষু দোলাসু কশ্চিদ্‌বৃদ্ধো দৌবারিকো বহুদোলাঃ সমীক্ষ্য সন্দিগ্ধমনা দোলাবাহকান্ তদ্ধার্য্যবরুধ্য একস্যা দোলায়া দ্বারমুদ্ঘাট্য মল্লদ্বয়ং দদর্শ। ততঃ ক্রমেণ সর্ব্বাভ্যো দোলাভ্যো সশস্ত্রা মল্লগণাঃ নিষ্ক্রম্য দৌবারিকগণৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধমারেভিরে। অথ কোলাহলং শ্রুত্বা চতুর্দ্দিগ্‌ভ্যো রাজসৈনিকাঃ সমাগত্য তান্ মল্লগণান্নিহন্যুঃ। এতদাকর্ণ্য সুলতান্‌সুজা ভয়েন পলায়মানঃ স্থানান্তরং যযৌ। আরাকানাধিপতিঃ কপটাচারিণস্তস্যৈদৃগসদাচরণেন জাতবৈরস্তদ্বধে কৃতসঙ্কল্পোঽপি ইতস্ততোঽন্বিষ্য তং নাপ্তবান্। ততশ্চতুঃসপ্তত্যধিকদশশতত্রৈপুরাব্দে আরাকানরাজঃ ধাতুময়দেবসিংহাসনাদিকং মহার্হং বহুবিধং দ্রব্যজাতং সম্প্রদায় স্ববন্ধুং গোবিন্দমাণিক্যং স্বদেশং প্রেষয়ামাস। অথ মহারাজে ছত্রমাণিক্যে মৃতে রাজ্যমরাজকমবলোক্য রিপুপদ্রবভয়েনোদ্বিগ্নমনসস্ত্রৈপুরপাত্রমিত্রাদয়ো গোবিন্দমাণিক্যস্য চট্টলাগতিং শ্রুত্বা হর্ষব্যাকুলমনসো বিশেষজ্ঞেন দূতেন সর্ব্বমেব তস্মৈ নিবেদয়ন্তঃ পুনারাজ্যভারমঙ্গীকর্ত্তুং যযাচিরে। ভূপতিরপি তেষাং প্রার্থনয়া স্বরাজধানীমাগত্য তদ্বৎসরীয় আশ্বিনে

মাসি শুভক্ষণে পুনর্নৃপাসনমারুরোহ। অথ দিল্লীশ্বর আওরংজেবঃ স্বভ্রাতুঃ সুলতানসুজা-নামকস্য গুপ্ত রূপেণ ত্রিপুরদেশাবস্থিতিমাকর্ণ্য তং বধ্বা স্বান্তিকে প্রেরণায় ত্রিপুরেশসন্নিধিং দূতং প্রেষিতবান্। ততঃ স ভীরুস্ত্রিপুরেশো মোগলোপদ্রবভয়েন হস্তিনঃ পঞ্চ মোগলাধিপায় উপায়নং প্রদদৌ। ইতঃপূর্ব্বং কেনাপি ত্রৈপুরভূপালেনাহুস্হতোনৈষ মার্গঃ। গোবিন্দমাণিক্যএব প্রথমং তদাচরৎ। ততস্তেন শ্রীমচ্চন্দ্রশেখরে মন্দিরমেকং নির্ম্মায় তৎপ্রীত্যায়োৎসসৃজে। অয়মত্র গোবিন্দসাগরোঽন্যত্রাপি বহব্যঃ পুষ্করিণ্যস্তেনৈবোৎসর্গীকৃতাঃ। ততঃ স গঙ্গায়াং গত্বা কাঞ্চনতুলাপুরুষদানমনুষ্ঠায় তাম্রফলকলিখিতেন সনন্দেন ব্রাহ্মণেভ্যো বহ্বীং ভূমিমদাৎ। রাজ্ঞ্যা গুণবত্যা তু মুরনগরপ্রদেশে নাম্না গুণসাগরং সরঃ প্রতিষ্ঠিতং। প্রাবৃষি গোমতীজলপ্লাবনেন মেহেরকুলপ্রদেশঃ প্রজাবাসাযোগ্য আসীৎ। গোবিন্দমাণিক্যএব তস্যাস্তীরয়োঃ সেতুং বধ্বা জলবেগং রুরোধ। তদ্যাবৎ ক্রমেণ তত্র জনাঃ বহুলং বাসস্থানং চক্রিরে। পুরা সুলতানসুজা যদ্ধীরকাঙ্গুরীয়কং তস্মৈ প্রদদৌ স তন্মূল্যব্যয়েন "সুজামসজিদ্" ইত্যাখ্যমিষ্টকগৃহং সুজাগঞ্জং নাম হট্টঞ্চ স্থাপিতবান্। পুরারাকানাধিপতিনা চন্দ্রশেখরে যৎ পূজনাদিকার্য্যজাতং বিলুপ্তীকৃতং গোবিন্দমাণিক্যেনৈব নিজব্যয়েন তৎ সর্ব্বং পুনঃ প্রতিষ্ঠিতং। ইতি"

সংস্করণ

১৩০৬ সালে রাজর্ষির "২য় সংস্করণ" প্রকাশিত হয়; ইহাতে প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্ট অংশ বর্জিত হয়, পরিচ্ছেদ-সংখ্যা একই থাকে।

এই সংস্করণের আখ্যাপত্র—

রাজর্ষি। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / (২য় সংস্করণ) / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও / প্রকাশিত। / ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। / ২৯ ভাদ্র ১৩০৬ সাল। / মূল্য ১৷৹ আনা মাত্র।

পৃষ্ঠাসংখ্যা [৵৹], ২২৪

বিশ্বভারতী-কর্তৃক ১৩৩১ সালে প্রকাশিত সংস্করণের 'পাঠ-পরিচয়ে' প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিয়াছেন যে, "১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পুনর্মুদ্রণে ৪০শ এবং ৪১শ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ বাদ যায়।" ১৩৩১ সালের সংস্করণ প্রসঙ্গে তিনি ওই

পাঠ-পরিচয়ে লিখিয়াছেন যে ইহাতে উক্ত বর্জিত দুই পরিচ্ছেদ ও বিভিন্ন সময়ে পরিত্যক্ত অন্যান্য প্রায় সমস্ত অংশ পুনরায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে প্রকাশকালে (পৌষ ১৩৪৬) পুনরায় কিছু সংস্কার হয়।

নাট্যরূপ ও নাট্যপরিকল্পনা

রাজর্ষি প্রকাশের (১২৯৩) কয়েক বৎসর পর উহার প্রথমাংশ অবলম্বনে বিসর্জন নাটক রচিত (প্রকাশ ১২৯৭) হয়।

উপন্যাসটির শেষাংশ, ও দালিয়া গল্প অবলম্বনে শেষ জীবনে (১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ 'সিনেমার উপযোগী একটি নাটক'-এর খসড়া[১] করেন, নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

১ শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত এই খসড়াটি প্রথমে বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ ১৩৫০ সংখ্যায়, পরে তাঁহার রবিচ্ছবি (১৩৬৮) গ্রন্থে প্রকাশ করেন; তথা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল। ভূমিকায় (পৃ ১০৪) তিনি লিখিয়াছেন—

"আশ্রমে যখন ছিলাম, গুরুদেবের মৌখিক বক্তৃতার শ্রুতিলিখন নিতে চেষ্টা করতাম এবং যথাসময়ে তা লিপিবদ্ধ করে সংশোধনের জন্য তাঁর কাছে রেখে আসতাম।... এরই একটি খাতায় মাঝখানে কবে তিনি একটি নাটকের পরিপূর্ণ পরিকল্পনা লিখে রেখেছিলেন, কিছুই জানতে পারিনি। যখন হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল, তখন সেই পরিকল্পনাকে নাট্যরূপ দেওয়ার রূপকার আর ইহজগতে নেই।

"রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এই অকালের আবিষ্কারটি দেখাতে গিয়ে তার পশ্চাতের ইতিহাসটুকু জানা গেল। গুরুদেবকে দিয়ে বিশেষভাবে সিনেমার উপযোগী একটি নাটক লিখিয়ে নিতে রবীন্দ্রনাথের নিকট ঘন ঘন অনুরোধ কোনো সময়ে আসে। তিনি গুরুদেবকে এই নির্বন্ধাতিশয্যের কথা জানান এবং তারই ফলে সম্ভবত এই নাটকের পরিকল্পনা।..."

আলোচ্য খাতায় লিপিবদ্ধ শ্রুতিলিখনের তারিখ ২ অক্টোবর ১৯৩৬; শ্রুতি-লেখকের শান্তিনিকেতন ত্যাগের তারিখ ৩০ নভেম্বর ১৯৩৬; খসড়াটি এই দুই তারিখের মধ্যে কোনো সময় প্রস্তুত হয়, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত এইরূপ অনুমান করেন।

খাতাটি শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্তের সৌজন্যে বর্তমানে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের সংগ্রহভুক্ত।

প্রথম অংশ

রাজর্ষি বিংশ পরিচ্ছেদ ৭৮ পৃঃ

বিজয়গড়ের দুর্গ

গোবিন্দমাণিক্যকে রাজ্যচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে রঘুপতির মোগল সৈন্যের অনুসরণ।

দুর্গ আক্রমণকারী সুজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ৮১ পৃঃ

বিশ্বাসপরায়ণ বিক্রমসিংহের নির্ব্বুদ্ধিতায় রঘুপতির কাছে দুর্গের সুরঙ্গপথের সংবাদ আবিষ্কৃত। ২১ পরিচ্ছেদ ৮৩ পৃঃ

সুজা যুদ্ধে পরাভূত ও বন্দী। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ৮৮

ব্রাহ্মণের চক্রান্তে গোপন সুরঙ্গপথ দিয়ে সুজার পলায়ন। ২৪ পরিচ্ছেদ—

১১২ পৃঃ ২৮ পরিচ্ছেদ— রাজমহলে সুজা। রঘুপতির সঙ্গে কথাবার্তা। মোগল সৈন্য নিয়ে ত্রিপুরা আক্রমণে রঘুপতির যাত্রা

দ্বিতীয় অংশ

১৭১।১৮৬ পৃঃ ৪২।৪৪ পরিচ্ছেদ। রাজ্যত্যাগী গোবিন্দমাণিক্য চট্টগ্রামে আরাকানরাজের অধীনে। ময়ানী নদীর ধারে কুটীরে তাঁর বাস।

এদিকে শা সুজা আরংজেবের সৈন্য কর্ত্তৃক তাড়িত। তাঁর তিন মেয়েকে ছেলের বেশে সঙ্গে নিয়েছেন। স্থির করেছেন চট্টগ্রামের বন্দরে জাহাজ নিয়ে মক্কায় যাবেন।

বনে কাঠুরিয়া ও শিকারীর দৃশ্য। তারা গোবিন্দমাণিক্যের কুটীরের পথ বলে দেয়।

ফকিরের বেশে শা সুজা গোবিন্দমাণিক্যের দুর্গের কাছে উপস্থিত। গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১৮৯।১৯৩।১৯৪ আরাকানে সুজার প্রস্থান।

তৃতীয় অংশ

গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড। ৭৯ পৃঃ—

আরাকানরাজের ইচ্ছা তাঁর ছেলের সঙ্গে সুজার বড়ো দুই কন্যার বিবাহ হয়। সুজা অসম্মত, রাজা ক্রুদ্ধ।

ছল করে সুজাকে নৌকাবিহারে রাজার নিমন্ত্রণ। স্থির করেছিলেন ফুটো নৌকোয় সুজাকে ডুবিয়ে দিয়ে মেয়ে তিনটিকে নেবেন।

বিপদের সময় কনিষ্ঠা কন্যাকে সুজা স্বহস্তে জলে ফেলে দেন, জ্যেষ্ঠা আত্মহত্যা করে মরে, সুজার কর্ম্মচারী রহমৎ আলি জুলিখাকে নিয়ে সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়।

চতুর্থ অংশ

তারপরে দীর্ঘকাল গেছে। আমিনাকে আরাকানী ধীবর উদ্ধার করে মানুষ করেছে। তাকে ডাকে তিন্নি ব'লে। পাড়ার সবাই তাকে জলদেবী বলে পূজা করে। মাছ ধরতে যাবার সময় নৈবেদ্য দেয়, ঝড়ঝাপটের দিনে আশীর্ব্বাদ নিতে আসে।

সেইরকম একটা পূজারী জনতার দৃশ্য অন্তে আমিনার সঙ্গে জুলিখার সাক্ষাৎ। তাদের মধ্যে দালিয়া। ৮০ হতে ৮৪ পৃঃ

জুলিখার সঙ্গে রহমতের পরামর্শ, আমিনাকে দিয়ে আরাকানের যুবরাজকে মারতে চায়। আমিনা ও দালিয়ার তাই নিয়ে কথাবার্ত্তা। ৮৭ পৃঃ

আমিনা ভক্তদের জানিয়েছে যে সে সমুদ্রে ফিরে যাবে। বিদায় সম্ভাবনায় সকলের শোক। শাঁখ কড়ি ঝিনুক প্রবাল প্রভৃতি অর্ঘ্যদান।

শেষ দৃশ্য ৮৭।৮৮।৮৯ পৃঃ

কবির মন্তব্য

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নে রাজর্ষির গল্পের একাংশ পাইবার বিবরণ দিয়াছেন—

'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল'-এর মাঝখানে বালক নামক একখানি মাসিক পত্র এক বৎসরের [১২৯২] ওষধির মতো ফসল ফলাইয়া লীলাসম্বরণ করিল।

বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজ-বৌঠাকুরানীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু, শুদ্ধমাত্র তাঁহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন। দুই-এক সংখ্যা বালক বাহির হইবার পর একবার দুই-একদিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল, ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না— ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল।

মনে করিলাম, ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালকের জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্ এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাদের বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'বাবা, একি! এ যে রক্ত!' বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরও আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।'

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৪৭, বিশ্বভারতী) রাজর্ষির সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

রাজর্ষি সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ পেয়েছি। বলবার বিশেষ কিছু নেই। এর প্রধান বক্তব্য এই যে এ আমার স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস।

বালক পত্রের সম্পাদিকা আমাকে ঐ মাসিকের পাতে নিয়মিত পরিবেশনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফল হল এই যে প্রায় একমাত্র আমিই হলুম তার ভোজের জোগানদার। একটু সময় পেলেই মনটা কী লিখি কী লিখি করতে থাকে।

রাজনারায়ণবাবু ছিলেন দেওঘরে। তাঁকে দেখতে যাব বলে বেরনো গেল। রাত্রে গাড়ির আলোটা বিশ্রামের ব্যাঘাত করবে বলে তার নিচেকার আবরণটা টেনে দিলুম। অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সহযাত্রীর মন তাতে প্রসন্ন হল না, ঢাকা খুলে দিলেন। জাগা অনিবার্য ভেবে একটা গল্পের প্লট মনে আনতে চেষ্টা করলুম।

"ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখলুম একটা পাথরের মন্দির। ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয় কী বেদনা। বাপকে সে বার বার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন। বাপ কোনোমতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠেই বললুম গল্প পাওয়া গেল। এই স্বপ্নের বিবরণ জীবনস্মৃতিতে পূর্বেই লিখেছি, পুনরুক্তি করতে হল।

আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ। কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল।

বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে।[১] ফসল খেতের যেখানে কিনারা সেদিকটাতে চাষ পড়ে নি, আগাছায় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। সাময়িক পত্রের অবিবেচনায় প্রায়ই লেখনীর জাত নষ্ট হয়। বিশেষ যেখানে শিশু পাঠকই লক্ষ্য সেখানে বাজে বাচালতার সংকোচ থাকে না। অল্প বয়সের ছেলেদেরও সম্মান রাখার দরকার আছে এ কথা শিশুসাহিত্য-লেখকরা প্রায় ভোলেন। সাহিত্য রচনায় গুণী লেখনীর সতর্কতা যদি না থাকে, যদি সে রচনা বিনা লজ্জায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠে, তবে সেটা অস্বাস্থ্যকর হবেই ; বিশেষতঃ ছেলেদের পাকযন্ত্রের পক্ষে। দুধের বদলে পিঠুলি গোলা যদি ব্যবসার খাতিরে চালাতেই হয় তবে সে ফাঁকি বরঞ্চ চালানো যেতে পারে বয়স্কদের পাত্রে তাতে তাঁদের রুচির পরীক্ষা হবে কিন্তু ছেলেদের ভোগে নৈব নৈব চ।

---

১ রাজর্ষি প্রকাশের কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ যখন এই গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে বিসর্জন নাট্য রচনা করেন তখন উক্ত পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত কাহিনীতেই তাহা সমাপ্ত করেন।

চিঠিপত্র / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / কলিকাতা / শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট / হইতে প্রকাশিত / ১৮৮৭

আখ্যাপত্রের পিছনে

কলিকাতা / ৯৬ চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন্ /শ্রীশশীভূষণ দত্ত দ্বারা ভূষণযন্ত্রে মুদ্রিত

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ [৵০], ৬৯

প্রকাশ [২ জুলাই ১৮৮৭]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য ।০ আনা

'দাদামহাশয়' ষষ্ঠিচরণ ও 'নাতি' নবীনকিশোরের পত্রবিনিময়চ্ছলে সামাজিক প্রসঙ্গ আলোচনা।

সাময়িক পত্রে প্রকাশ

১২৯২ সালে বালক পত্রে 'চিঠিপত্র' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়—

[১] চিরঞ্জীবেষু। জ্যৈষ্ঠ

[২] শ্রীচরণেষু। আষাঢ়

[৩] চিরঞ্জীবেষু। শ্রাবণ

[৪] শ্রীচরণেষু। ভাদ্র

[৫] চিরঞ্জীবেষু। আশ্বিন [ও কার্তিক]

[৬] শ্রীচরণেষু। পৌষ[১]

১ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় যে কিস্তি 'শ্রীচরণেষু' প্রকাশিত হয় তাহা রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে। নবীনকিশোর শর্মার নামেও তাহা প্রকাশিত হয় নাই। পৌষ কিস্তির পত্রের সূচনা এইরূপ—"দাদা মহাশয় এবার কিছুদিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি।…" বার্ষিক সূচী হইতে জানা যায়, অগ্রহায়ণ সংখ্যার কিস্তি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত, নন্দকিশোর শর্মার নামে প্রকাশিত; ইহার সূচনা এইরূপ—"দাদা মহাশয়, নবীন ভায়া পুজার ছুটিতে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন।… নবীনের অনুপস্থিতিতে তোমার চিঠি আমার হাতে আসিয়া পড়ে…" এই কিস্তি স্বভাবতই 'চিঠিপত্র'-গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ এই শরৎকালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে সোলাপুরে ছিলেন—পৌষ কিস্তির রচনায় তাহার ইঙ্গিতও আছে।

[৭] চিরঞ্জীবেষু। মাঘ
[৮] শ্রীচরণেষু। চৈত্র
[৯] চিরঞ্জীবেষু। চৈত্র

পুনর্মুদ্রণ

পরে ইহা সমাজ [১৩১৫] গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে (বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৪৬) ইহা পুনরায় স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে গৃহীত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বালক পত্রে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরো রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমালোচনা। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা। / পিপেল্‌স্ প্রেসে / শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / সন ১২৯৪ সাল। / মূল্য ১৲ এক টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, উৎসর্গ পত্র, সূচী [।৶০], ১৬৭

প্রকাশ [২৬ মার্চ ১৮৮৮]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০

উৎসর্গ

পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর / কর-কমলে / স্নেহের সামান্য প্রতিদান স্বরূপ / এই গ্রন্থ / সাদরে সমর্পিত হইল।

সূচী[১]

অনাবশ্যক ॥ ভারতী। শ্রাবণ ১২৯০

তার্কিক ॥ ভারতী। আশ্বিন ১২৯০

সত্যের অংশ

বিজ্ঞতা ॥ ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯

মেঘনাদবধ কাব্য ॥ ভারতী। ভাদ্র ১২৮৯

নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি[২] ॥ ভারতী। ভাদ্র ১২৮৭

সঙ্গীত ও কবিতা ॥ ভারতী। মাঘ ১২৮৮

বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা ॥ ভারতী। বৈশাখ ১২৮৮

ডি প্রোফণ্ডিস ॥ ভারতী। আশ্বিন ১২৮৮

কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন ॥ ভারতী। শ্রাবণ ১২৮৮

চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি ॥ ভারতী। ফাল্গুন ১২৮৮

বসন্তরায় ॥ ভারতী। শ্রাবণ ১২৮৯

বাউলের গান ॥ ভারতী। বৈশাখ ১২৯০

সমস্যা ॥ ভারতী। ফাল্গুন ১২৯১

এক চোখো সংস্কার ॥ ভারতী। পৌষ ১২৮৮

একটি পুরাতন কথা ॥ ভারতী। অগ্রহায়ণ ১২৯১

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী", শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৬ হইতে এই সূচী গৃহীত।

২ 'বাঙ্গালি কবি নয়' নামে পরিবর্তনান্তে গ্রন্থে মুদ্রিত।

সংস্করণ / পুনর্মুদ্রণ

সমালোচনা রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর (১৩১১) অন্তর্গত হয়। তখন নূতন একটি প্রবন্ধ ইহাতে যোগ হয়, 'কাব্যের উপেক্ষিতা' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭); এই প্রবন্ধ পরে প্রাচীন সাহিত্যের [১৩১৪] অন্তর্ভুক্ত হয়।

সমালোচনা দীর্ঘকাল মুদ্রিত ছিল না ও উহার অন্তর্গত ডি প্রোফণ্ডিস প্রবন্ধ সংস্কারান্তে আধুনিক সাহিত্য [১৩১৪] গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। পরে রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৮) 'সমালোচনা'য় পুনর্মুদ্রিত হয়।

সমালোচনা গ্রন্থে সংকলিত কতকগুলি প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশের সময়ে বা পরবর্তীকালে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে, বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অপরের কোনো-কোনো প্রবন্ধ বিষয়ে বিতর্ক। ইহার বিবরণ অংশত গ্রথিত করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

১ মেঘনাদবধ কাব্য

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম 'তীব্র সমালোচনা' রবীন্দ্রনাথ করেন ভারতী-পত্রে ১২৮৪ সালে (শ্রাবণ হইতে কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন)।[১] দ্বিতীয় সমালোচনা প্রকাশ করেন ১২৮৯ ভাদ্র সংখ্যা ভারতীতে। এটিই সমালোচনা গ্রন্থে প্রকাশিত। ইহা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত হইলেও কম তীব্র নহে। প্রথম প্রবন্ধটিই অধিক আলোচিত, তবে দুইটি প্রবন্ধই মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে প্রতিকূল বলিয়া পরে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একত্র আলোচিত, এ ক্ষেত্রেও তাহাই করা হইল।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অবান্তর হইবে না যে, এটি ভারতী পত্রের যে-সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাহার পরের মাসের (আশ্বিন ১২৮৯) ভারতী পত্রেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের একটি আলোচনা প্রকাশ করেন—"বাঙ্গালা পদ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত করিয়া আমাদের সাহিত্য-রাজ্যে একটি শুভ বিপ্লব সংসাধন" এবং "শিথিল বঙ্গীয় পদ্যের সংশ্লিষ্টতা সাধন" করিবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে মধুসূদনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

১ এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ডের ১১২-১৪৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থভুক্ত। অপিচ শ্রীনীলরতন সেন -সম্পাদিত রবীন্দ্র-বীক্ষা [১৩৬৮] দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও মহাকাব্য হিসাবে মেঘনাদবধ কাব্যের গুণগান করেন নাই। বস্তুত তাঁহার রচনা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার পরিপূরক বলা যাইতে পারে; য়ুরোপীয় এপিকের লক্ষণ অনুসারে বিচার করিয়া তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের ত্রুটি বিচার করিয়াছেন, আর 'মহৎচরিত্র বিনাশ' করিবার যে অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন ভাষান্তরে সে অভিযোগও তিনি সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"যাহা কবির একমাত্র নিজের ধন নহে, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পত্তি, তাহা লইয়া এরূপ লণ্ডভণ্ড করিলে চলিবে কেন?··· যাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী— চির আরাধ্য দেবতা— সেই রাম লক্ষ্মণকে হীনবর্ণে চিত্রিত করা কি সহৃদয় জাতীয় কবির উচিত?" রচনাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধমঞ্জরী'তে (১৩১২) মুদ্রিত আছে।

এই প্রসঙ্গে সাময়িক পত্রের একটি বিতর্কের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রখ্যাত 'হেমচন্দ্র'-জীবনী প্রথমে মানসী ও মর্ম্মবাণী পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল; ১৩২৬ কার্তিক সংখ্যায় তিনি মেঘনাদবধ কাব্য ও বৃত্রসংহারের তুলনার উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় রচনা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করেন। অতঃপর কয়েক মাস মানসী ও মর্ম্মবাণীতে এ বিষয়ে বিতর্ক চলিতে থাকে। মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের বক্তব্য—

"আমি ষোড়শবর্ষ বয়স্ক রবীন্দ্রনাথকে অর্ব্বাচীন বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।··· ষোড়শ বর্ষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, অনেকে জীবনে তাহা দেখাইতে পারে না।··· ভারতীর প্রথম বর্ষে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি রচনা বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়ী আসন অধিকৃত করিয়াছে।··· অপ্রিয় সত্যকথনের জন্য লজ্জা এক বস্তু এবং মত পরিবর্তন আর এক বস্তু।··· আমি বিশ্বাস করি যে সেই সমালোচনায় যে যুক্তি তর্ক বা উদাহরণের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে অন্ততঃ কিছু সত্য নিহিত আছে।. যদি এই যুক্তি তর্ক অধ্যাপক [কৃষ্ণবিহারী] গুপ্ত মহাশয় অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।"—মানসী ও মর্ম্মবাণী, পৌষ, ১৩২৬

কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় প্রত্যুত্তরে "সাহিত্যসৃষ্টি" (১৩১৪) প্রবন্ধ[১] হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া, পরিণতবয়সে রবীন্দ্রনাথ যে মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন এই কথা সপ্রমাণ করিতে অগ্রণী হন। তিনি বিশেষভাবে দেখাইয়াছিলেন, "[রবীন্দ্রনাথের] প্রথম দুইটি প্রবন্ধে একটা

১ এই প্রবন্ধ হইতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি পরে দ্রষ্টব্য।

কথা খুব জোর করিয়া বলা হইয়াছে। তাহা এই—'কবি বলেন, I despise Ram and his rabble সেটা বড় যশের কথা নহে— তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন। দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতর প্রকৃতি-বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে?'[১] ইত্যাদি। আর, পরিণত বয়সের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বুঝাইতেছেন, কেন মেঘনাদবধের কবি রামলক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন, কেন তিনি বলিয়াছিলেন, I despise Ram and his rabble but the idea of রাবণ elevates and kindles my imagination. ···এক কথায়, রবীন্দ্রনাথ যে কারণে কৈশোরে মেঘনাদবধকে নামমাত্র মহাকাব্য বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই পরবর্ত্তীকালে উহাকে মহিমান্বিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।"—মানসী ও মর্ম্মবাণী, মাঘ ১৩২৬

মানসী ও মর্ম্মবাণীর এই সংখ্যাতেই (মাঘ ১৩২৬, পৃ. ৬১৫) শ্রীহট্ট হইতে শ্রীসুবোধ সান্যাল রবীন্দ্রনাথের একটি সদ্য লিখিত পত্র উদ্‌ধৃত করেন—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কোনো এক সময়ে আমি হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের সহিত মেঘনাদবধের তুলনা করিয়াছিলাম।[২] সেই প্রবন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম

১ "মেঘনাদবধ কাব্য", সমালোচনা

২ "···হেমবাবুর বৃত্র-সংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র-মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না।··· হীন, ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করা, অথবা পুত্র-শোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটুকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এতদূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্র-সংহারের সহিত তুলনা করিলেই

তাহাতে আমারই মূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছিল। যদি আমার সেই লেখা উদ্ধৃত করিয়া আজ কোনো লেখক আমাকে মাইকেলের প্রতিকূলে তাঁহার স্বদলে সাক্ষীস্বরূপ দাঁড় করান, তবে ইহা আমার কর্ম্মফল।

১লা মাঘ, ১৩২৬ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেঘনাদবধ কাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধটির বিষয়ে তিনি জীবনস্মৃতির (প্রকাশ ১৩১৯) ভারতী অধ্যায়ে যাহা লিখিয়াছেন এখানে তাহা উদ্‌ধৃত করা যাইতে পারে—

…আমার বয়স তখন ঠিক ষোল। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্ব্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্দ্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।

মধুসূদন ও মেঘনাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন ও মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে যে-সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহার কতকগুলি বর্তমান প্রসঙ্গে সংকলিত হইল—

রামায়ণকথার যে ধারা আমরা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহারই একটি অত্যন্ত আধুনিক শাখা মেঘনাদবধকাব্যের মধ্যে রহিয়াছে। এই কাব্য সেই পুরাতন কথা অবলম্বন করিয়াও বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস হইতে একটি বিপরীত প্রকৃতি ধরিয়াছে।

আমরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকি যে, ইংরেজি শিখিয়া যে সাহিত্য আমরা রচনা করিতেছি তাহা খাঁটি জিনিস নহে। অতএব এ সাহিত্য যেন দেশের সাহিত্য বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য নয়।

আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান, এবং অধর্ম্মের ফলে বৃত্রের সর্ব্বনাশ— যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়।”

—মেঘনাদবধ কাব্য, সমালোচনা গ্রন্থ

যে জিনিসটা একটা-কোনো স্থায়ী বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার আর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদি খাঁটি জিনিস বলা হয়, তবে সজীব প্রকৃতির মধ্যে সে জিনিসটা কোথাও নাই।...

য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে এ কথা যখন সত্য, তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না-কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনোমতেই হইতে পারে না; যদি হয় তবে এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।

মেঘনাদবধ কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে, একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারি দিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারি দিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে

তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘনঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে— এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালের রামায়ণ-কথার একটি নূতন-বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, এ কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্বলের অভিমানবশত ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি— তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।

—'সাহিত্যসৃষ্টি', বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৪। সাহিত্য গ্রন্থে সংকলিত।

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।

আমরা দেখলুম কী। কোনো একটা নূতন বিষয়? তা নয়, একটা নূতন রূপ। সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ; সেই ভাবটি যে বিশেষ রূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য। বিষয়ে কোনো অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে-একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা। পানপাত্র তৈরির বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা উপাদানরূপে নেওয়া হয়েছে, পণ্যের দিক থেকে বিচার করলে তার দামের ইতরবিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় আমরা তার রূপটাই দেখি। রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার

রূপটাই চরম। সেইটেই আমাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করে, সাধনার নূতন পথ খুলে দেয়। বলা বাহুল্য, মধুসূদন দত্তের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্যে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল। যাতে সেই লক্ষ্যের দিকে আপন কলমকে নিয়ে যেতে পারেন এমন একটা ছন্দের প্রশস্ত রাজপথ মাইকেল তৈরি করে তুললেন। রূপটিকে মনের মতো গাম্ভীর্য দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন। তাঁর বর্ণনীয় বিষয় যে রূপের সম্পদ পেল সেইটেতেই সে ধন্য হল। মিল্‌টন ইংরেজি ভাষায় লাটিন ধাতুমূলক শব্দ বহু পরিমাণে ব্যবহার করার দ্বারায় তার ধ্বনিরূপের যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন, মাইকেলেরও তদনুরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল। যদি বিষয়ের গাম্ভীর্যই যথেষ্ট হত তা হলে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এ কথা সত্য, বাংলাসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ, মাইকেল বাংলা ভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটিমাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাংলা ভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি। তাই তিনি যে ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তাঁর লেখা সন্ততিহীন হল, উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না। তাঁর পরে হেম বাঁড়ুজ্জে বৃত্রসংহার, নবীন সেন রৈবতক লিখলেন। এ দুটিও মহাকাব্য, কিন্তু তাঁদের কাব্যের রূপ হল স্বতন্ত্র। তাঁদের মহাকাব্যও রূপের বিশিষ্টতার দ্বারা উপযুক্তভাবে মূর্তিমান হয়েছে কি না, এবং তাঁদের সেই রূপের ছাঁদ ভাষায় চিরকালের মতো রয়ে গেল কি না, সে তর্ক এখানে করতে চাই নে— কিন্তু রূপের সম্পূর্ণতা বিচারেই তাঁদেরও কাব্যের বিচার চলবে। তাঁরা চিন্তাক্ষেত্রে অর্থনীতি ধর্মনীতি বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন্‌ কোঠা খুলে দিয়েছেন সেটা কাব্যসাহিত্যের মুখ্য বিচার্য নয়। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।

মাইকেল তাঁর নবসৃষ্টির রূপটিকে সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠা দেন নি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকদের উৎসাহ দিলেন। তিনি বললেন, প্রতিভা আপন সৃষ্ট নব নব রূপের পথে সাহিত্যকে নব নব ধারায় প্রবাহিত করে দেয়।

—'সাহিত্যরূপ', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৫। সাহিত্যের পথে গ্রন্থে সংকলিত

…এই যেমন গদ্যে, পদ্যে তেমনি অসম সাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন।

পাশ্চাত্য হোমর-মিলটন-রচিত মহাকাব্যসঞ্চারী মন ছিল তাঁর। তার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই তার ভোগমাত্রেই স্তব্ধ থাকতে পারেন নি। আষাঢ়ের আকাশে সজল নীল মেঘপুঞ্জ থেকে গর্জন নামল, গিরিগুহা থেকে তার অনুকরণে প্রতিধ্বনি উঠল মাত্র; কিন্তু আনন্দচঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা তুলে সাড়া দিলে আপন কেকাধ্বনিতেই। মধুসূদন সংগীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার জন্যে আপন ভাষাকেই বক্ষে টেনে নিলেন। যে যন্ত্র ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না, তাতেই তিনি গম্ভীর সুরের নানা তার চড়িয়ে তাকে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এ যন্ত্র একেবারে নতুন, একমাত্র তাঁরই আপন-গড়া। কিন্তু, তাঁর এই সাহস তো ব্যর্থ হল না। অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘরমন্দ্রিত রথে চড়ে বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হল আধুনিক কাব্য 'রাজবদুন্নতধ্বনি'— কিন্তু তাকে সমাদরে আহ্বান করে নিতে বাংলাদেশে অধিক সময় তো লাগে নি। অথচ এর অনতিপূর্বকালবর্তী সাহিত্যের যে নমুনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এর কি সুদূর তুলনাও চলে।···

নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্‌বোধিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলা ভাষার পায়ে-চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করলে না। আপন শক্তির 'পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলা ভাষার 'পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন; বাংলা ভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলবার জন্যে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে মধুসূদন নিঃসংকোচে যে-সব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন সেও নূতন, বাংলা পয়ারের সনাতন সমদ্বিভক্ত আল ভেঙে দিয়ে তার উপর অমিত্রাক্ষরের যে বন্যা বইয়ে দিলেন সেও নূতন, আর মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য-রচনায় যে রীতি অবলম্বন করলেন তাও বাংলা ভাষায় নূতন। এটা ক্রমে ক্রমে, পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে, সাবধানে ঘটল না; যান্ত্রিক প্রথায়, মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন এক মুহূর্তে ঝড়ের পিঠে— প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙে।

—'বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ', বিচিত্রা, মাঘ, ১৩৪১।

সাহিত্যের পথে গ্রন্থে সংকলিত

…আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষায় প্রথম যুগে যাঁরা বিদ্বান ব'লে গণ্য ছিলেন তাঁরা যদিচ পড়াশুনোয় চিঠিপত্রে কথাবার্তায় একান্তভাবেই ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যদিচ তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্য ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উদ্‌ভাবিত, তবু সেদিনকার বাঙালি লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেছিলেন যে দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতিল আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়। পরভাষার মদগর্বে আত্মবিস্মৃতির দিনে এই সহজ কথায় নূতন আবিষ্কৃতির দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি আমাদের নব সাহিত্য স্থষ্টির উপক্রমেই। ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অনুরাগ ছিল সুগভীর। সেইসঙ্গে গ্রীক লাটিন আয়ত্ত ক'রে য়ুরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃতরসভোগে। স্বভাবতই প্রথমে তাঁর মন গিয়েছিল ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করতে। কিন্তু, এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি যে ধার-করা ভাষায় সুদ দিতে হয় অত্যধিক, তার উদ্‌বৃত্ত থাকে অতি সামান্য। তিনি প্রথমেই মাতৃভাষায় এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন যে-কাব্যে স্খলিতগতি প্রথমপদচারণার ভীরু সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসি বাঙালি কল্পনার সাহায্যে মিলটন-হোমর-প্রতিভার অতিথিসৎকার। এই আতিথ্যে অগৌরব নেই, এতে নিজের ঐশ্বর্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হতে থাকে।

এই যেমন কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন তেমনি আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের পথমুক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র।…

—'ছাত্রসম্ভাষণ', ১৩৪৩। শিক্ষা গ্রন্থে সংকলিত

মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে যে বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন —শব্দের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য এবং পাঠকের সমগ্র মনোযোগ বদ্ধ করিবার চেষ্টাই তাহার কারণ বোধ হয়। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' দুর্বোধ হইতে পারে, কিন্তু 'সাগরের তট যথা তরঙ্গের ঘায়' দুর্বল; 'উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে' ইহার পরিবর্তে 'উড়িল যতেক তীর আকাশ ছাইয়া' ব্যবহার করিলে ছন্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয়।

—'বাংলা শব্দ ও ছন্দ', সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯।
ছন্দ (কার্তিক ১৩৬৯) গ্রন্থে সংকলিত

বাংলা যে ছন্দে যুক্ত-অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত-অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত-অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।

—'বিহারীলালের ছন্দ', সাধনা, আষাঢ় ১৩০১।
ছন্দ (কার্তিক ১৩৬৯) গ্রন্থে সংকলিত

পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় 'মেঘনাদবধ' কাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে দেখা যাক। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোটো বড়ো নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীর-মর্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল— 'সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু'; তার পরে তার অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল— 'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে'; তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে— 'কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি'; তার পরে আসল কথাটা, যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘ-গর্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হল— 'কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি'।

—'ছন্দের অর্থ', সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২৪।
ছন্দ (কার্তিক ১৩৬৯) গ্রন্থে সংকলিত

ইংরেজি ভাষার একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দেরই একটা বিশেষ জোর আছে; সেটা ও-ভাষার accent-এর জন্যেই হয়। প্রত্যেকটি শব্দই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে, অন্য কথার মধ্যে নিজেকে

হারিয়ে ফেলে না। শব্দগুলিকে এভাবে জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করতে হয় বলেই ইংরেজি ছন্দ এরূপ তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলা শব্দগুলি বড়ো শান্তশিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত করে তরঙ্গিত করে তোলে না। এজন্য বাংলায় আমরা এক ঝোঁকে অনেকগুলো শব্দ উচ্চারণ করে আবৃত্তি করে যাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হয় না। অর্থবোধের জন্যে বিষয়টাকে আবার ফিরে পড়তে হয়। এ অভাবটা মধুসূদন খুব অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি বেছে বেছে যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বাংলার এই দুর্বলতাটা দূর করতে চেয়েছিলেন। এ জন্যেই তাঁর কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আর তাতে ছন্দের মধ্যেও অনেকখানি তরঙ্গায়িত ভঙ্গি দেখা দিয়েছে। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে ধ্বনিটা আঘাতে আঘাতে কেমন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে তা দেখতে পাচ্ছ। অল্পবয়সে আমি মধুসূদনের যে কঠোর সমালোচনা করেছিলুম পরবর্তী কালে আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। বাংলাভাষার এই সমতলতা এই দুর্বলতাটা দূর করবার জন্যে গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছি।···

—'ভাষণ', বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯।
ছন্দ (কার্তিক ১৩৬৯) গ্রন্থে সংকলিত

সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক শব্দেই দীর্ঘহ্রস্বধ্বনির অসাম্য, ইংরেজি ভাষায় ধ্বনির অসমানতা তার এক্‌সেন্‌ট্‌বিদ্ধ শব্দে। মসৃণপথে তারা গড়গড় করে গড়িয়ে যায় না, ধাক্কা দিতে দিতে মনের মধ্যে দাগ রেখে রেখে চলে। বাংলা-ভাষায় রেলপাতা পথে ঠেলাগাড়ির মতো শব্দগুলোকে এক ঝোঁকে আট-দশ মাত্রা অনায়াসে পিছলিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে, মনের মধ্যে তারা জোরে দাগ কাটে না; যথেষ্ট সময় পায় না নিজেকে বিশেষ করে জানান দেবার। এই ত্রুটি লাঘব করবার জন্যে মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি পদে পদে ঝংকৃত করে পয়ারের একটানা চালের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। সাধারণ পয়ারে এই শক্তির সম্ভাবনা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছয় সে তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর অনবধানতা মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভেই প্রকাশ পেয়েছে।

সম্মুখ-সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি,

কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি।

এতগুলি পঙ্‌ক্তির আরম্ভে ও শেষে দুটি মাত্র যুক্তবর্ণের ধাক্কা। এর সঙ্গে 'প্যারাডাইস্ লস্ট্'-এর সূচনা মিলিয়ে দেখলে প্রভেদ স্পষ্ট হবে।

—'ছন্দের প্রকৃতি', উদয়ন, বৈশাখ ১৩৪১।
ছন্দ (কার্তিক ১৩৬৯) গ্রন্থে সংকলিত

এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।…

…প্রাকৃত-বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আরম্ভ করা যেত—

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে এ কথা মানব না।[১]

—'ছন্দের প্রকৃতি', উদয়ন, বৈশাখ ১৩৪১।
ছন্দ (কার্তিক ১৩৬৯) গ্রন্থে সংকলিত

একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাঙ্‌ক্তেয় বলে গণ্য ছিল। সেই সময়ে আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে।

---

১ তুলনীয়: স্বীকার করি আমাদের সাহস নেই মেঘনাদবধের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে লিখি—

সম্মুখ লড়াইয়ে পড়ে বীরের সেরা বীর
বীরবাহু চলে যখন গেলেন যমের বাড়ি।

এরকম ভাষায় কোনো দোষ নেই, কিন্তু যথাস্থানে সাধুভাষার ঠাটের মধ্যে এটা চালানো যায় না। —বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৮, 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধের বর্জিত অংশ, ছন্দ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (কার্তিক ১৩৬৯) উদ্‌ধৃত, পৃ. ৩৮৫

তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য।

এমন সময়ে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমান ভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ, এর ভঙ্গি পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।

সংস্কারের অনিত্যতার আর একটা প্রমাণ দিই। এক সময়ে কুলবধূর সংজ্ঞা ছিল, সে অন্তঃপুরচারিণী।…

ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে আসছে। কুলস্ত্রীরা আজ অসংশয়িতভাবে কুলস্ত্রীই আছেন, যদিও অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে তাঁরা মুক্ত।

তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী বলে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দ বহুদূরে লঙ্ঘন করে গেছে।

কাজটা সহজ হয়েছিল, কেননা তখনকার ইংরেজি-শেখা পাঠকেরা মিল্‌টন-শেক্‌স্‌পীয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

—'কাব্য ও ছন্দ', কবিতা, পৌষ ১৩৪৩।

সাহিত্যের স্বরূপ। ছন্দ

ছন্দ-আলোচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্র-রচনায় মাইকেলের কবিতার উদ্ধৃতি[১]

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়॥ আত্মবিলাপ

বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ। ভারতী। শ্রাবণ ১২৯০

উড়িল কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে॥ মেঘনাদবধ ১।১৬১ পঙ্‌ক্তি

বাংলা শব্দ ও ছন্দ। সাধনা। শ্রাবণ ১২৯৯

যাদঃপতিরোধঃ যথা॥ মেঘনাদবধ ১।৫৩৩ পঙ্‌ক্তি

বাংলা শব্দ ও ছন্দ। সাধনা। শ্রাবণ ১২৯৯

ভাষণ। বিচিত্রা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯

১ এই তালিকা রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের শ্রীপ্র[illegible]চন্দ্র সেন-সম্পাদিত পরিবর্ধিত সংস্করণ (কার্তিক ১৩৬৯) হইতে গৃহীত। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধগুলিও ওই সংস্করণে সংকলিত হইয়াছে। ওই গ্রন্থেরই সাহায্যে, এই তালিকার অব্যবহিত পূর্বে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথ-কৃত মাইকেলের ছন্দ-সংক্রান্ত আলোচনাগুলি সংকলন করা হইয়াছে।

সতত, হে নদ, তুমি ॥ চতুর্দশপদী, কপোতাক্ষ নদ

চলতিভাষার ছন্দ। বাংলাভাষা-পরিচয়। কার্তিক ১৩৪৫

সম্মুখসমরে পড়ি ॥ মেঘনাদবধ ১।১ পঙ্‌ক্তি

বাংলা ছন্দ। সবুজ পত্র। শ্রাবণ ১৩২১

ছন্দের অর্থ। সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩২৪

ছন্দের প্রকৃতি। উদয়ন। বৈশাখ ১৩৪১

চিঠিপত্র। শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত। ৬ জুলাই ১৯৩৬

২ নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি

এই প্রবন্ধটি, স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত দুইটি প্রবন্ধের আলোচনা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রথমাংশ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখিত নীরব কবি প্রবন্ধের বক্তব্য লইয়া লিখিত এইরূপ বোধ হয়— বান্ধব পত্রের মাঘ ১২৮১ সংখ্যায় কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রবন্ধটি প্রথমে প্রকাশিত হয়, পরে তাঁহার প্রভাতচিন্তা (১২৮৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির একটি অংশ নিম্নে পুনর্মুদ্রিত হইল—

যাঁহারা শ্রুতিসুখাবহ ছন্দোবন্ধে শব্দের সঙ্গে শব্দ গ্রথিত করিয়া কথার ছটায় সকলকে মোহিত করিতে চেষ্টা করেন, অশিক্ষিত ইতর লোকেরা তাঁহাদিগকেই কবি বলিয়া আদর করে। ঈদৃশ কবি ও কাব্যের পরীক্ষাস্থান কর্ণ।...কোন একটা নাম দিতে হইলে, ইঁহাদিগকে শাব্দিক কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। কারণ, শব্দবিন্যাসের চাতুর্য্য বিনা ইঁহাদিগের কবিতায় আর কিছুই থাকে না।...

সহৃদয় রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কাব্যের অন্বেষণ করিতে হইলে আর একটু উর্দ্ধে আরোহণ করেন। তাঁহারা ছন্দোবদ্ধ বাক্য শুনিয়াই গলিয়া পড়েন না, অথবা কতকগুলি সুললিত শব্দ পাইয়াই মোহিত হন না। যে কথাটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ উৎপাদন করিল, তাহা হৃদয়স্থান পর্য্যন্তও গমন করে কিনা, ইহাই তাঁহারা অগ্রে বিচার করেন। যে কথায় অন্তরের অন্তর-নিহিত কোন লুক্কায়িত রস উছলিয়া না উঠে, সৌন্দর্য্যের কোন নূতন মূর্ত্তি মানসনেত্রের সন্নিধানে উপস্থিত না হয়, হৃদয়-তন্ত্রী নূতন এক তানে বাজিতে না থাকে, কিংবা ভাবভরে আত্মা দুলিয়া না পড়ে, তাঁহাদিগের নিকট তাহা কাব্য বলিয়াই গৃহীত হয় না।

কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেচনায় কবিতার আর এক গ্রাম আছে। তাহা অতীব উচ্চ এবং দুর্নিরীক্ষ্য। যাহা লিখিত হইল তাহাই কাব্য এবং যিনি লিখিলেন তিনিই কবি, এমন কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে লিখিত চিত্রে কাব্যের আভা মাত্র পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কাব্য এক অনির্ব্বচনীয় অমৃত। মনুষ্যের অপূর্ণ এবং অপবিত্র ভাষা উহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। যথার্থ কবি, হিমাচলের গাম্ভীর্য্যের ন্যায়, আকাশের অনন্ত বিস্তারের ন্যায়, এবং যোগরত তাপসের ধ্যানের ন্যায় নিস্তব্ধ ও নীরব। তিনি হৃদয়েই সেই স্বর্গীয় সুধাসিন্ধুর কণিকা মাত্র পান করিয়া কৃতার্থ হন; লৌকিক বাক্য এবং লোকব্যবহৃত বর্ণমালায় কিছুই ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারেন না। লোকে স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ দৌড়িতে চায়, কিন্তু কোনমতেই দৌড়িতে পারে না; কথা কহিবার জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু কোন কথাই অধরে ফোটে না; তিনিও তথাবিধ দশা প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভিত ভাবেই অবস্থিত থাকেন। প্রকাশের জন্য যত কিছু চেষ্টা সমস্তই বিফল হয়, প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়া যায়।···

···লঘু কবির যত কিছু সম্পদ, তাহা শব্দেই পর্য্যবসিত হয়। তদপেক্ষা গাঢ়তর কবির শব্দ অল্প, রসগাম্ভীর্য্যই অধিক। কিন্তু যখন কাহারও হৃদয়ে কাব্যের এই অমৃতস্রোত অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়; যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীন হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতির জলদক্ষর লেখা পাঠ করে, এবং গিরিশৃঙ্গ, সাগর গর্ভ, আলোক ও অন্ধকার সর্ব্বত্র এক সঙ্গে বিচরণ করে; যখন জ্ঞান অনুভূতিতে ডুবিয়া যায় এবং বুদ্ধি অনুসন্ধানে বিরত হইয়া, তরঙ্গের সহিত তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়ে বিলীন হয়; তখন ভয়বিহ্বলা ভাষা আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায়। কে আর কাহার কথা প্রকাশ করে? প্রকৃতি নীরব, কাব্য নীরব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীরব। ভাবলহরী নীরবে উত্থিত হয়, নীরবে লীলা করে, এবং নীরবেই বিলয় পায়।···

যাঁহারা বিধাতার প্রসাদে এইরূপ কবি-প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন, এবং লোকাতীত কবিত্বের পূর্ণ আবির্ভাবে সময়ে সময়ে এইরূপ অভিভূত হন, আমরা তাঁহাদিগকে চিনি আর না চিনি, তাঁহারাই সাধক, তাঁহারাই সিদ্ধ, তাঁহারাই মানবজাতির প্রাণ।···

রবীন্দ্রনাথকৃত আলোচ্য প্রবন্ধের শেষাংশ ("অনেকে বলেন, সমস্ত মনুষ্যজাতি সাধারণতঃ কবি, ও বালকেরা অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি"···),

১২৮২ পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বাঙ্গালি কবি কেন' প্রবন্ধ[১] স্মরণে লিখিত, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক কোনো কোনো অংশ উদ্‌ধৃত হইল।—

কবিত্বের প্রধান উপকরণ, অনুভাবকতা এবং কল্পনা। অনুভাবকতা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে কেহ কোন ভাবের বেগ ভাবের তরঙ্গ হৃদয়মধ্যে অনুভব করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ ভালবাসিয়াছেন অথবা ঘৃণা করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ এক দিন দুঃখ ভাবিয়া মনে ২ বলিয়াছেন 'আজিকার রজনী যেন আর পোহায় না', যে কেহ সুখ ভাবিয়া একদিন মনে মনে বলিয়াছেন, 'সূর্য্যদেব তোমার পায়ে পড়ি, একটু শীঘ্র ২ পাটে গিয়ে বসো বাপু', তিনিই কবি।··· বাঙ্গালির হৃদয় কোমল, বাঙ্গালিহৃদয় তরল, এইজন্য বাঙ্গালি কবি। আবার অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য। বাঙ্গালি অশিক্ষিত, অপরিমার্জ্জিত-বুদ্ধি, কুসংস্কারান্ধ, সুতরাং বাঙ্গালির কল্পনাও প্রবল, সুতরাং বাঙ্গালি কবি।···

কবির চক্ষে কিছুই নির্জীব নহে। পৌরাণিক অবস্থায় (Mythological stage or volitional stage,) মিল বলেন লোকে প্রাকৃতিক কার্য্যমাত্রকেই ইচ্ছাবিশিষ্ট জীবের কার্য্য বলিয়া বোধ করে। এইজন্য সে সময় সকলেই কবি। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি সকলকেই তাঁহারা সজীব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।··· এই কারণে বালক মাত্রেই কবি, কেননা বালক সকলকেই সজীব বলিয়া মনে করে। আমাদের ধর্ম্ম আমাদিগকে বালক করিয়া রাখিয়াছে।···

'নীরব কবি' প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রের ৩০ আষাঢ় ১৩০০ তারিখের পত্রের

---

১ রবীন্দ্রনাথের "বাঙ্গালি কবি নয়" (পরে পরিবর্তিত আকারে "নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি") প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রথম খণ্ডে (১৩৬৭ সংস্করণ, পৃ ১৩২-৩৪) যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে বঙ্গদর্শনের আলোচ্য প্রবন্ধটির সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের যোগের কথা জানিতে পারি। তিনি ইহাও মন্তব্য করিয়াছেন, "আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সেই প্রবন্ধটির সমগ্র অর্থ গ্রহণ না করিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সমগ্র রচনা হইতে কয়েকটি বাক্য পৃথক করিয়া লইলে সমালোচনার খোরাক মিলিতে পারে।" এই অংশগুলি তিনি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন।

নিম্নমুদ্রিত অংশ তুলনীয়—

নীরব কবি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সরব এবং নীরবের মধ্যে অনুভূতির পরিমাণ সমান থাকতে পারে কিন্তু আসল কবিত্ব জিনিষটি স্বতন্ত্র। কেবল ভাষার ক্ষমতা বলে নয়, গঠন করবার শক্তি। একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্যবলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই সৃজনক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা ভাব এবং অনুভাব তার সরঞ্জাম মাত্র। কারও বা ভাষা আছে, কারও বা অনুভাব আছে, কারও বা ভাষা এবং অনুভাব দু'ই আছে, কিন্তু আর একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভাব এবং সৃজনীশক্তি আছে— এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্ত তিনটি লোক নীরবও হতে পারেন সরবও হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কবি নন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাবুক বললেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়। তাঁরাও জগতে অত্যন্ত দুর্লভ এবং কবির তৃষিত চিত্ত সর্বদাই তাঁদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।

'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১০। সাহিত্য গ্রন্থ) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব। মনের তলার মধ্যে কী আছে বা না আছে তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কথায় বলে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ; ভাণ্ডারে কী জমা আছে তাহা আন্দাজে হিসাব করিয়া বাহিরের লোকের কোনো সুখ নাই, তাহাদের পক্ষে মিষ্টান্নটা হাতে হাতে পাওয়া আবশ্যক।

সাহিত্যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসও সেই রকমের একটা কথা। রচনা রচয়িতার নিজের জন্য নহে ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে, এবং সেইটে ধরিয়া লইয়াই বিচার করিতে হইবে।

৩ 'একটি পুরাতন কথা' : লক্ষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ

'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিল, প্রচার পত্রে (প্রথম বর্ষ ১২৯১)

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম বিষয়ে একটি প্রবন্ধের[১] অন্যতম অংশ। সেই অংশটি নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল—

সম্প্রতি সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা দেখা যাইতেছে। অনেকেই মনে করেন যে, আমরা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমান্ হইতেছি।…যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এইরূপ অনুরাগযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমাদিগের গোটাকত কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম জিজ্ঞাস্য, হিন্দুধর্ম্ম কি? হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই।…

…আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া কি শীত, কি বর্ষা, প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন এবং তখনই পূজাহ্নিকে বসিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনন্যমনে তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। পূজাহ্নিকের কিছুমাত্র বিঘ্ন হইলে, মাথায় বজ্রাঘাত হইল, মনে করেন। তারপর অপরাহ্ণে নিরামিষ শাকান্ন ভোজন করিয়া একাহারে থাকেন,— ভোজনান্তে, জমিদারী কার্য্যে বসেন। তখন কোন্ প্রজার সর্ব্বনাশ করিবেন, কোন্ অনাথা বিধবার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল করিয়া কাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্ মোকদ্দমার কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতেই তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, এবং যত্ন পর্য্যাপ্ত হয়। আমরা জানি যে, এ ব্যক্তির পূজা আহ্নিকে, ক্রিয়া কর্ম্মে, দেবতা ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতে করিতেও হরিনাম করিয়া থাকেন! মনে করেন, এ সময় হরি-স্মরণ করিলে এ জাল করা আমার অবশ্য সার্থক হইবে। এ ব্যক্তি কি হিন্দু?

আর একটি হিন্দুর কথা বলি। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থ্যকর, তাহা ভিন্ন সকলই খান। এবং ব্রাহ্মণ হইয়া এক আধটু সুরাপান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। যে-কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। যবন ও ম্লেচ্ছের

১ "১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৯এ শ্রাবণ…শ্রীসজনীকান্ত দাস সর্ব্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের এই লেখাটির অস্তিত্বের কথা বিজ্ঞাপিত করেন"— অতঃপর ইহা ১৩৪৮ সালের পৌষমাসে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস -সম্পাদিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ গ্রন্থাবলীর বিবিধ খণ্ডে গ্রন্থভুক্ত হয়। ওই গ্রন্থ হইতে এই রচনাংশ উদ্‌ধৃত হইয়াছে। দুইটি বাক্যে বর্তমান সংকলয়িতা কর্তৃক মোটা অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে।

সঙ্গে একত্র ভোজনে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়া কর্ম্ম কিছুই করেন না। **কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক যেখানে লোক-হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।** নিষ্কাম হইয়া দান ও পরহিত সাধন করিয়া থাকেন। যথাসাধ্য ইন্দ্রিয় সংযম করেন এবং অন্তরে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন। কাহাকে বঞ্চনা করেন না, কখন পরস্ব কামনা করেন না। ইন্দ্রাদি দেবতা আকাশাদি ঈশ্বরের মূর্ত্তিস্বরূপ এবং শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, সে সকলের মানসিক উপাসনা করেন। এবং পুরাণ-কথিত শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করেন। হিন্দুধর্ম্মানুসারে গুরুজনে ভক্তি, পুত্র কলত্রাদির সস্নেহ প্রতিপালন, পশুর প্রতি দয়া করিয়া থকেন। তিনি অক্রোধ ও ক্ষমাশীল। এ ব্যক্তি কি হিন্দু? এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যদি না হয়—তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দুধর্ম্ম কি? এক ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম্ম, না ধর্ম্মই ধর্ম্ম? যদি আচার ধর্ম্ম না হয়, ধর্ম্মই ধর্ম্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়। তাহাতে আপত্তি কি?…

'একটি পুরাতন কথা'

এই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধ সভায় পাঠ করেন ও ভারতী পত্রের অগ্রহায়ণ ১২৯১ সংখ্যায় প্রকাশ করেন তাহাতে বলেন[১]—

"আর লোকহিত তুমিই বা কি জান, আমিই বা কি জানি!…সত্যের দ্বারাই লোকহিত হয়, কারণ লোক যেমন অগণ্য সত্য তেমনি অসীম।"—এই প্যারাগ্রাফের পরে—

এত কথা আমি কি অনাবশ্যক বলিতেছি? এই সকল পুরাতন কথার অবতারণা করা কি বাহুল্য হইতেছে? কি করিয়া বলিব! আমাদের দেশের

১ সমালোচনা-গ্রন্থে এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করিবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই সংকলনে ভারতী হইতে উদ্ধৃত অংশ, অর্থাৎ যে-অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ উল্লেখ আছে, তাহা বর্জন করেন।

প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে অসঙ্কোচে নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্ম্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না, যে, যে সমাজে প্রকাশ্য ভাবে কেহ ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্ম্মের মূল না-জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করিতেন! অথচ কাহারও তাহা অদ্ভুত বলিয়াও বোধ হইল না! আমরা দুর্ব্বল; ধর্ম্মের যে অসীম আদর্শ চরাচরে বিরাজ করিতেছে আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি না, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার কলঙ্ক লইয়া যদি সেই ধর্ম্মের গাত্রে আরোপ করি, তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইবে! যে সমাজের গণ্য ব্যক্তিরাও প্রকাশ্য রাজপথে ধর্ম্মের সেই আদর্শ-পটে নিজ দেহের পঙ্ক মুছিয়া যায়— সেখানে সেই আদর্শে না-জানি কত কলঙ্কের চিহ্নই পড়িয়াছে, তাই তাঁহাদিগকে কেহ নিবারণও করে না। তা' যদি হয় তবে সে সমাজের পরিত্রাণ কোথায়? তাহাকে আশ্রয় দিবে কে, সে দাঁড়াইবে কিসের উপরে! সে পথ খুঁজিয়া পাইবে কেমন করিয়া! তাহার অক্ষয় বলের ভাণ্ডার কোথায়! সে কি কেবলই কুতর্ক করিয়া চলিতে থাকিবে, সংশয়ের মধ্যে গিয়া পড়িবে, আকাশের ধ্রুবতারার দিকে না চাহিয়া নিজের ঘূর্ণ্যমান মস্তিষ্ককেই আপনার দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র বলিয়া স্থির করিয়া রাখিবে, এবং তাহারই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া লাঠিমের মত ঘুরিতে ঘুরিতে পথপার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিবে?

লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি "যদি মিথ্যা কহেন তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়— অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।" কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।

বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু, ঈশ্বরের লোকহিত সীমাবদ্ধ নহে,— তাঁহার অখণ্ড নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। অসীম দেশ ও অসীম কালে তাঁহার হিত ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে— সুতরাং একটুখানি বর্ত্তমান সুবিধার উদ্দেশ্যে খানিকটা মিথ্যার দ্বারা তালি-দেওয়া লোকহিত তাঁহার কার্য্য হইতেই পারে না। তাঁহার অনন্ত ইচ্ছার নিয়ে পড়িলে ক্ষণিক ভাল মন্দ চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার অগ্নিতে সৎলোকও দগ্ধ হয় অসৎলোকও দগ্ধ হয়। তাঁহার সূর্য্যকিরণ স্থানবিশেষের সাময়িক আবশ্যক অনাবশ্যক বিচার না করিয়াও সর্ব্বত্র উত্তাপ দান করে। তেমনি তাঁহার অনন্ত সত্য ক্ষণিক ভালমন্দের অপেক্ষা না রাখিয়া অসীমকাল সমভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই সত্যকে লঙ্ঘন করিলে অবস্থা নির্ব্বিচারে তাহার নির্দ্দিষ্ট ফল ফলিতে থাকিবেই। আমরা তাহার সমস্ত ফল দেখিতে পাই না, জানিতে পারি না। এইজন্যই আরও অধিক সাবধান হও। ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরামর্শে ইহাকে লইয়া খেলা করিও না।

অসত্যের উপাসক কি বিস্তর নাই? আত্মহিতের জন্যই হউক আর লোক-হিতের জন্যই হউক অসত্য বলিতে আমাদের দেশের লোক কি এতই সঙ্কুচিত যে অসত্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বার অবতরণের গুরুতর আবশ্যক হইয়াছে? কঠোর সত্যাচরণ করিয়া আমাদের এই বঙ্গসমাজের কি এতই অহিত হইতেছে যে অসাধারণ প্রতিভা আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে সেই সত্যের মূল শিথিল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু হায়, অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।

সর্ব্বশেষে—

…অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কাপুরুষতার আশ্রয়স্থল এই হীন মিথ্যাকে সবলে সমূলে উৎপাটন না করিয়া যদি তাহার বীজ গোপনে বপন করেন তবে সমাজের ঘোরতর অমঙ্গলের আশঙ্কায় হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। যিনিই যাহা বলুন, পরম সত্যবাদী বলিয়া আমাদিগকে উপহাসই করুন, sentimental বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞাই করুন বা শ্রীকৃষ্ণের দোহাই দিন, এ মিথ্যাকে আমরা কখনই ঘরে থাকিতে দিব না, ইহাকে আমরা বিসর্জ্জন দিয়া আসিব। সুবিধাই হউক্ লাভই হউক্, আত্মহিতই হউক লোকহিতই

হউক্ মিথ্যা বলিব না, মিথ্যাচরণ করিব না, সত্যের ভাণ করিব না, আত্ম-প্রবঞ্চনা করিব না— সত্যকে আশ্রয় করিয়া মহত্ত্বে উন্নত হইয়া সরলভাবে দাঁড়াইয়া ঝড় সহ্য করিব সেও ভাল, তবু মিথ্যায় সঙ্কুচিত হইয়া সুবিধার গর্ত্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাপদ সুখ অনুভব করিবার অভিলাষে আত্মার কবর রচনা করিব না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর

এই প্রবন্ধের উত্তরে প্রচার পত্রের ১২৯১ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন[১]

আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও "নব হিন্দু সম্প্রদায়"

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি একটি বক্তৃতা করেন। তাহা অগ্রহায়ণের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবটির শিরোনাম "একটি পুরাতন কথা"। বক্তৃতাটি শুনি নাই, মুদ্রিত প্রবন্ধ দেখিয়াছি। নিম্নস্বাক্ষরকারী লেখক তাহার লক্ষ্য।

ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। রবীন্দ্র বাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই, তাহার পূর্ব্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে), তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে।

কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র বাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত সুলেখক, মহৎ-স্বভাব, এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্ত্তব্য।

তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি। রবীন্দ্র বাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। সম্পাদক

১ এই প্রবন্ধও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ গ্রন্থাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডে গ্রন্থভুক্ত হয়— তথা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল।

না হইলেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। বক্তৃতাটি পড়িয়া আমার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা মনে পড়িল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে। সেই জন্যই লিখিতেছি। কিন্তু নিবেদন জানাইবার পূর্ব্বে পাঠককে একটা রহস্য বুঝাইতে হইবে।

গত শ্রাবণ মাসে "নবজীবন" প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সূচনা লিখিয়াছিলেন। সূচনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রশংসা ছিল, বঙ্গদর্শনেরও প্রশংসা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গদর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল।

তার পর সঞ্জীবনীতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন-সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানে যে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রধান লেখক ঐ পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়াছি, তিনি নিজে ঐ পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি কেহ এই সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয় বাবু এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর একজন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করিলেন না। আমার প্রিয় বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন ; এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া "ইতর" শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।

তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামি পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল,—"র"। লোকে কাজেই বলিল, পত্রখানি রবীন্দ্র বাবুর লেখা। রবীন্দ্র বাবু ইতর শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পাল্‌টাইয়া বলিলেন।

নবজীবনের পনর দিন পরে প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দু ধর্ম্ম— যে হিন্দু ধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি— তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম্ম আদি ব্রাহ্ম সমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত

হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজ-ভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারি বার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্র বাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ। গড়পড়তায় মাসে একটি। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পরদা পরদা উঠিতেছে। তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক।

প্রথম। তত্ত্ববোধিনীতে "নব্যহিন্দু সম্প্রদায়" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর, এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন, তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্তবাদের পাত্র। বোধ হয়, বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিতীয়। তত্ত্ববোধিনীর ঐ সংখ্যায় "নূতন ধর্ম্মমত" ইতিশীর্ষক দ্বিতীয় এক প্রবন্ধে অন্য লেখকের দ্বারা প্রচার ও নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা— সমালোচিত নহে — তিরস্কৃত হয়। লেখকের নাম প্রবন্ধে ছিল না। লেখক কে, তাহা জানি না, কিন্তু লোকে বলে, উহা বিজ্ঞবর শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ বসুর লেখা। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি। উহাতে "নাস্তিক", "জঘন্য কোম্‌ত মতাবলম্বী" ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত হইয়াছিলাম। এই লেখক যিনিই হউন, বড় উদার-প্রকৃতি। তিনি উদারতা প্রযুক্ত ইংরেজেরা যাহাকে ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহির করা বলে, তাহাই করিয়া বসিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা"-প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন, "যে ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুধর্ম্মের সার ব্রাহ্মধর্ম্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে, সকলই সত্য। ব্রহ্মোপাসনা

যেমন চিত্তশুদ্ধিকর ও মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের উপাসনা নহে। ঐ ধর্ম্মের নীতি যেমন ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের নীতি নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোক মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয় ভাব ও সত্য, উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহা সমস্ত বঙ্গদেশের লোক গ্রহণ করিলে বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।" (তত্ত্ববোধিনী—ভাদ্র, ৯১ পৃষ্ঠা) ইহার পরে আবার নূতন হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারের উদ্যম, নবজীবন ও প্রচারের ধৃষ্টতার পরিচয় বটে।

তৃতীয়। তৃতীয় আক্রমণ তত্ত্ববোধিনীতে নহে, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিচারেও নহে। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় "বাঙ্গালার কলঙ্ক" বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। নব্যভারতে বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে একজন লেখক উহার প্রতিবাদ করেন। তত্ত্ববোধিনীতে দেখিয়াছি যে, ইনি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সহকারী সম্পাদক। শুনিয়াছি, ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-মহাশয়দিগের একজন ভৃত্য— নাএব, কি কি, আমি ঠিক জানি না। যদি আমার ভুল হইয়া থাকে, ভরসা করি, ইনি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। ইনি সকল মাসিকপত্রে লিখিয়া থাকেন, এবং ইঁহার কোন কোন প্রবন্ধ পড়িয়াছি। আমার কথার দুই এক স্থানে কখন কখন প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়াছি। সে সকল স্থলে কখন অসৌজন্য বা অসভ্যতা দেখি নাই। কিন্তু এবারকার এই প্রবন্ধে ভাষাটা সহসা বড় নাএবি রকম হইয়া উঠিয়াছে। পাঠককে একটু উপহার দিতেছি।

"হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। আবিষ্কৃত শাসনপত্রগুলির মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর— কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন, বেবার, মেক্সমূলার, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিংবা মিওর, ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, হাণ্টার প্রভৃতির কুসুম-কাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীনভাবে গবেষণা কর। না পার, গুরুগিরি করিও না।"* নব্যভারত—ভাদ্র, পৃ. ২২৫।

* কৈলাসবাবুর প্রবন্ধেই প্রকাশ আছে যে, তিনি জানিয়াছেন যে, প্রবন্ধ আমার লিখিত এবং আমিই তাঁহার লক্ষ্য। ২২৫ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভের নোট এবং অন্যান্য স্থান পড়িয়া দেখায় ইহা যে আমার লেখা, তাহা অনেকেই জানে, এবং কোন কোন সম্বাদপত্রেও সে কথা প্রকাশিত হইয়াছিল।

এখন এই লেখকের কথা উত্থাপন করার আমার এমন উদ্দেশ্য নাই যে, কেহ বুঝেন, প্রভুদিগের আদেশানুসারে ভৃত্যের ভাষার এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করিলাম।

চতুর্থ আক্রমণ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে। গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়াবাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, গালিগালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত। এখানে বলিতে হইবে, প্রভুই মজবুত। তবে প্রভু, ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই; প্রার্থনা-মন্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ—"অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।" আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছোহাটার ভাষা এত দূর পৌঁছে না। পাঠক মনে করিবেন, রবীন্দ্র বাবু তরুণবয়স্ক বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তাহা নহে। সুর কেমন পরদা পরদা উঠিতেছে, তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে [সুর] লাগাইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না।

রবীন্দ্র বাবু বলেন. যে, আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা বলিবে। বরং আরও বেশী বলেন; পাঠক বিশ্বাস না করেন, তাঁহার লিপি উদ্ধৃত করিতেছি, পড়ুন।

"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে, অসংকোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্ম্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্য ভাবে কেহ ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্ম্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চালিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য* লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে

* বক্তৃতার সময়ে শ্রোতারা এই শব্দটা কিরূপ শুনিয়াছিলেন?

একটি কথা কহিতে সাহস করেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি। (ভারতী—অগ্রহায়ণ, ৩৪৭ পৃ)

সর্ব্বনাশের কথা বটে, আদি ব্রাহ্ম সমাজ না থাকিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। হয়ত পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন কবে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিল! কবে আমি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া, স্পর্দ্ধা সহকারে লোক ডাকিয়া বলিয়াছি, "তোমরা ছাই ভস্ম সত্য ভাসাইয়া দাও—মিথ্যার আরাধনা কর।" কথাটার উত্তর দিতে পারিলাম না। ভরসা ছিল, রবীন্দ্র বাবু এ বিষয়ে সহায়তা করিবেন, কিন্তু বড় করেন নাই। তাঁহার কুড়ি স্তম্ভ বক্তৃতার মধ্যে মোটে ছয় ছত্র প্রমাণ প্রয়োগ খুঁজিয়া পাইলাম। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোক-হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"

প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্যন্ত; তারপর আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বলিতেছেন, "কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

আমি বলিলেও মিথ্যা সত্য না হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও না হইতে পারে, কিন্তু বোধ করি, আদি ব্রাহ্ম সমাজের কেহ কেহ বলিলে হয়। উদাহরণ স্বরূপ "একটি আদর্শ হিন্দু-কল্পনা" সম্পাদক মহাশয়ের মুখ-নিঃসৃত এই চারিটি শব্দ পাঠককে উপহার দিতেছি।

প্রথম "কল্পনা" শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু "কল্পনা" করিয়াছি, এ কথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দু-ধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্র বাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, "কল্পনা" নহে। আমার নিকট পরিচিত দুইজন হিন্দুর দোষ গুণ বর্ণনা করিয়াছি। এক জন সন্ধ্যা আহ্নিকে রত, কিন্তু পরের অনিষ্টকারী। আদি ব্রাহ্ম সমাজের কেহ যদি চাহেন, আমি তাঁহার বাড়ী তাঁহাদিগকে দেখাইয়া আনিতে পারি। স্পষ্টই বলিয়াছি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। ঐ ব্যক্তির পরিচয় দিয়া বলিয়াছি, "আর একটি হিন্দুর কথা

বলি।" ইহাতে কল্পনা বুঝায় না, পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় বুঝায়।

তারপর "আদর্শ" কথাটি সত্য নহে। "আদর্শ" শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরা পান করে, সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে?

এই দুইটি কথা "অসত্য" বলিতে হয়। অথচ সত্যের মহিমা কীর্ত্তনে লাগিয়াছে। অতএব কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকের বাক্যবলে হইতে পারে।

প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে এরূপ বিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার যদি মনে থাকিত যে, আমি রবীন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে এতটুকুও বলিতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি বলিয়া এত কথা বলিলাম।

এখন এ সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক। স্থূল কথার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। "যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়।" এ কথার কোন অর্থ আছে কি? যদি বলা যায়, "একটা চতুষ্কোণ গোলক।" তবে অনেকেই বলিবেন, এমন কথার অর্থ নাই। যদি রবীন্দ্র বাবু আমার উক্তি তাই মনে করিতেন, তবে গোল মিটিত। তাঁহার বক্তৃতাও হইত না— আমাকেও এ পাপ প্রবন্ধ লিখিতে হইত না। তাহা নহে। ইহা অর্থযুক্ত বাক্য বটে, এবং তিনিও ইহাকে অর্থযুক্ত বাক্য মনে করিয়া, ইহার উপর বক্তৃতাটি খাড়া করিয়াছেন।

যদি তাই, তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তিনি এমন কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি, যাহাতে লেখক যে অর্থে এই কথা ব্যবহার করিয়াছিল, সেই অর্থটি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে গালিই তাঁহার উদ্দেশ্য— সত্য তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি বলিবেন, "এমন কোনো চেষ্টার প্রয়োজনই হয় নাই। লেখকের যে ভাব, লেখক নিজেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন— বলিয়াছেন, যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।" ঠিক কথা, কিন্তু এই কথা বলিয়াই আমি শেষ করি নাই। মহাভারতীয় একটি কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়েছি। এই কৃষ্ণোক্তিটি কি, রবীন্দ্র বাবু তাহা পড়িয়া দেখিয়াছেন কি? যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে জানিলেন যে, আমার কথার ভাবার্থ তিনি বুঝিয়াছেন?

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্র বাবু বলিতে পারেন, "অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত সমুদ্রবিশেষ,

আমি কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি খুঁজিয়া পাইব ? তুমি ত কোন নিদর্শন লিখিয়া দাও নাই।" কাজটা রবীন্দ্র বাবুর পক্ষে বড় কঠিন ছিল না। ১৫ই শ্রাবণ আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার পর অনেক বার রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতি বার অনেক ক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কথাবার্ত্তা প্রায় সাহিত্য বিষয়েই হইয়াছে। এত দিন কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে আমি দেখাইয়া দিতে পারিতাম, কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি। রবীন্দ্র বাবুর অনুসন্ধানের ইচ্ছা থাকিলে অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঐ কৃষ্ণোক্তির মর্ম্ম পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন, ভাবিতেছিলেন, অর্জ্জুন এতক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে। অর্জ্জুন আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ণ বধ হইয়াছে কিনা। অর্জ্জুন বলিলেন—না, হয় নাই। তখন যুধিষ্ঠির রাগান্ধ হইয়া অর্জ্জুনের অনেক নিন্দা করিলেন, এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করিলেন। অর্জ্জুনের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল—যে গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক্ষণে "সত্য" রক্ষার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নহিলে "সত্য" চ্যুত হয়েন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন—মনে করিলেন, তার পর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য-লঙ্ঘনই ধর্ম্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।

এটা যে উপন্যাস মাত্র, তাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষিত লেখকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতার ভাবে বুঝায় যে, যেখানে কৃষ্ণ নাম আছে, সেখানে আর আমি মনে করি না যে, এখানে উপন্যাস আছে—সকলই প্রতিবাদের অতীত সত্য বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান করি। আমি যে এমন মনে করিতে পারি যে, এ কথাগুলি সত্য সত্য কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলেন নাই, ইহা কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্মের কবিকৃত উপন্যাস-যুক্ত ব্যাখ্যা মাত্র, ইহা বোধ হয় তাঁহারা বুঝিবেন না। তাহাতে এখন ক্ষতি নাই। আমার এখন এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি আমার কথার অর্থ বুঝিতে কি গোলযোগ করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝিয়াছেন কি ? না হয় একটু বুঝাই।

রবীন্দ্র বাবু "সত্য" এবং "মিথ্যা" এই দুইটি শব্দ ইংরেজি অর্থে ব্যবহার

করিয়াছেন। সে অর্থেই আমার ব্যবহৃত "সত্য" "মিথ্যা" বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য, Truth, মিথ্যা, Falsehood। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই। এই অনুবাদপরায়ণতাই আমার বিবেচনায় আমাদের মৌলিকতা, স্বাধীন চিন্তা ও উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে। "সত্য" "মিথ্যা" প্রাচীন কাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা-রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য। এইরূপ একটি প্রাচীন ইংরেজি কথা আছে—"Troth"। ইহাই Truth শব্দের প্রাচীন রূপ। এখন Truth শব্দ Troth হইতে ভিন্নার্থ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ শব্দটিও এখনও আর বড় ব্যবহৃত হয় না। Honour, Faith, এই সকল শব্দ তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এ সামগ্রী চোর ও অন্যান্য দুষ্ক্রিয়াকারীদিগের মধ্যেও আছে। তাহারা ইহার সাহায্যে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যাহা Truth— রবীন্দ্র বাবুর Truth, তাহার দ্বারা পাপের সাহায্য হইতে পারে না।

এক্ষণে রবীন্দ্র বাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মতে আপনার পাপপ্রতিজ্ঞা (সত্য) রক্ষার্থ নিরপরাধী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জ্জুনের উচিত ছিল? যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য করে যে, আজ দিবাবসানের মধ্যে পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ আছে— হত্যা, দস্যুতা, পরদার, পরপীড়ন— সকলই সম্পন্ন করিব— তাঁহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত? যদি তাঁহাদের সে মত হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সত্যবাদ তাঁহাদেরই থাক্, এ দেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর তাঁহাদের মত যদি সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য।

এ অর্থে "সত্য" "মিথ্যা" শব্দ ব্যবহার করা আমার উচিত হইয়াছে কি না, ভরসা করি, এ বিচার উঠিবে না। সংস্কৃত শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরেজি কথার অর্থ তাহাতে লাগাইতে হইবে, ইহা আমি স্বীকার করি না। হিন্দুর বর্ণনার স্থানে যে খ্রীষ্টীয়ানের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহাও স্বীকার করি না।

রবীন্দ্র বাবু "সত্য" শব্দের ব্যাখ্যায় যেমন গোলযোগ করিয়াছেন, লোকহিত লইয়াও তেমনি— বরং আরও বেশী গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু

আর কচকচি বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই। এখন আর আমার সময়ও নাই। প্রচারে আর স্থানও নাই। বোধ হয়, পাঠকের আর ধৈর্য্যও থাকিবে না। সুতরাং ক্ষান্ত হইলাম।

এখন রবীন্দ্র বাবু বলিতে পারেন যে, "যদি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, আমি ভ্রমে পতিত হইয়াছি— তবে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়াই তোমার ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল— আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়াইতেছ কেন?" এই কথার উত্তরে, যে কথা সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধে বলা রুচিবিগর্হিত, যাহা Personal তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘা-স্বরূপ মনে করি— এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃজ্জনমধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল, প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্র বাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই! অথচ বোধ হয়, যদি ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্র বাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছিল যে, দেশের অবনতি, এবং ধর্ম্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক, এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ ঘৃণাক্ষরেও উত্থাপিত করিবেন না, তারপর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে করি, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাজ, গোড়ায় যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়ানতে আমার কোন দোষ আছে কিনা, বিচার করুন।

তাই, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা এ দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব, এমন আশা রাখি। কিন্তু বিবাদ বিসংবাদে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। বিশেষ আমার

বিশ্বাস, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতিশয় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্য্যে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন কিছু কাজ হয় নাই বা হইতে পারে না, যাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকেরা গণনার মধ্যে আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ-বিসংবাদে কমিবে বই বাড়িবে না। পরস্পরের আনুকূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারাও বড় কাজ হইতে পারে। তাই বলিতেছি, বিবাদ-বিসংবাদে, স্বনামে বা বিনামে, স্বতঃ বা পরতঃ, প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে বিবাদ বিসংবাদে, তাঁহারা মন না দেন। আমি এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম, আর কখন এরূপ প্রতিবাদ করিব, এমন ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, অবশ্য করিবেন।

উপসংহারে রবীন্দ্র বাবুকেও একটা কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভান বলিতেছি। এ জিনিষ, এ দেশে বড় ছিল না— এখন বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য্য। মৌখিক "Lie direct" সম্বন্ধে তাঁহাদের যত আপত্তি— কার্য্যতঃ সমুদ্রপ্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সেকালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে যে 'Lie direct' সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু ততটা কপটতা ছিল না।* দুইটিই মহাপাপ। এখন ইংরেজি শিক্ষার গুণে হিন্দু পাপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইংরেজি পাপটা বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্র বাবু বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্র বাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এটুকু বলিলাম, মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি, এই জন্য বলিলাম। তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন— আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।

---

* দেবী চৌধুরাণীতে প্রসঙ্গক্রমে ইহা উত্থাপিত করিয়াছি—১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

রবীন্দ্রনাথের 'কৈফিয়ৎ'

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ ভারতীর পৌষ ১২৯১ সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন— এই প্রবন্ধটি পরে গ্রন্থভুক্ত হয় নাই—

কৈফিয়ৎ

আমি গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে "পুরাতন কথা" নামক একটি প্রবন্ধ লিখি, তাহার উত্তরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত মাসের প্রচারে "আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া জানিলাম যে, বঙ্কিমবাবুর কতকগুলি কথা আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। অতিশয় আনন্দের বিষয়। কিন্তু পাছে কেহ আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেন এই জন্য, কেন যে ভুল বুঝিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহার কারণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার প্রবন্ধের প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবু আনুষঙ্গিক যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিব। আপাততঃ প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

বঙ্কিমবাবু বলেন "রবীন্দ্রবাবু 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' এই দুইটি শব্দ ইংরাজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত 'সত্য' মিথ্যা' বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য Truth মিথ্যা Falsehood। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহারকালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই··· 'সত্য' 'মিথ্যা' প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য।"

বঙ্কিমবাবু যে অর্থ মনে করিয়া সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এখন বুঝিলাম। কিন্তু প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দু ধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধে যে কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে এই অর্থ বুঝিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমার সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয়।

তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি। "যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"

প্রথমে দেখিতে হইবে সংস্কৃতে সত্য মিথ্যার অর্থ কি। একটা প্রয়োগ না দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে না। মনুতে আছে—

সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ, এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

অর্থাৎ— সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না, প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।— এখানে সত্য বলিতে কেবলমাত্র সত্য কথাই বুঝাইতেছে, তৎসঙ্গে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝাইতেছে না। যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝাইত তবে প্রিয় ও অপ্রিয় শব্দের সার্থকতা থাকিত না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে মনু সত্য শব্দে Truth ছাড়া "আরো কিছু"-কে ধরেন নাই, এই অসম্পূর্ণতাবশতঃ সংহিতাকার মনুকে যদি কেহ অনুবাদপরায়ণ বা খ্রীষ্টান বলিয়া গণ্য করেন, তবে আমি সেই পুরাতন মনুর দলে ভিড়িয়া খৃষ্টীয়ান হইব— আমার নূতন হিন্দুয়ানীতে আবশ্যক? সত্য শব্দের মূল ধাতু ধরিয়াই দেখি আর ব্যবহার ধরিয়াই দেখি— দেখা যায়, সত্য অর্থে সাধারণতঃ Truth বুঝায় ও কেবল স্থল-বিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায়। অতএব যেখানে সত্যের সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ অর্থের আবশ্যক সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ—"সত্য" বলিতে প্রতিজ্ঞা "রক্ষা" বুঝায় না। সত্য পালন বা সত্য রক্ষা বলিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝায়। কেবলমাত্র সত্য শব্দে বুঝায় না।

তৃতীয়তঃ—বঙ্কিম বাবু "সত্য" শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি "মিথ্যা" শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। সত্য শব্দে সংস্কৃতে স্থল বিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায় বটে— কিন্তু মিথ্যা শব্দে তদ্বিপরীত অর্থ সংস্কৃত ভাষায় বোধ করি প্রচলিত নাই— আমার এইরূপ বিশ্বাস।

ভ্রম হইবার আরেক্‌টি গুরুতর কারণ আছে। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন "যদি মিথ্যা কথা কহেন"—সত্য রক্ষা না করাকে "মিথ্যা কথা কওয়া" কোন পাঠকের মনে হইতে পারে না। তিনি হিন্দুই হউন্ খ্রীষ্টিয়ান্ই হউন্ স্বাধীনচিন্তাশীলই হউন্ আর অনুবাদ-পরায়ণই হউন্ "মিথ্যা কথা কহা" শুনিলেই তাহার প্রত্যহ প্রচলিত সহজ অর্থই মনে হইবে। অর্জ্জুন যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে-কেহ তাঁহার গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে তাহাকে তিনি বধ করিবেন, তখন তিনি মিথ্যা কথা কহেন নাই। কারণ অর্জ্জুন এখানে কোন সত্য গোপন করিতেছেন না, তাঁহার হৃদয়ের যাহা বিশ্বাস বাক্যে

তাহার অন্যথাচরণ করিতেছেন না, তৎকালে সত্য সত্যই যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, কোন প্রকার সত্যের ভানও করেন নাই। আমি যদি বলি যে, "আমি কাল তোমার বাড়ি যাইব" ও ইতিমধ্যে আজই মরিয়া যাই তবে আমাকে কোন্ নৈয়ায়িক মিথ্যাবাদী বলিবে? এখানে হৃদয়ের বিশ্বাস ধরিয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়— আমি যখন বলিয়াছিলাম তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তোমার বাড়ি যাইতে পারিব। মানুষ যখন অতীত বা বর্ত্তমান সম্বন্ধে কোন কথা বলে তখন তাহার জ্ঞান লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়, সে যদি বলে কাল তোমার বাড়ি গিয়াছিলাম অথচ না গিয়া থাকে তবে সে মনের মধ্যে জানিল এক মুখে বলিল আর, অতএব সে মিথ্যাবাদী। আর যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা বলে তখন তাহার বিশ্বাস লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়। যে বলে কাল তোমার বাড়ি যাইব, তাহার মনে যদি বিশ্বাস থাকে যাইব না, তবেই সে মিথ্যাবাদী। অর্জ্জুন যে তাঁহার সত্য পালন করিলেন না সে যে তাঁহার ক্ষমতাসত্ত্বেও কেবলমাত্র খেয়াল-অনুসারে করিলেন না তাহা নহে, সহৃদয় ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অনতিক্রমণীয় গুরুতর বাধাপ্রযুক্ত করিতে পারিলেন না— মনুষ্য-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাবশতঃ এ বাধার সম্ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। যদি বা উদয় হইয়া থাকে তবে মনুষ্য-বুদ্ধির অসম্পূর্ণতাবশতঃ বিশ্বাস হইয়াছিল যে তথাপি সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু কার্য্যকালে দেখিলেন তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত (শারীরিক ক্ষমতার কথা বলিতেছি না)। অতএব সত্যপালনে অক্ষম হওয়াকে "মিথ্যা কথা কহা" বলা যায় না। যদি কেহ বলেন তবে তিনি মনুষ্যের সহজ বুদ্ধিকে নিতান্ত পীড়ন করিয়া বলেন। যদি বা আবশ্যকের অনুরোধে নিতান্তই বলিতে হয় তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও নিতান্ত আবশ্যক।

বঙ্কিমবাবু এইরূপ বলেন, যে, আমি যখন মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি তখন অগ্রে সেই কৃষ্ণোক্তি অনুসন্ধান করিয়া পড়িয়া তবে আমার কথার যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু বঙ্কিমবাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধে মহাভারতীয় কৃষ্ণের বিশেষ উক্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই, তখন, আমার এবং অনেক পাঠকের সর্ব্বজনখ্যাত দ্রোণপর্ব্বস্থ কৃষ্ণের সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে উক্তিই মনে উদয় হওয়া অন্যায় হয় নাই। বিশেষতঃ যখন তাঁহার লেখা পড়িয়া সত্য কথনের কথাই মনে হয় সত্য পালনের কথা মনে হয় না তখন

মহাভারতের যে কৃষ্ণোক্তি তাহারই সমর্থনের স্বরূপ সঙ্গত হয় অগত্যা তাহাই আমাদের মনে আসে। মনে না আসাই আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ সেইটাই অপেক্ষাকৃত প্রচলিত। "হত ইতি গজে"র কথা সকলেই জানে, কিন্তু গাণ্ডীবের কথা এত লোক জানে না।

যখন অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় তখনই লোকে নানা উপায়ে বুঝিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কোন অর্থ সহজেই মনে প্রতিভাত হয় ও সাধারণের মনে কেবলমাত্র সেইরূপ অর্থই প্রতিভাত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় তখন চেষ্টা করিবার কথা মনেই আসে না। আমি সেই জন্যই বঙ্কিমবাবুর উক্ত কথা বুঝিতে অতিরিক্ত মাত্রায় চেষ্টা করি নাই।

প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এইটুকু, এখন অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা যাক্।

বঙ্কিমবাবু এক স্থলে কৌশলে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে আমার প্রবন্ধে আমি মিথ্যা কথা কহিয়াছি। যদিও বলিয়াছেন কিন্তু তিনি যে তাহা বিশ্বাস করেন তাহা আমার কোন মতেই বোধ হয় না। কৌতুক করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি একটি ক্ষুদ্র কথাকে কিঞ্চিৎ বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছেন, এই মাত্র। আমি বলিয়াছিলাম, "লেখক মহাশয় একটি হিন্দু আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন" ইত্যাদি। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন "প্রথম, 'কল্পনা' শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু 'কল্পনা' করিয়াছি একথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্র বাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, "কল্পনা" নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষগুণ বর্ণনা করিয়াছি।"

উল্লিখিত প্রচারের প্রবন্ধে দুই জন হিন্দুর কথা আছে, একজন ধর্ম্মভ্রষ্ট আরেকজন আচারভ্রষ্ট। ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখস্থলে তিনি বলিয়াছেন বটে "আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি, তিনি" ইত্যাদি—কিন্তু আমাকর্ত্তৃক আলোচিত আচারভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখ স্থলে তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন— "আর একটি হিন্দুর কথা বলি।" কাল্পনিক আদর্শের উল্লেখ কালেও এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমে একটি সত্য উদাহরণ দিয়া তাহার পরেই সর্ব্বতোভাবে তাহার একটি বিরুদ্ধ পক্ষ খাড়া করিবার উদ্দেশে একটি কাল্পনিক

উদাহরণ গঠিত করা অনেক স্থলেই দেখা যায়। প্রচারের লেখা হইতে এরূপ অনুমান করা যে কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না এমন কথা বলা যায় না। যদি স্বল্পবুদ্ধিবশতঃ আমি এরূপ অনুমান করিয়া থাকি তবে তাহা তরুণবয়সসুলভ ভ্রম মনে করাই বঙ্কিমবাবুর ন্যায় উদার হৃদয় মহদাশয়ের উচিত, স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা উক্তি মনে করিলে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইব। বিশেষতঃ তিনি যখন প্রকাশ্যে আমাকে তাঁহার সুহৃৎশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়াছেন তখন সেই আমার গর্ব্বের সম্পর্ক ধরিয়া আমি কিঞ্চিৎ অভিমান প্রকাশ করিতে পারি, সে অধিকার আমাকে তিনি দিয়াছেন।

আমার দ্বিতীয় নম্বর মিথ্যার উল্লেখে বলিয়াছেন—"তার পর 'আদর্শ' কথাটি সত্য নহে। 'আদর্শ' শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরাপান করে সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে ?"

প্রথম কথা এই যে, আমি বলিয়াছিলাম "তিনি একটি 'হিন্দুর আদর্শ' কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন" ইত্যাদি। আমি এমন বলি নাই যে— তিনি একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন। "একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করা" ও "একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করা" উভয়ে অর্থের কত প্রভেদ হয় পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। দ্বিতীয় কথা— ভাবেও কি বুঝায় না? আদর্শ বলিতে আমি সাধারণ্যে প্রচলিত হিন্দুর আদর্শস্থল মনে করি নাই; বঙ্কিমবাবুর আদর্শস্থল মনে করিয়াছিলাম। মনে করার কারণ যে কিছুই নাই তাহা নহে। প্রবন্ধ পড়িয়া এমন সংস্কার হয় যে বঙ্কিমবাবুর মতে, কথঞ্চিৎ আচারবিরুদ্ধ কাজ করিলেই যে সমস্ত একেবারে দুষ্য হইয়া গেল তাহা নহে, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিলেই বাস্তবিক দোষের কথা হয়। ইহাই দাঁড় করাইবার জন্য তিনি এমন একটি চিত্র আঁকিয়াছেন যাহা বিরুদ্ধাচার সমর্থন করিয়াও সাধারণের চক্ষে অপেক্ষাকৃত মনোহর আকারে বিরাজ করে। দুইটি চিত্রের মধ্যে কোন্ চিত্রে লেখক মহাশয়ের হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে, কোন্ চিত্রের প্রতি তিনি, (জ্ঞাতসারেই হউক্ আর অজ্ঞাতসারেই হউক্) পাঠকদের হৃদয়াকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পড়িলেই টের পাওয়া যায়। দুইটি চিত্রই তিনি সমান অপক্ষপাতিতার সঙ্গে আঁকিয়াছেন তাহা নহে। ইহার মধ্যে যে চিত্রের উপর তাঁহার প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে সেইটিকেই সম্পূর্ণ না হউক্ অপেক্ষাকৃত আদর্শস্থল বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে। যখন বলা যায় বঙ্কিমবাবু একটি

হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন, তখন যে মহত্তম আদর্শই বুঝায় তাহাও নহে। দোষে গুণে জড়িত একটি আদর্শও হইতে পারে। যে-কোন একটা চিত্র খাড়া করিলেই তাহাকে আদর্শ বলা যায়।

তৃতীয় কথা,—কেহ বলিতে পারেন যে, আলোচ্য হিন্দুটিকে বঙ্কিম বাবু যদি মহত্তম আদর্শস্থল বলিয়া খাড়া করিয়া না থাকেন তবে তাহার চরিত্রগত কোন্ একটা গুণ অথবা দোষ লইয়া এত আলোচনা করিবার আবশ্যক কি ছিল? কিন্তু আদর্শ হিন্দুর দোষ গুণ লইয়া আমি সমালোচনা করি নাই। বঙ্কিম বাবু নিজের মুখে যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধেই আমার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। যেখানে বলিয়াছেন—"যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়"—সেখানে তিনি নিজেরই মত ব্যক্ত করিয়াছেন—এ ত আদর্শ হিন্দুর কথা নহে।

বঙ্কিম বাবু যে দুইটি অসত্যের অপবাদ আমাকে দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আমি বলিলাম। কিন্তু যেখানে তিনি বলিয়াছেন "প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে" সেখানে আমার বক্তব্যের পথ রাখেন নাই। প্রয়োজন আছে কি না জানি না; যদি থাকিত তবে উদাহরণ দিলেই ভাল ছিল আর যদি না থাকিত তবে গোপনে এই বিষবাণ ক্ষেপণেরও প্রয়োজন ছিল না।

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন "লোকহিত" শব্দের অর্থ বুঝিতে আমি ভুল করিয়াছি। তিনি সংশোধন করিয়া দেন নাই এই জন্য সেই ভুল আমার এখনও রহিয়া গেছে। সলজ্জে স্বীকার করিতেছি এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। অন্য যাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাঁহারাও আমার অজ্ঞান দূর করিতে পারেন নাই।

লেখকের নিজের সম্বন্ধে আর-একটি কথা আছে। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন ভারতীতে প্রকাশিত উল্লিখিত প্রবন্ধে গালি-গালাজের বড় ছড়াছড়ি বড় বাড়াবাড়ি আছে। শুনিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। বঙ্কিমবাবুর লেখার প্রসঙ্গে আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে কোথাও গালি দিই নাই। তাঁহাকে গালি দিবার কথা আমার মনেও আসিতে পারে না। তিনি আমার গুরুজন তুল্য, তিনি আমা অপেক্ষা কিসে না বড়! আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আর কেই বা না করে! তাঁহার প্রথম সন্তান দুর্গেশনন্দিনী বোধ করি আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। আমার যে এতদূর আত্মবিস্মৃতি

ঘটিয়াছিল যে তাঁহাকে অমান্ত করিয়াছি কেবলমাত্র অমান্ত নহে তাঁহাকে গালি দিয়াছি তাহা সম্ভব নহে। ক্ষুব্ধহৃদয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু গালি-গালাজ হইতে অনেক দূরে আছি। মেছোহাটার ত কথাই নাই আঁষ্‌টে গন্ধ-টুকু পর্য্যন্ত নাই। যে স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা গালি নহে তাহা আক্ষেপ উক্তি। "মেছোহাটা"ই বল আর "প্রার্থনা মন্দির"ই বল আমি কোথা হইতেও ফরমাস দিয়া কথা আমদানি করি নাই—আমি বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধার ধারি না—হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে সে কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত না, যিনি বিশ্বাস করেন করুন, না করেন নাই করুন।

বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন— প্রথম সংখ্যক প্রচার বাহির হওয়ার পর রবীন্দ্র-বাবুর সহিত আমার চার পাঁচ বার দেখা হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি কেন আমাকে প্রচারের উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই? করি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! মূল কথাটার সহিত তাহার কি যোগ? না করিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। সে সব ঘরের কথা। পাঠকদের বলিবার নহে। বর্ত্তমান লেখকের নানা দোষ থাকিতে পারে। দুর্ব্বল স্বভাববশতঃ আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে। বঙ্কিম বাবু পাছে বিরোধী মত সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে। প্রথম যখন পড়িয়াছিলাম তখন স্বাভাবিক অনবধানতা বা মন্দবুদ্ধিবশতঃ উক্ত কয়েক ছত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি না করিতে পারি। কিছুদিন পরে অন্য কোন ব্যক্তির মুখে এ সম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া আমার মনে আঘাত লাগিতেও পারে। উক্ত প্রবন্ধ দ্বিতীয়-বার পড়িবার সময় আমার মনে নূতন ভাব উদয় হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু, প্রকৃত কারণ এই যে, বাড়িতে প্রচার আসিবামাত্র কে কোন্ দিক হইতে লইয়া যায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জন্য ভাল করিয়া পড়িতে প্রায় বিলম্ব হইয়া যায়। আমার মনে আছে প্রথম খণ্ড প্রচার একটি পুস্তকালয়ে গিয়া চোখ বুলাইয়া দেখিয়া আসি। সকল লেখা পড়িতে পাই নাই। পরে এক-দিন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে হিন্দু ধর্ম্ম নামক প্রবন্ধের মর্ম্মটা শুনি কিন্তু তিনি সত্য মিথ্যা বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই। পরে সুবিধা অথবা অবসর অনুসারে বহু বিলম্বে উক্ত প্রবন্ধ প্রচারে পড়িতে পাই। কিন্তু এ সকল কথা কেন? আমার প্রবন্ধে আমি যদি কোন অন্যায় কথা না বলিয়া থাকি তাহা হইলে আমার আর কোন দুঃখ নাই।

আমার নিজের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এখন আর দুই-একটি কথা আছে। বঙ্কিম বাবুর লেখার ভাব এই যে তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তি-বিশেষের লেখার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না যদি না উক্ত রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখামুখী উত্তরপ্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে, বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল, তাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না ভরসাও হয় না। যাহা হউক, আলোচ্য বিষয়ের গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম বাবু উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই ; তিনি আমার প্রবন্ধকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া আদিব্রাহ্মসমাজকে দুই এক কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই, যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা উত্তরোত্তর মাত্রা চড়াইয়া বঙ্কিম বাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন। আক্রমণমাত্রই যে অন্যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। আদি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি মত আছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই সকল মত প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল। যদি উক্ত সমাজবর্ত্তী কেহ সত্যসত্যই অথবা ভ্রমক্রমেই এমন মনে করেন যে অন্য কোন মত তাঁহাদের মত-প্রচারের ব্যাঘাত করিতেছে এবং দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি সে মতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না এবং তাহাতে কোন পক্ষেরই ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং ভাল, এইরূপ না হওয়াই মন্দ। তবে, গালি-গালাজ করা কোন হিসাবেই ভাল নহে সন্দেহ নাই। এবং সে কাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে হয়ও নাই। তত্ত্ববোধিনীতে বঙ্কিম বাবুর মতের বিরুদ্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে গালিগালাজের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ নব্যহিন্দু সম্প্রদায় নামক প্রবন্ধে বিশেষ বিনয় ও সম্মানের সহিত বঙ্কিম বাবুর উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নব্যভারতে বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সহিত আদিব্রাহ্ম-সমাজের বা 'যোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দের' কোন যোগই থাকিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করিলে আরও অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে আরও অনেক মহারথীকে আরও গুরুতর রূপে আক্রমণ করিতে পারেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের

অথবা ঠাকুর মহাশয়দের তাঁহাকে নিবারণ করিবার কোন অধিকারই নাই। আমি যদি বলি বঙ্কিম বাবু নবজীবনে অথবা প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহার এজলাষের সহিত অথবা ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটসমাজের সহিত তাহাদের সবিশেষ যোগ আছে তবে সে কেমন শুনায়? আমার লেখাতেও কোন গালি-গালাজ নাই। দ্বিতীয়তঃ আমি যে লেখা লিখিয়াছি তাহা সমস্ত বঙ্গসমাজের হইয়া লিখিয়াছি বিশেষরূপে আমি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।[১]

বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর সংক্ষিপ্ত ও তির্য্যক কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষ-পাতে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী যতটা ভীত ও আহত হইব আদিব্রাহ্মসমাজের ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই। আদিব্রাহ্মসমাজের নিকটে বঙ্কিম বাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিম বাবু যখন জীবন আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে আদিব্রাহ্মসমাজ নানাদিক হইতে নানা আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন কিন্তু কখনই তাঁহার ধৈর্য্য বিচলিত হয় নাই। বঙ্কিম বাবু আজ যে বঙ্গভাষার ও যে বঙ্গসাহিত্যের পরম গৌরবের স্থল, আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই বঙ্গভাষাকে পালন করিয়াছেন সেই বঙ্গসাহিত্যকে জন্ম দিয়াছেন। আদিব্রাহ্মসমাজ বিদেশী-দ্বেষী তরুণ বঙ্গসমাজে য়ুরোপ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, এবং পাশ্চাত্যালোকে অন্ধ স্বদেশদ্বেষী বঙ্গযুবকদিগের মধ্যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজপ্রচলিত কুসংস্কার বিসর্জ্জন দিয়াছেন

---

১ সঞ্জীবনীতে নবজীবনের সূচনা লইয়া যে লেখালেখি চলিয়াছিল তাহার সহিত বঙ্কিম বাবুর কি যোগ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি বলেন বঙ্কিম বাবু নবজীবনের লেখক তবে সে বিষয়ে আমিও তাঁহার সহযোগী বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি। অতএব সঞ্জীবনীর উক্ত লেখা আমার প্রতি আক্রমণই বা নহে কেন? যদি বলেন যে বঙ্কিম বাবু যে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন উক্ত প্রবন্ধে তাহার প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাও ঠিক কথা নহে। নব-জীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নব-যুগ-প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল সঞ্জীবনীতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তাহার পরে চন্দ্রনাথ বাবুতে আর আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথাকাটাকাটি হইয়াছিল সে তাঁহাতে আমাতে বোঝাপড়া। বঙ্কিম বাবু এই ব্যাপারটি অকারণে কেন নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

কিন্তু তৎসঙ্গেসঙ্গে হিন্দুহৃদয় বিসর্জ্জন দেন নাই— এই জন্য চারিদিক হইতে ঝঞ্ঝা আসিয়া তাঁহার শিখর আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু কখনও তাঁহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় নাই। আজি সেই পুরাতন আদিব্রাহ্মসমাজের অযোগ্য সম্পাদক আমি কাহারও কটাক্ষপাত হইতে আদিব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইব ইহা দেখিতে হাস্যজনক।

বঙ্কিম বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতা-গুণে সে সমস্ত মার্জ্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে আমি সরলভাবে যে সকল কথা বলিয়াছি, আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে, বালক পত্রের চৈত্র ১২৯২ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'সত্য' প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের 'কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মতত্ত্ব' পরিচ্ছেদে সত্যমিথ্যা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমশতবার্ষিক সংস্করণ (শ্রাবণ ১৩৪৮) দ্রষ্টব্য। প্রচারের প্রবন্ধে উল্লিখিত 'মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি'র মূল এখানে নির্দেশিত হইয়াছে (পৃ ২৭৯-২৮১)।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এই বিতর্ক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থের (প্রকাশ ১৩১৯) "বঙ্কিমচন্দ্র" অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচার বাহির হইতেছে। আমিও তখন প্রচারে একটি গান ও কোনো বৈষ্ণব-পদ অবলম্বন করিয়া একটি গদ্য-ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছি।...

আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম, আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে, কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার সঞ্জীবনী কাগজে পত্র আকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচারে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে;

তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিম বাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে— যদি থাকিতে তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিম বাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।[১]

---

১ বঙ্কিম-রবীন্দ্র-বিতর্ক বিষয়ে সকল উপকরণ ব্যবহার করিয়া সজনীকান্ত দাস একটি বিশদ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন— বর্তমানে সে পত্রিকাটি সংকলয়িতার অধিগত না থাকায় আপাততঃ তাহার বিস্তারিত উল্লেখ করা সম্ভব হইল না। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-বিতর্ক প্রসঙ্গে অপিচ দ্রষ্টব্য—

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড (১৩৬৭ সংস্করণ), "ব্রাহ্মসমাজের সমর্থন" অধ্যায়। এই অধ্যায়ে লেখক এই বিতর্কের সামাজিক পটভূমি ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য দিয়াছেন।

সরলা দেবী চৌধুরানী, 'জীবনের ঝরাপাতা' (১৮৭৯ শকাব্দ), "রবীন্দ্র-বঙ্কিম বিতর্ক" ; যে-সভায় রবীন্দ্রনাথ "একটি পুরাতন কথা" প্রবন্ধ পাঠ করেন সরলা দেবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন— এই বিতর্ক সম্বন্ধে তিনি তাঁহার বাল্য-স্মৃতি নিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ (১৩৭০), "বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মসীযুদ্ধ" অধ্যায় ; এই গ্রন্থে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের যাবতীয় প্রসঙ্গ সংকলন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন।

শ্রীনীলরতন সেন -সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-বীক্ষা' [১৩৬৮]। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'একটি পুরাতন কথা' ও 'কৈফিয়ৎ', এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম্ম' ও 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' প্রবন্ধ সংকলিত।

এতদ্‌ব্যতীত, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' প্রবন্ধে উল্লিখিত তাঁহার 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ ও তাহার প্রতিবাদে লিখিত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'নূতন ধর্ম্মমত' প্রবন্ধও এই সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

মায়ার খেলা / গীতিনাট্য। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। / মূল্য আট আনা।

মলাটে

আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত / ও প্রকাশিত। / ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড।/অগ্রহায়ণ ১৮১০ শক।

আখ্যাপত্রের পিছনে

এই গ্রন্থের স্বত্ব সখিসমিতিকে[১] দান করা হইল। / গ্রন্থকার।

পৃষ্ঠাসংখ্যা [২], 'বিজ্ঞাপন' ও 'সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা' ।৵০, ৬৪
প্রকাশ [২২ ডিসেম্বর ১৮৮৮]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য ॥০ আনা

'বিজ্ঞাপন'

গ্রন্থকারের 'বিজ্ঞাপনে' লিখিত হইয়াছে—

সখিসমিতির মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি-কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল। ইহাতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প।

মাননীয়া শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে এই নাট্য রচিত হয় এবং তাঁহাকেই সাদর উপহার স্বরূপে সমর্পণ করিলাম।

ইহার আখ্যান ভাগ কোন সমাজবিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে। সঙ্গীতের কল্পরাজ্যে সমাজনিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীতভাবে ভরসা করি এই গ্রন্থে সাধারণ মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু নাই।

আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার[২] সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

---

১ স্বর্ণকুমারী দেবী কর্তৃক ১২৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত মহিলাসমিতি। ইহার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা। 'সখি সমিতি নামটি রবিমামার দেওয়া'— সরলা দেবী, জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ৫৯।

২ দ্র. নলিনী (১৮৮৪)

এই গ্রন্থের তিনটি গান ইতিপূর্ব্বে আমার অন্য কাব্যে প্রকাশিত[১] হইয়াছে।

পাঠক ও দর্শকদিগকে বুঝিতে হইবে যে, মায়াকুমারীগণ এই কাব্যের অন্যান্য পাত্রগণের দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর নহে।

এই নাট্যকাব্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা পরপৃষ্ঠায় বিবৃত হইল। নতুবা বিচ্ছিন্ন গানের মধ্য হইতে ইহার আখ্যান সংগ্রহ করা সহসা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ বোধ হইতে পারে।

প্রথম দৃশ্য।

প্রথম দৃশ্যে মায়াকুমারীগণের আবির্ভাব। মায়াকুমারীগণ কুহকশক্তি প্রভাবে মানবহৃদয়ে নানাবিধ মায়া সৃজন করে। হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ, বাসনা, লজ্জা, প্রেমের মোহ এ সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা। একদিন নববসন্তের রাত্রে তাহারা স্থির করিল প্রমোদপুরের যুবক-যুবতীদের নবীন-হৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করিয়া তাহারা মায়ার খেলা খেলিবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নবযৌবন বিকাশে গ্রন্থের নায়ক অমর সহসা হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছে। সে উদাসভাবে জগতে আপন মানসী মূর্ত্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে। এদিকে শান্তা আপন প্রাণমন অমরকেই সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু চিরদিন নিতান্ত নিকটে থাকাতে শান্তার প্রতি অমরের প্রেম জন্মিতে অবসর পায় নাই। অমর শান্তার হৃদয়ের ভাব না বুঝিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ পরিহাসচ্ছলে গাহিল—

কাছে আছে দেখিতে না পাও,
কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমদার কুমারী-হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই। সে কেবল মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সখীরা ভালবাসার কথা বলিলে সে অবিশ্বাস করিয়া

---

১ 'সখি সে গেল কোথায়', রবিচ্ছায়া,
'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে', কড়ি ও কোমল,
'কেন এলিরে, ভালবাসিলি', রবিচ্ছায়া।

উড়াইয়া দেয়। অশোক ও কুমার তাহার নিকটে আপন প্রেম ব্যক্ত করে কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। মায়াকুমারীগণ হাসিয়া বলিল, তোমার এ গর্ব্ব চিরদিন থাকিবে না।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।

চতুর্থ দৃশ্য।

অমর পৃথিবী খুঁজিয়া কাহারো সন্ধান পাইল না। অবশেষে প্রমদার ক্রীড়াকাননে আসিয়া দেখিল প্রমদার প্রেম লাভে অকৃতার্থ হইয়া অশোক আপন মর্ম্মব্যথা পোষণ করিতেছে। অমর বলিল, যদি ভালবাসিয়া কেবল কষ্টই সার তবে ভালবাসিবার প্রয়োজন কি? কেন যে লোকে সাধ করিয়া ভালবাসে অমর বুঝিতেই পারিল না। এমন সময়ে সখীদের লইয়া প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। প্রমদাকে দেখিয়া অমরের মনে সহসা এক নূতন আনন্দ নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল।—প্রমদা দেখিল আর সকলেই তৃষিত ভ্রমরের ন্যায় তাহার চারিদিকে ফিরিতেছে, কেবল অমর একজন অপরিচিত যুবক দূরে দাঁড়াইয়া আছে। সে আকৃষ্টহৃদয়ে সঙ্গীদিগকে বলিল "উহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আয় ও কি চায়!" সখীদের প্রশ্নের উত্তরে অমরের অনতিস্ফুট হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হইল না। সখীরা কিছু বুঝিল না। কেবল মায়াকুমারীগণ বুঝিল এবং গাহিল—

প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া!

পঞ্চম দৃশ্য।

অমরের মনে ক্রমে প্রমদার প্রতি প্রেম প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রমদারও হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিল, বাহিরের চঞ্চলতা দূর হইয়া গেল। সখীরা প্রমদার অবস্থা বুঝিতে পারিল—কিন্তু পূর্ব্বদৃশ্যে অমরের অস্পষ্ট উত্তর এবং ভাবগতিক দেখিয়া অমরের প্রতি সখীদের বিশ্বাস নাই।

এবং সখীদের নিকট হইতে সখীর হৃদয় হরণ করিয়া লইতেছে জানিয়া অমরের প্রতি হয়ত অলক্ষ্যে তাহাদের ঈষৎ মৃদু বিদ্বেষের ভাবও জন্মিয়াছে। অমর যখন প্রমদার নিকট আপনার প্রেম ব্যক্ত করিল প্রমদা কিছু বলিতে না বলিতে সখীরা তাড়াতাড়ি আসিয়া অমরকে প্রচুর ভর্ৎসনা করিল। সরল-হৃদয় অমর প্রকৃত অবস্থা কিছু না বুঝিয়া হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া গেল—ব্যাকুলহৃদয় প্রমদা লজ্জায় বাধা দিবার অবসর পাইল না। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

নিমেষের তরে সরমে বাধিল
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল হৃদয় বেদনা!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অমরের অসুখী অশান্ত আশ্রয়হীন হৃদয় সহজেই শান্তার প্রতি ফিরিল। এই দীর্ঘ বিরহে এবং অন্য সকলের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমর শান্তার প্রতি নিজের এবং নিজের প্রতি শান্তার অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন অনুভব করিবার অবসর পাইল। শান্তার নিকটে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল।—এদিকে প্রমদার সখীরা দেখিল অমর আর ফিরে না; তাহারা প্রত্যাশা করিয়াছিল বাধা পাইয়া অমরের প্রেমানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে; তাহাতে নিরাশ হইয়া তাহারা নানা কথার ছলে অমরকে আহ্বান করিতে লাগিল—অমর ফিরিল না; সখীদের ইঙ্গিত বুঝিতেই পারিল না। ভগ্নহৃদয়া প্রমদা অমরের প্রেমের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিল। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

সপ্তম দৃশ্য।

শান্তা ও অমরের মিলনোৎসবে পুরনারীগণ কাননে সমাগত হইয়া আনন্দগান গাহিতেছে। অমর যখন পুষ্পমালা লইয়া শান্তার গলে আরোপণ করিতে যাইতেছে এমন সময় ম্লান ছায়ার ন্যায় প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। সহসা অনপেক্ষিতভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদ-প্রতিমা প্রমদার নিতান্ত করুণ

দীন ভাব অবলোকন করিয়া নিমেষের মতো আত্মবিস্মৃত অমরের হস্ত হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়া গেল। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া শান্তা ও আর সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তখন শান্তা ও সখীগণ অমর ও প্রমদার মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হইল। প্রমদা কহিল—"আর কেন! এখন বেলা গিয়াছে, খেলা ফুরাইয়াছে, এখন আর আমাকে কেন! এখন এ মালা তোমরা পরো, তোমরা সুখে থাকো।" অমর শান্তার প্রতি লক্ষ করিয়া কহিল, "আমি মায়ার চক্রে পড়িয়া আপনার সুখ নষ্ট করিয়াছি এখন আমার এই ভগ্ন সুখ এই ম্লান মালা কাহাকে দিব, কে লইবে?" শান্তা ধীরে ধীরে কহিল, "আমি লইব। তোমার দুঃখের ভার আমি বহন করিব। তোমার সাধের ভুল প্রেমের মোহ দূর হইয়া জীবনের সুখ-নিশা অবসান হইয়াছে—এই ভুলভাঙা দিবালোকে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার হৃদয়ের গভীর প্রশান্ত সুখের কথা তোমাকে শুনাইব।" অমর ও শান্তার এইরূপে মিলন হইল। প্রমদা শূন্যহৃদয় লইয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না,
শুধু সুখ চলে যায়,
এমনি মায়ার ছলনা!

কবির মন্তব্য

জীবনস্মৃতিতে বাল্মীকিপ্রতিভা অধ্যায়ে মায়ার খেলা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

[মায়ার খেলাতে] নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশকালে (বিশ্বভারতী, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৬) বাল্মীকি-প্রতিভা ও মায়ার খেলা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

বাল্মীকি-প্রতিভায় একটি নাট্য-কথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি

চলছিল। তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভিতর মহলে পা দিয়েছি; মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল-বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠছিল। বাল্মীকি-প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হোলো তার অন্তর্গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব, যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে। প্রকৃতির প্রতিশোধেও এই দ্বন্দ্ব। সন্ন্যাসীর মধ্যে চিরকালের যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল তার বাঁধন ছিঁড়ল। কবির মনের মধ্যে বাজছিল মানুষের জয়গান। মায়ার খেলায় গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারে নি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী। মায়াকুমারীদের কাছ থেকে এই ভর্ৎসনা কানে এল—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়,
এমনি মায়ার ছলনা।

সংস্করণ

পূর্বতন কতকগুলি গান বর্জন করিয়া ও পরবর্তীকালে রচিত বা নব-লিখিত গান যোগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৫ সালে মায়ার খেলার নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করেন। ইহা নৃত্যনাট্যরূপে পরিকল্পিত ও শান্তিনিকেতনে অংশত অভিনীত হইয়াছিল, এইজন্য ইহা নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা রূপে পরিচিত। পাণ্ডুলিপি হইতে ইহা গীতবিতানের ১৩৫৭ আশ্বিনে প্রকাশিত তৃতীয় খণ্ডে বা তৎপরবর্তী সংস্করণে সংকলিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য, গীতবিতানের উক্ত তৃতীয় খণ্ডে বা অখণ্ড গীতবিতানে মুদ্রিত গ্রন্থ-পরিচয়।

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য মায়ার খেলার প্রভেদ নিম্নে সংকলিত হইল—

প্রথম দৃশ্য। মায়াকুমারীদের গানটি নৃত্যনাট্যে সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য। মায়াকুমারীদের গান 'কাছে আছে দেখিতে না পাও' গীতিনাট্যে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল— অমরের গান 'জীবনে আজ কি প্রথম

এল বসন্ত'র প্রথম অংশের পর দুই ছত্র ; 'জীবনে আজ কি, প্রথম এল বসন্ত'র শেষাংশের পর 'মনের মতো…যাহার পানে চাও' অংশ, এবং শান্তার গান 'আমার পরান যাহা চায়' অংশের পর 'কাছে আছে' গানের সম্পূর্ণ অংশ দিয়া দৃশ্য সমাপ্ত।

নৃত্যনাট্যে অমরের গানের 'জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত'র প্রথম অংশের পরেই মায়াকুমারীগণের 'কাছে আছে…'গানটি একবারে সম্পূর্ণ।[১]

তৃতীয় দৃশ্য। পূর্বেই পাদটীকার সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই দৃশ্যে মায়াকুমারীগণ অনুপস্থিত, ফলে তাহাদের গান 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে'ও বর্জিত।

নৃত্যনাট্যে, প্রমদার তৃতীয়া সখীর 'সখী বহে গেল বেলা'র পূর্বে, নূতন একটি গান দ্বিতীয় সখীর মুখে বসানো হইয়াছে। এই গানটি 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা'।

অতঃপর, গীতিনাট্যে যে স্থলে কুমারের প্রবেশ আছে নৃত্যনাট্যে তৎস্থলে অমরের প্রবেশ ; গীতিনাট্যে কুমারের গান নৃত্যনাট্যে অমর-কর্তৃক গীত ; কুমার চরিত্র এই দৃশ্যে বর্জিত।

চতুর্থ দৃশ্য। প্রারম্ভে গীতিনাট্যে অমর, কুমার ও অশোকের আলাপের পরিবর্তে নৃত্যনাট্যে অমর শান্তা ও সখীর আলাপ পাত্রপাত্রী পরিবর্তনের ফলে উক্তিরও পুনর্বণ্টন হইয়াছে। কুমার ও অশোক এ দৃশ্য হইতে বর্জিত। নৃত্যনাট্যে অমরের গান 'মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে' বর্জিত। গীতিনাট্যে

---

১ "পুরাতন রচনায় ধারাবাহিক মন্তব্য হিসাবে…কায়াধারীদের আলাপ-বিলাপের ফাঁকে ফাঁকে তারা [মায়াকুমারীগণ] কোনো-একটি গান টুকরো টুকরো করে গেয়ে দৃশ্যের শেষে পুনর্বার সব গানটি গেয়েছে।…নৃত্যনাট্যের পাঠে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্যে মায়াকুমারীগণ অনুপস্থিত। সপ্তম দৃশ্যের শেষের দিকে তাদের শেষ আবির্ভাব একটি অচ্ছিন্ন গানে। মায়াকুমারীদের পুনঃপুনঃ আবির্ভাবে এবং ছিন্ন ছিন্ন গানে নানা করুণ মধুর ভাবুকতাকে নানা করুণ মধুর ভাষায় ও সুরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না। বাদ দিয়ে, নাটকে বেগ বা নাটকীয়তা বহুগুণে বেড়েছে।"—শ্রীকানাই সামন্ত, "রূপসৃষ্টি : মায়ার খেলার রূপান্তর", রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থ (১৩৬৮)।

অশোকের গান 'তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ' নৃত্যনাট্যে শান্তা-কর্তৃক গীত।

গীতিনাট্যে 'আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি' গান কুমার ও অমর -কর্তৃক গীত; নৃত্যনাট্যে, স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তনান্তে, উহা অমর ও সখী -কর্তৃক গীত।

গীতিনাট্যে অশোকের গান 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান' নৃত্যনাট্যে বর্জিত।

অতঃপর, গীতিনাট্যে 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি' গানটির বিভিন্ন অংশ অমর, অশোক ও কুমার -কর্তৃক গীত; নৃত্যনাট্যে এই দৃশ্যে অশোক ও কুমার অনুপস্থিত, গানটির বিভিন্ন অংশ অমর ও সখী -কর্তৃক গীত।

নৃত্যনাট্যে মায়াকুমারীগণ এই দৃশ্যেও অনুপস্থিত, গীতিনাট্যে অতঃপর যে মায়াকুমারীদের 'দেখো চেয়ে' গানটি আছে তাহাও নৃত্যনাট্যে বর্জিত।

অতঃপর প্রমদা (ও সখীগণের) 'সুখে আছি সুখে আছি' গানের পর 'ভালোবেসে দুখ সেও সুখ' গানের অশোক ও কুমারের অংশ অমর-কর্তৃক গীত— অশোক ও কুমার এই দৃশ্যে অনুপস্থিত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অতঃপর গীতিনাট্যে অমরের গান 'ওই কে গো হেসে চায়' নৃত্যনাট্যে বর্জিত। গীতিনাট্যের মায়াকুমারীগণের 'প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে'ও নৃত্যনাট্যে বর্জিত।

পঞ্চম দৃশ্য। গীতিনাট্যের প্রারম্ভে অমরের গান 'দিবস রজনী আমি যেন কার' নৃত্যনাট্যে বর্জিত। অতঃপর 'সখী সাধ করে যাহা দেবে' গানের পর গীতি-নাট্যে আছে প্রমদার গান 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল'; মায়াকুমারী-গণের গান 'নিমেষের তরে শরমে বাধিল', এবং অশোক ও সখীগণের 'ওগো সখী দেখি দেখি মন কোথা আছে'— নৃত্যনাট্যে এ সকলই বর্জিত।

অতঃপর, সখীদের 'সেজন কে সখী বোঝা গেছে' গানের পর গীতিনাট্যে আছে অমরের গান 'ওই মধুর মুখ জাগে মনে', নৃত্যনাট্যে উহা বর্জিত— তৎস্থলে যোগ করা হইয়াছে প্রমদার মুখে 'সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে' গান। অতঃপর সখীদের গান 'তারে কেমনে ধরিবে সখী'—নৃত্যনাট্যে ইহার শেষার্ধ বর্জিত। পরিশেষে ছিল মায়াকুমারীগণের পুনরায় 'নিমেষের তরে শরমে বাধিল', উহাও বর্জিত।

ষষ্ঠ দৃশ্য। গীতিনাট্যে এই দৃশ্যের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত গানগুলি নৃত্যনাট্যে বর্জিত—

অমর। সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল।

মায়াকুমারীগণ। কাছে ছিলে দূরে গেলে।

শান্তা। দেখো সখা, ভুল করে ভালোবেসো না।

তৎপরিবর্তে নৃত্যনাট্যে নূতন রচিত গান—

অমর। আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে

শান্তা। ভুল কোরো না গো

গীতিনাট্যে প্রমদার সখীগণের 'অলি বার বার ফিরে যায়' গানের পর অমরের গান 'ঐ কে আমায় ফিরে ডাকে'র পরিবর্তে নৃত্যনাট্যে আছে নূতন গান—'ডেকো না আমারে ডেকো না'। মায়াকুমারীগণের 'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে' গানও বর্জিত।[১] অতঃপর, শান্তার 'না বুঝে কারে তুমি' গানের পরে, গীতিনাট্যের নিম্নলিখিত গানগুলিও অর্থাৎ দৃশ্যের অবশিষ্টাংশ বর্জিত—

অমর। আমি কারেও বুঝি নে

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি।

প্রমদা। চল সখি চল তবে ঘরেতে ফিরে[২]

মায়াকুমারীগণ। 'বিদায় করেছ যারে'র শেষাংশ

তৎপরিবর্তে নৃত্যনাট্যের নূতন গান—

অমর। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী

[শান্তা] হায় হতভাগিনী

সপ্তম দৃশ্য। গীতিনাট্যের দৃশ্যারম্ভে 'এস এস বসন্ত ধরাতলে'-র পর নিম্নলিখিত গানগুলি নৃত্যনাট্যে বর্জিত—

অমর। মধুর বসন্ত এসেছে

স্ত্রী ও পুরুষগণ। আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে

অতঃপর প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশের পর অমরের 'একি স্বপ্ন একি মায়া' গানের প্রথম দু ছত্রের পর, গীতিনাট্যের অবশিষ্ট সব অংশ অর্থাৎ নিম্নলিখিত

---

১ গীতিনাট্যে গানটির শেষাংশ দৃশ্যসমাপ্তিতে গীত, নৃত্যনাট্যে গানটি সম্পূর্ণই বর্জিত।

২ গীতিনাট্যে এই দৃশ্যের শেষ ভাগে প্রমদার প্রবেশ ও গান। নৃত্য-নাট্যে এই দৃশ্যে প্রমদা অনুপস্থিত।

গানগুলিও, নৃত্যনাট্যে বর্জিত—

শান্তা ও পুরুষগণ। আহা কে গো তুমি মলিন বয়নে (একি স্বপ্ন, একি মায়া গানের প্রথম দু ছত্রের পরবর্তী অংশ)

সখীগণ। আহা আজি এ বসন্তে

শান্তা। আমি তো বুঝেছি সব

অশোক। এতদিন বুঝি নাই

শান্তা, স্ত্রী ও পুরুষগণ। চাঁদ হাসো হাসো

প্রমদা ও সখীগণ। আর কেন, আর কেন

অমর। এ ভাঙা সুখের মাঝে

শান্তা। যদি কেহ নাহি চায়

মায়াকুমারীগণ। দুখের মিলন টুটিবার নয়

প্রমদা ও সখীগণ। কেন এলি রে

মায়াকুমারীগণ। এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম

তৎপরিবর্তে নিম্নলিখিত নবরচিত, বা প্রবীণ বয়সে লিখিত গানগুলি নৃত্যনাট্যে ব্যবহৃত—

পুরুষগণ, অমর, শান্তা। ওকি এল, ওকি এল না

সখীগণ। কোন্ সে ঝড়ের ভুল

শান্তা। ছি ছি মরি লাজে

শান্তা, স্ত্রী ও পুরুষগণ। শুভ মিলনলগনে বাজুক বাঁশি

প্রমদা। আর নহে, আর নহে

অমর। ছিন্নশিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি

শান্তা। যাক ছিঁড়ে যাক ছিঁড়ে যাক

মায়াকুমারী। দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে

সকলে। আজ খেলা ভাঙার খেলা

নৃত্যনাট্য মায়ার খেলার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র

মায়ার খেলার সংস্কারসাধনের ইতিহাস ও এই সময়ে কবির মনের ভাব শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্‌ধৃত হইল—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণী, স্বপ্নে আমাকে কেন তুমি অল্প বয়সের দেখেছিলে তার কারণ তোমাকে বলি। সম্প্রতি বউমা স্থির করেছিল মায়ার খেলার নৃত্যাভিনয় করতে হবে। তাই তার পুনঃসংস্কারে লেগেছি, যেখানে তার অভাব ছিল পূরণ করচি, কাঁচা ছিল শোধন করচি—গানের পরে গান লেখা চলচে এক-একদিনে চারটে পাঁচটা। যৌবনের তরঙ্গে মন দোদুল্যমান—জীর্ণ শরীরটাকে কোথায় দূরে ভাসিয়ে দিয়েছে। গানের সুরে যে রকম সৃষ্টির বদল করে দেয় এমন আর কিছুতে নয়। ঘোর শীতের সময় আমার তরুণ জন্মরাগিণীলোকে অতীতের সমুদ্রপার থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বসন্তের দুর্দান্ত হাওয়া—মনের মধ্যে কূজন চল্‌চে, গুঞ্জন চল্‌চে—যে সব লোক বাইরে থেকে কাজের বা অকাজের হাওয়া নিয়ে আসে তাদের মনে হয় বিদেশী লোক—কেননা তাদের মধ্যে সুরের স্পর্শ একটুও নেই। শবসাধনায় উত্তরসাধক থাকা চাই, স্বরসাধনায় চাই উত্তরসাধিকা—কিন্তু মন্দভাগ্য আমি—কে কোথায়। তাই স্বপ্নের সহায়তায় কাজ চালাচ্চি।…১১।১২। [১৯]৩৮

—রবীন্দ্রনাথ, পত্রাবলী, দেশ ৩ চৈত্র ১৩৬৮, ৪৫১ সংখ্যক পত্র

মায়ার খেলার প্রথম ও পরবর্তী কোনো কোনো অভিনয়

ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে (Volume XIV, Number 3, 1949) "Reminiscences of Mayar Khela" প্রবন্ধে মায়ার খেলার প্রথম অভিনয় ও অন্যান্য প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন—

"Anno Domini 1888. …How far away it all seems, almost like another birth in another planet. …The poet flung down upon a bed, slate in hand, humming to himself whilst composing the songs of *Mayar Khela* on the top-floor of our house at 49 Park Street, where he was staying at the time with my aunt and her first-born Bella…; The Fancy Fair held in connection with the first performance of *Mayar Khela* at the request of Mrs. P. K. Ray. to whom it is dedicated, in the spacious quadrangle of Bethune College, in

aid of the Sakhi Samiti (Women's Friendly Association for the training of indigent girls. started by my aunt Swarnakumari Devi, the wellknown authoress, in 1883) ; the flower-stall I held on the occasion ; the scent and sight of those yellow roses (my favourite flower), wrapped in tissue-paper and decked with maiden-hair ferns seem to be wafted still "through the corridors of time" ;···the actual performance itself, in which all the parts were taken by girls of the family, some dressed up as "boy-friends" to suit the occasion in bright-coloured satin *shalwars* and *panjabis* and budding moustaches, so that in some cases the resemblance to their fathers became more marked ; the electric bulbs twinkling like stars on the wand-heads of the Mayakumaris— a childish touch which with all the other old-fashioned stagecraft may perhaps evoke a pitying smile on modern lips :— these are some of the highlights on the subject, cast by memory. Co-education was not common in those days, much less co-acting in a piece like this.···

Later on (I cannot give the exact date) a private performance of *Mayar Khela* was held in our house at Birjitalaos (now the site of the Presidency General Hopital ?)···This particular performance of *Mayar Khela* was distinguished by my two uncles Jyotirindra and Rabindra appearing in the roles of Madan and Vasanta, the Lords of Love and Springtime respectively, instead of the original Mayakumaris. ···I remember being one of the heroines, Shanta···draped in a blue *saree* without a border.···

Since then *Mayar Khela* has been produced several times with various casts, under various directors, and in aid of various objects. The Birjitalao one was the only

performance where raising of funds was not the object, though even in such matters I think the Tagores were pioneers.…The only other public performance of *Mayar Khela* deserving of comment was one confined to family members, in which both sexes freely took part, and which was very successful. I must not forget to mention in this connection how popular the catchy tunes of this opera were with the English people stationed at Satara with my father, and how lustily they used to join in the chorus "Tobe kano, tobe kano"! I believe "Oli barbar" also was much appreciated in England when sung by the poet to his friends; which goes to show that some music at any rate can lay claim to universality.…"

এই রচনার সারাংশ ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী পরবর্তীকালে তাঁর একটি বাংলা রচনাতেও দিয়াছেন (রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থ, ১৩৬৭, নাট্যস্মৃতি অধ্যায়ের "মায়ার খেলা"), দু-একটি নূতন মন্তব্যও তাহাতে সংযোজিত—

"মায়ার খেলার একটি অভিনয় এই বির্জিতলার বাড়ির বারান্দাতেই হয়েছিল, তার বিশেষত্ব ছিল এই যে, মায়াকুমারীদের অভাবে রবিকাকা জ্যোতিকাকা বসন্ত ও মদন সেজে তাদের গান গেয়েছিলেন। আমি এইবার শান্তা সেজেছিলুম। .

"মায়ার খেলার নাম করতে গেলে অনেক কথা মনে আসে। অনেকেই জানেন যে, রবিকাকা শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে সখি সমিতির সাহায্যার্থে এই গীতিনাটিকা রচনা করেন। বেথুন কলেজের প্রশস্ত আঙিনায় এর প্রথম অভিনয় হয়, আমাদের বাড়ির মেয়েরাই অভিনয় করেন। সখাদের বেশ ছিল খুব টকটকে রঙের সাটিনের পাঞ্জাবি ও ধুতি, তার সঙ্গে ঈষৎ গোঁফের রেখা। আর মায়াকুমারীদের হাতের দণ্ডের মুণ্ডে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল আর নিবছিল। বোধ হয় বিলিতী পরীর অনুকরণে। তখন সব বিষয়ে বিলিতী অনুকরণটাই প্রবল ছিল। তার পরে মায়ার খেলা কত উপলক্ষে কত ভিন্ন দল দ্বারা অভিনীত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তবু সে প্রথমের মোহ কাটে না। এখনও মনে পড়ে আমাদের পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির তেতলার ঘরে রবিকাকা একটা

একহারা খাটে উপুড় হয়ে পড়ে বুকে বালিশ দিয়ে স্লেটের উপর মায়ার খেলার গান লিখছেন এবং গুনগুন করে সুর দিচ্ছেন। সে সময়ে কিছুদিনের জন্য তিনি কাকিমা ও বেলাকে নিয়ে আমাদের ওখানে এসে ছিলেন। তখন ওঁরা দার্জিলিং থেকে ফিরে এসেছেন…। পরবর্তী-কালে সরলাদিদি-সম্পাদিত ভারতীর সাহায্যার্থে রবিকাকার নির্দেশে জোড়াসাঁকোর বাড়ির লোকেরা অভিনয় করে টাকা তুলে দেন। তার মধ্যে অমিয়া-বউমা প্রমদা সেজে খুব সুন্দর অভিনয় ও গান করেন।…"

নৃত্যনাট্য মায়ার খেলার জন্য পুনর্লিখিত কিন্তু গ্রন্থে অব্যবহৃত গান

নৃত্যনাট্য মায়ার খেলার জন্য পুনর্লিখিত কয়েকটি গান।

'উক্ত নৃত্যনাট্যের কবি-কর্তৃক সংশোধিত যে পরবর্তী পাঠ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে গৃহীত হয় নাই'; শ্রীকানাই সামন্ত গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে (১৩৫৭) গ্রন্থপরিচয়ে এইগুলির সন্ধান ও এ-সম্বন্ধে তথ্য দিয়াছেন ; তদনুযায়ী ওই গান-গুলির বিবরণ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

১. জীবনে এ কি প্রথম বসন্ত এল।

মায়ার খেলার 'জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত' গানটির বহুশ পরিবর্তিত রূপ।

২. কাছে ছিলে দূরে গেলে

এই গানটির 'কাছে ছিলে…প্রেমানল জ্বলিয়াছে' অংশেই গীতিনাট্য মায়ার খেলার গানটি সম্পূর্ণ— নৃত্যনাট্যের জন্য পরবর্তী অংশ রচিত হয়।

৩. স্বপনলোকের বিদেশিনী

'অনেক দিনের মনের মানুষ' গানের রূপান্তর।

রাজা ও রাণী।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। / ২৫শ্রাবণ ১২৯৬ সাল। / মূল্য ১৲ টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র, উৎসর্গ ইত্যাদি [।৵.], ১৪৯
প্রকাশ [৯ই অগস্ট ১৮৮৯]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / বড়দাদা মহাশয়ের / শ্রীচরণ-কমলে / এই গ্রন্থ / উৎসৃষ্ট / হইল।

এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে যে-চিঠি লিখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি-পুস্তকে'[১] তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

রাজা ও রাণী

রাজা ও রাণী সম্বন্ধে বড়দাদা আমাকে একখানি ছোট চিঠি লিখিয়াছেন। সে চিঠি আমি এইখানে কাপি করিয়া রাখিলাম। আমার নানা রচনা সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিয়াছে কিন্তু কোন সমালোচনায় আমি এত গর্ব্ব অনুভব করি নাই। বড়দাদার কাছ হইতে আসিতেছে বলিয়াই আমার এত বিশেষ গর্ব্ব ও বিশেষ আনন্দ। [শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

---

১ এই খাতাটির প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত ছিল—"ইহাতে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সকলেই (আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ব স্বজন) আপন আপন মনের ভাব—চিন্তা—স্মর্তব্য বিষয় ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন।" খাতাখানি বর্তমানে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত। ইহাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকের সংক্ষিপ্ত রচনা মন্তব্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। এই খাতার কতকগুলি নির্বাচিত অংশ দেশ শারদীয় সংখ্যা (১৩৫২, ১৩৫৩ ১৩৫৪), বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রভৃতিতে বর্তমান সংকলয়িতা-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবি,

আজ আমি "রাজা রাণী" খানা শেষ কল্লুম— Most pathetic— Concentrated essence of Poetry— আমি এরূপ কবিতা ইংরাজিতেও দেখি নাই— যদি কোথাও দেখিয়া থাকি এখন তা' দূরীভূত— বইখানি is really worthy of Immortality.

রাজাটা is of a peculiar character— onesided— out of joint —unreasonable— inconsiderate— স্ত্রীলোকের এইরূপ স্বভাব naturally suit করে কিন্তু পুরুষের—তা শুধু নয়। রাজার— এরূপ character something very awkward— Lyrical versus Dramatic এই যা একটু খোঁচ— নইলে বইখানি Firstclass Poetry.

[দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]
2. 10. 89.

সংস্করণ

১৩০১ সালে রাজা ও রানীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়— তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ—

রাজা ও রাণী। / (দ্বিতীয় সংস্করণ) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও / প্রকাশিত। / ৫৫নং চিৎপুর রোড। / ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ সাল। / মূল্য ১৲ এক টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ [।৵০], ১১২

এই সংস্করণে রচনার বহু সংস্কার হয়, ও অনেকগুলি দৃশ্য বর্জিত হয়, যথা—

প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য। রাজপথ। লোকারণ্য
পঞ্চম দৃশ্য। দেবদত্তের গৃহ। দেবদত্ত, নারায়ণী, রামচরণ, ত্রিবেদী
অষ্টম দৃশ্য। ত্রিবেদীর কুটীর। মন্ত্রী ও ত্রিবেদী

দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য। সিংহগড়। জয়সেনের প্রাসাদ। জয়সেন, ত্রিবেদী ও মিহির গুপ্ত
চতুর্থ দৃশ্য। রাজপথ। ঝড়বৃষ্টি। ত্রিবেদী

তৃতীয় অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য। ত্রিচূড়। ক্রীড়াকানন। সখীগণ, ইলা, কুমার

চতুর্থ অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য। শিবির দ্বার। সুমিত্রা ও সেনাপতি

পঞ্চম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য। কাশ্মীর। হাট। লোকসমাগম

তৃতীয় দৃশ্য। ত্রিচূড়। প্রাসাদ। অমরুরাজ। কুমারসেন

চতুর্থ দৃশ্য। ত্রিচূড়। অন্তঃপুর। ইলা ও সখীগণ

ষষ্ঠ দৃশ্য। অরণ্য। কুমার। সুমিত্রা

সপ্তম দৃশ্য। কাশ্মীর প্রাসাদ। রেবতী, যুধাজিৎ

দশম দৃশ্য। পথপার্শ্বে চণ্ডীমণ্ডপ। বৃদ্ধ ও করমচাঁদ

যে দৃশ্যগুলি রক্ষিত হয় তাহার মধ্যেও অনেক অংশ বর্জিত হয়।

১৩০৩ সালে প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থে'র অন্তর্গত রাজা ও রানীকে ইহার তৃতীয় সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

এই সংস্করণে, দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত অধিকাংশ দৃশ্যই পুনঃসংকলিত হয়, তবে নিম্নলিখিত দৃশ্যগুলি বর্জিত থাকে—

চতুর্থ অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য

পঞ্চম অঙ্ক। সপ্তম দৃশ্য

পঞ্চম অঙ্ক। দশম দৃশ্য

দৃশ্য গ্রহণ-বর্জনের বিচারে এই সংস্করণই বর্তমানে প্রচলিত।[১]

রাজা ও রানীতে গান

রাজা ও রানীতে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে নিম্নলিখিত গানগুলি ব্যবহৃত—

১ ঐ আঁখিরে

২ যদি আসে তবে কেন যেতে চায়

৩ এরা, পরকে আপন করে

৪ বাজিবে সখি, বাঁশি বাজিবে

৫ ঐ বুঝি বাঁশি বাজে

৬ এবার যমের দুয়োর খোলা পেয়ে

৭ আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি

---

১ শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় রাজা ও রানীর বিভিন্ন সংস্করণে পাঠপরিবর্তনের বিস্তারিত একটি পঞ্জী সংকলন করিয়াছেন; রাজা ও রানীর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য নূতন সংস্করণে ওই-সকল পরিবর্তন নির্দিষ্ট ও মুদ্রিত হইবে।

৮ বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে

৯ আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে

রাজা ও রানীর রচনাকাল

ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"রাজা ও রাণী যে একমাসের অনধিক কালে সোলাপুরে[১] রচিত হইয়াছিল এ সম্বন্ধে আপনার বন্ধু বীরেশ্বরবাবু [গোস্বামী] প্রকৃত সংবাদই দিয়াছেন— এবং তিনি বিশ্বস্ত সূত্র হইতে উক্ত সংবাদটি পাইয়াছেন তাহার প্রমাণ এই যে, আমিই তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে এই খবরটি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম।…৯ই অগ্রহায়ণ।১৩০২।"

কবির মন্তব্য

তপতী (ভাদ্র ১৩৩৬) গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"রাজা ও রাণী আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

"সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে— সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে-প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির

---

১ সোলাপুর হইতে রবীন্দ্রনাথ [১৮৮৯ সালে] প্রিয়নাথ সেনকে লিখিয়াছেন—

"ইতিমধ্যে আমার একখানা নাটক শেষ হয়ে গেছে। এখনো নামকরণ করে উঠ্‌তে পারি নি। আমার নিজের ভাল লাগ্‌চে— মনে হচ্চে একটা কাজ করেছি— কিন্তু জানই ত

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ইত্যাদি—

তোমাদের কাছ থেকে বাহবা পেলে তবে বোঝা যাবে। এ নাটকের গল্পটা তোমাদের কাছে কখনো করেছি কি না মনে নেই— যা হোক্ গোপনে রাখ্‌লুম নইলে কৌতূহল অনেকটা চলে যাবার সম্ভাবনা।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ৮, পৃ ৫০

অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হ'লো, এইটেই রাজা ও রানীর মূল কথা।

"রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েচে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে-অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ ক'রেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হ'য়েচে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েচে— এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য্য পরিণাম নয়।

"অনেকদিন ধ'রে রাজা ও রাণীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েচে। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত[১] ক'রে এ'কে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা ক'রেছিলুম। দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির ক'রেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদ্গতি হ'তে পারে না। লিখে[২] এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শোধ ক'রেচি।"

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (বিশ্বভারতী, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৬) রাজা ও রানীর নবরচিত ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

একদিন বড়ো আকারে দেখা দিল একটি নাটক— রাজা ও রানী। এর নাট্য-ভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাজমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্য পরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।

---

১ এই 'সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত' পাঠের নাম হয় 'ভৈরবের বলি', এই নামেই ইহার অভিনয় হয়। এই পাঠ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই— শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে ইহার পরিচয় রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ (বৈশাখ ১৩৭৩) পত্রিকায় ও স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশ করিয়াছেন।

২ তপতী (ভাদ্র ১৩৩৬)

প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য ক'রে লেখা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত ক'রে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা॥

রাজা ও রানীর এই ভূমিকার পাণ্ডুলিপিতে প্রথম অনুচ্ছেদটি এইরূপ ছিল—

"তারপরে যে নাটক দেখা দিয়েছে সে হচ্ছে রাজা ও রানী। এর রচনাতেও আছে দুটো ধারা। এর নাট্য-ভূমিকায় প্লাবন হয়েছে লিরিকের। সেই লিরিকে রসাবিষ্ট হয়ে এর নাট্য হয়েছে দুর্বল। যেমন করে সৃষ্টি হয় জলাজমির। গীতিকাব্যিক আপনাকে ভুলতে পারে নি, জিনিসটা দাঁড়িয়েছে ইংরেজিতে যাকে বলে মেলোড্রামা। ইলা এবং কুমারের উপসর্গটা একেবারেই অসংগত। সেটা শোকাবহ নয় শোচনীয়। তরুণ লেখকের মধুর রসাসক্ত মনটা ছিল নিতান্তই কাঁচা। কেবল এই নাটকে যেখানে দেখানো হয়েছে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, তাকেই আমি ভালো বলি এবং বলি যথার্থ নাট্যপরিণতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুমারের মুণ্ডপাতে এই নাটকের মুণ্ডপাত হয়ে গেছে।"

রাজা ও রানীর প্রথম অভিনয়

ইন্দিরা দেবী তাঁহার রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থের (১৩৬৭) নাট্যস্মৃতি বিভাগে লিখিয়াছেন—

"রাজা ও রানী…প্রথম অভিনয়ের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। কলকাতার সেণ্ট পল্‌স্‌ ক্যাথিড্রালের লাগাও জমিতে তখন একটি বিরাট পুকুর ছিল। তাকে লোকে বলত বির্জিতলাও। তারই সামনে বর্তমান প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের জমিতে বির্জনি-রাজার একটি পুরনো বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়ে বহুদিন ছিলুম। বাড়িটি জীর্ণ হলেও তার সঙ্গে আমাদের সেকালের অনেক সুখস্মৃতি

জড়িত। তারই একতলায় চওড়া বারান্দায় স্টেজ বেঁধে প্রথম রাজা ও রানীর অভিনয় হয়। তার পাত্রপাত্রী ছিল এইরকম—

বিক্রম	রবিকাকা
সুমিত্রা	মা
দেবদত্ত	বাবা
নারায়ণী	কাকিমা : মৃণালিনী দেবী

মা খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন শুনতে পাই। পরদিন বঙ্গবাসী কাগজে 'ঠাকুরবাড়ির নতুন ঠাট' বলে একটি শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ বেরল। তাতে উক্ত পাত্রপাত্রীর তালিকা এবং পরস্পরের সম্পর্ক পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া ছিল। বলা বাহুল্য, বাবা এ-সব সমালোচনায় ভ্রূক্ষেপও করলেন না। মনে হয় এই অভিনয়েই উনি [প্রমথ চৌধুরী] কুমার, এবং প্রতিভাদিদি ইলা সেজেছিলেন।"

অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'য় (১৩৪৮) 'রাজা ও রানী' প্রথম অভিনয়ের ও এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে উহার অভিনয়ের পরিবেশের কৌতুককর বিবরণ দিয়াছেন ; প্রথম অভিনয়ের কুশীলবদের তিনি যে তালিকা দিয়াছেন তাহা একটি ক্ষেত্রে ইন্দিরা দেবী প্রদত্ত তালিকা হইতে স্বতন্ত্র— অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতি অনুযায়ী ইলা-চরিত্রে অভিনয় করিয়াছিলেন প্রিয়ম্বদা দেবী। অবনীন্দ্রনাথ কিছু অতিরিক্ত সংবাদও দিয়াছেন— "ত্রিবেদী অক্ষয় মজুমদার···সেনাপতি নিতুদা [নীতীন্দ্রনাথ]···আর আমরা অনেকেই ছোটোখাটো পার্ট নিয়েছিলুম জনতা, সৈন্য, নাগরিক, এই-সবের। আমার ছয়-ছয়টা পার্ট ছিল তাতে।"

রাজা ও রানী ॥ সমসাময়িক সমালোচনা

রাজা ও রানীর দুইটি সমসাময়িক সমালোচনা বর্তমানে সুপরিচিত। একটি কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী -লিখিত 'মানসী এবং রাজা ও রাণী',[১] সাহিত্য, বৈশাখ ১২৯৮ ; অপরটি, কবি নিত্যকৃষ্ণ বসুর দিনলিপিতে বিক্ষিপ্ত মন্তব্য, এগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর 'সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী'র অন্তর্গত হইয়া 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়।[২] প্রথম রচনাটিতে নাটকটির বিশেষ প্রশংসা আছে এবং কোনো কোনো সমালোচনার পরোক্ষ উত্তর আছে ; পরিশেষে লেখিকা

---

১ শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় -কর্তৃক 'রবীন্দ্র-সাগরসংগমে' গ্রন্থে (১৩৬৯) সংকলিত।

২ এই মন্তব্যগুলির অধিকাংশ শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ১৩৬৮ বৈশাখ সংখ্যা

বলিয়াছেন, "'রাজা ও রাণী' ভাবের গাম্ভীর্য্যে, শব্দমাধুর্য্যে ও পূর্ণপ্রাণতায় সাহিত্য-সংসারে একখানি উচ্চদরের গ্রন্থ। আমরা রবীন্দ্রবাবুর নিকটে এক্ষণে গীতিকবিতা অপেক্ষা এইরূপ গ্রন্থের অধিক আশা করিয়া থাকি।"

দ্বিতীয় আলোচনাসমষ্টি এরূপ অনুকূল নহে; নিম্নে সেগুলি মুদ্রিত হইল—

৮ই বৈশাখ। [১৩০১] "রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের আলোচনা প্রায়ই করিয়া থাকি। আজও উহার পাতা উল্টাইয়া এখানে সেখানে দেখিতেছিলাম। সমগ্র পুস্তকের মধ্যে চারিটি কি পাঁচটির বেশী ভাল এবং Spirited passage নাই। আমি সেই চারি পাঁচটি স্থল সর্ব্বদাই পাঠ করিয়া থাকি।...আমি আজ তাঁহার অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে আপত্তি করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ একদিন স্বীকার করিয়াছিলেন বটে যে, তিনি অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে যে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সমীচীন নহে।[১] তথাপি মনের ভিতর আজ যে কথাটা জাগিতেছে, তাহা লিখিয়া রাখায় কোন দোষ নাই। রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর অধিকাংশস্থলেই চতুর্দ্দশাক্ষরপরিমিত মাপ-কাটির সাহায্যে কাটিয়া লওয়া সাধারণ গদ্যমাত্র। বাক্যের আরম্ভ ও শেষ সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই দৃষ্টিহীন। মাঝখানটাকেও সব সময় বাদ দেওয়া যায় না। স্বীকার করি, গল্পের গদ্যময় সামান্য অংশগুলাকে কাব্যের ভাষায় আবৃত করা অনেক সময়েই অসম্ভব। আর অসম্ভব না হইলেও তাহা সর্ব্বস্থলে বাঞ্ছনীয় নহে। উহাতে ভাষা যেন কতকটা কৃত্রিম (affected) হইয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি, আমার বিশ্বাস যে, কবি সাবধান হইলে উভয় দিক বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন।"[২]

'শনিবারের চিঠি'তে 'ডায়েরিতে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' নামে সংকলন করেন; একটি নির্বাচিত অংশ পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-সাগরসংগমে গ্রন্থেও মুদ্রিত হইয়াছে।

১ ২ মাঘ [১৩০০] সকালে সু-র [সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ?] বাটীতে রবি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ......"প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্ত্তব্য" "প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ" "রাজার সতর্কদৃষ্টি পড়ুক সর্ব্বত্র" ইত্যাদি লাইনে ছন্দের ঝঙ্কার আদৌ নাই, ইহা তিনিও স্বীকার করিলেন; আর বলিলেন, "অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে আমি একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা ঠিক নহে, আমার ভ্রম।"—সাহিত্যসেবকের ডায়েরী, সাহিত্য।

২ সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১০

১৫ই বৈশাখ। [১৩০১] "রাজা ও রাণীর অধিকাংশ চরিত্রই কতকটা রহস্তময়। যেন আগাগোড়া সঙ্গতি নাই।... নাটক লিখিতে হইলে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির প্রয়োজন ; রবীন্দ্র বাবু আপনাকে ভুলিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার চরিত্রগুলিতে তাঁহাকেই ছদ্মবেশে দেখিতে পাওয়া যায়।"[১]

রাজা ও রানীর বহুপরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ (৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) প্রকাশিত হইলে নিত্যকৃষ্ণ বসু পুনরায় লেখেন—

২৮শে শ্রাবণ। [১৩০১] রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সংস্করণ "রাজা ও রাণী" দেখিলাম। ইহাতেও সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের প্রয়াস দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু সকল স্থলে সংশোধনগুলি সমীচীন নহে। বর্ত্তমান সংস্করণে সঙ্গীত ও গদ্যাংশগুলি প্রায়শঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা মন্দ নহে। গ্রন্থের গল্পাংশে কোনও পরিবর্ত্তনই সংসাধিত হয় নাই। অমিত্রাক্ষরের উন্নতিসাধন করিতে গিয়া কবি অনেক স্থলেই খারাপ করিয়া ফেলিয়াছেন। "এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথসাগরে" এই ছত্রের পরিবর্ত্তে "এ নিস্তব্ধ অন্তরের অনন্ত নিশীথে" এই কটমট লাইনটি দেখিয়া আমি উন্নতির স্থলে অধোগতিই অনুভব করিলাম। রবিবাবু আপন রচনা সম্বন্ধে আগে যেরূপ অন্ধ ছিলেন, এখন দেখিতেছি, তিনি ততোধিক মমতাবিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। কাটিয়া, ছাঁটিয়া, উড়াইয়া, গুঁড়াইয়া তিনি যেন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এত দূর নির্ম্মম হইয়াও তিনি যে সর্ব্বত্র সুবুদ্ধি ও সুবিচারশক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। তাঁহার নাটকীয় পাত্রপাত্রী সম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অথচ, কয়েকটি ভাল লাইন মাঝখান হইতে মারা গেল।... পূর্ণ বিরামের স্থলে গুরু অক্ষর (যুক্তাক্ষর) ব্যবহার বিষয়ে আমি যে আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহার সুফল ফলিতে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। "রাজার সতর্ক দৃষ্টি পড়ুক্ সর্ব্বত্র" ইহার স্থলে "রাজার নিয়ত দৃষ্টি সর্ব্বত্র পড়ুক" তবু সহ্য যায়। কিন্তু এত করিয়াও রবীন্দ্র বাবু তাঁহার ভাষাকে নির্দ্দোষ করিতে পারিলেন না।"[২]

কবি রজনীকান্ত সেন 'রাজা ও রানী'কে কী দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এখানে তাহা উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অবান্তর হইবে না।

রজনীকান্তের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত রবীন্দ্রনাথের প্রতি রজনীকান্ত—

১ সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১০

২ সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী'

আর একবার যদি 'দয়াল' কণ্ঠ দিত, তবে আপনার 'রাজা ও রাণী" আপনার কাছে একবার অভিনয় করে দেখাতেম। আমি 'রাজা'র অভিনয় করেছি। অমন কাব্য, অমন নাটক কোথায় পাব? রাজার পার্ট আজও আমার অনর্গল মুখস্থ আছে। আমার মাথা যেমন ছিল তেমনি আছে—

'এ রাজ্যেতে—
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?'

একবার দেবতাকে শোনাতে পারলাম না।...[১]

অপর দুইজন কবি 'রাজা ও রানী' পাঠে, ওই নাটকের বিভিন্ন চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'ইলা' চরিত্র সম্বন্ধে কবিতা—

ইলা

(রবীন্দ্র বাবুর 'রাজা ও রাণী' পাঠ করিয়া)

কবিচিত্ত-নন্দনেতে, সুমিত্রা ভামিনী,
ফুল্ল মৃণালিনী যেন, রবির দুলালি!
হে ইলা, হে কুমারের, চির সোহাগিনি,
তুমি কি লো অতি মৃদু যূথিকা বৈকালী?
তুই কি বন-মালতী, কানন-বাসিনি?
তুই কি লো ক্ষুদ্র কুন্দ, মল্লিকার আলি?
না—না—ইলা—তুই চির-আনন্দদায়িনী;
শরৎ-মুকুট-শোভা, সুন্দর সেফালি!
কঠিন কঠোর শাখে জনম লভিলি;
জোছনার আবছায়ে, মরম খুলিয়া,
শাদা প্রাণে, রাঙা ঠোঁটে, হাসিয়া, কাঁদিয়া,
নিশান্তে, অশ্রুর সাথে, ঝরিয়া পড়িলি?

---

১ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, 'কান্ত কবি রজনীকান্ত'

আমি পান্থ, যেতেছিনু বনপথ দিয়া,
মোরো প্রাণে অই বাস গেল জড়াইয়া!
—ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৭, "কবির অ্যালবম"।

সরোজকুমারী দেবী[1] রাজা ও রানীর সাতটি চরিত্র অবলম্বনে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—

রাজা ও রাণী

(বিক্রমদেব)

ধরাতলে মূর্ত্তিমান প্রণয় আপনি,
আপনা হারান ভোলা এসেছ কি ভুলে?
বিবশ বিভুল চোকে কি যে ও চাহনি!
চঞ্চল তরঙ্গ খেলে হৃদি উপকূলে!

হৃদয়ের দেবী সে ত দিলেনাক ধরা,
কেন তুমি ফির পিছে প্রেম-ফাঁসি নিয়ে?
এই ত প্রেমের রীতি শুধু আত্মহারা,
পূজিবে চরণ তার নিজ হিয়া দিয়ে।

যোগাসনে যোগধ্যানে লীন যোগীবর,
তাঁর কাছে কোথা আছে সংসার বাসনা?
প্রেম-যোগী তবে কেন হৃদয়ের পর,
দারুণ প্রলয় এত এ তীব্র বেদনা?

---

১ সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬) নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগিনী; ইনি তিনখানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন— হাসি ও অশ্রু (১৩০১); অশোকা (১৩০৮); শতদল [১৯১০]। দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে নারী', বিশ্বভারতী, ১৩৫৭।

রাজা ও রানী প্রসঙ্গে কবিতাগুলি হাসি ও অশ্রু গ্রন্থে সংকলিত। ওই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত এগুলি সংকলন করিয়া দিয়াছেন— তৎপূর্বে শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় এই কবিতাগুলির অস্তিত্ব বিষয়ে সংকলয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দাঁড়াও সমাধি পরে প্রেম সিন্ধু কূলে,
ভোলা তুমি পূজা কর আপনারে ভুলে।

(সুমিত্রা)

গরবিনি ছেড়ে এলে কিসের গরবে ?
জ্বালালে অনল শুধু শান্ত রঙ্গভূমে ;
এ মধু রহস্য মাখা সুবিশাল ভবে,
সকলি আচ্ছন্ন যে গো মায়াময় ঘুমে।
ক্ষুদ্র নারী, এত বীর্য্য কেন হৃদে তার ?
ঝরে যাবে ক্ষুদ্র এক ঝটিকা পরশে,
তোমাদের ও হৃদয় ভালবাসিবার,
ভালবেসে নিরাশায় পড়িবে গো খসে।
ত্যেয়াগি সুখের ঘর, প্রেম শান্তিময়,
এলে কি না মরুভূমে শান্তি অন্বেষণে !
প্রখর রবির তাপে সব জ্বলে যায়,
সেথায় বরষাবারি পাবে কোনখানে ?

রমণীর ক্ষুদ্র প্রাণ ভালবাসিবার,
এত বীর্য্য সবে বল কোন খানে তার ?

(কুমার)

পুরুষের মত হৃদি— কঠিনে মধুরে !
প্রেম আছে ক্ষমা আছে বীর্য্য আছে তায় ;
আকুল আগ্রহ নাই যৌবনের তীরে,
প্রশান্ত জলধিসম সবি স্থির প্রায়।

কত তৃণ কুটা ভাসে উপরে তাহার,
ডুবে যায় সেই ক্ষণে গভীর অতলে ;
নিরমল শান্তিময় স্থির পারাবার,
কি পবিত্র মূর্ত্তিখানি ভরা কূলে কূলে !

পড়েনি কলঙ্ক রেখা ও হৃদয় আগে,
তবু কেন এত লাজ সন্দেহের ঘোর ;
যদি সে তেমনি ধারা ভুলে অনুরাগে,
পরাণে না সঁপে আসি প্রেমময় ডোর ?

এ সংসার লীলাময় শুধু কি গো ছলা !
সে যে মূর্ত্তিমতী দেবী তোমারি সে ইলা !

(ইলা)

বসন্তের নব চারু লজ্জাবতী লতা,
আপনি নুইয়া পড় আপনার ভারে ;
ললিত তনুতে বাজে পরশের ব্যথা,
আঁখির দিঠিতে, হায়, পড়িতেছে ঝরে !

তরুরে জড়ায়ে সদা থাক অনুরাগে,
আশ্রয় ভাঙ্গিয়া গেলে ঝরিবে আপনি,
বাজিছে প্রাণের বীণা কি বাসন্তী রাগে,
শ্যামল কাননে বুঝি বন বিহগিনী ?

বহিছে বৈশাখী ঝড় আঁধার সকলি,
কি দাপটে সমীরণ, উজলে চপলা ;
তরুরে কে নিলে ছিঁড়ে হৃদয়টি দলি,
ধুলায় লুটায়, মরি একাকিনী বালা !

ঝরিছে মুষল-ধারে বুঝি বারিধারা,
আঁধারে হারায়ে গেছে নয়নের তারা !

(দেবদত্ত)

এ সংসারে বিষ শুধু রমণী অধরে !
রাজা, শাস্ত্র বশ করা সোজা নহে কভু ;

বন্ধুত্বের শান্তি ছায়ে কি অমৃত ঝরে,
অভাগা মানব তাহা বোঝেনাত তবু !

তা না হলে কভু কি গো অন্ধ কারাগারে,
পোহাত তোমার সুখ-বরষা যামিনী ?
ভস্মাবৃত হীরাখণ্ডে বারেক না ফিরে
দেখিল বায়স, কোথা উড়িল না জানি !

তোমার হৃদয় চির বসন্ত কানন,
কোয়েলা দোয়েলা শ্যামা দিতেছে ঝঙ্কার
বিরহ তোমার ভয়ে লুকায় আনন,
মিলন হরষে তান ধরে আপনার !

যথার্থ যা বিধিদত্ত মধুর বন্ধুত্ব ।
গোপন পরাণে তব আছে দেবদত্ত !

(শঙ্কর)

সে শুভ্র পলিত কেশ জানায় তাহার
অতীতের সুখময় কাহিনী সকলি ;
বুঝায় ভবিষ্য ছবি শান্ত পারাবার,
তীরে আছে দাঁড়াইয়া যাবে ধীরে চলি ।

আজন্ম সে প্রভুভক্ত বৃদ্ধ হল, হায়,
এ দুর্দ্দশা তবু চোকে হেরিতে চাহে না ;
নিজ সিংহাসনপরে শত্রু হেসে চায়,
সেথানে নোয়াবে শির ? হা ধিক বাসনা !

"তার চেয়ে মৃত্যু ভাল" পাষাণ কঠিন,
হৃদয়-বিদার কণ্ঠে কহিল কাতরে ;

সে আকুল স্বর হল শূন্যেতে বিলীন,
অশ্রুসিক্ত মুখে কেহ চাহিল না ফিরে ;

চাহিলেন ফিরে শুধু নিখিল দেবতা,
রাখিলেন মান তার বুঝিলেন ব্যথা !

(রেবতী)

কি ঈর্ষা-মুরতি জ্বলে রমণী নয়ানে !
কি যে রাজ্য সিংহাসন পেতেছে হৃদয়ে ;
বিমাতা রাক্ষসী যেন আপন সন্তানে
মারিয়া শোণিত পিয়ে তিয়াষা মিটায়ে।

নির্ব্বোধ রাজার কর্ণে মন্ত্রবাণী, হায়,
পুনঃ পুনঃ গোপনে সে ঢালিছে সোহাগে,
রূপসীর জ্যোতির্ম্ময় রূপের শিখায়,
মন্ত্র-বশীভূত সবি, ঢলি অনুরাগে।

তীব্র কটাক্ষের সেই সুতীক্ষ্ণ চাহনি,
হৃদয় বিঁধিতে পারে ভুলাবে না আঁখি ?
কি যে সুধা ঝরে, হায়, সে মুখের বাণী !
ভেসেছে নরক স্রোতে তারে ভর রাখি !

রমণী সংসার-প্রাণ, দেবী সে রমণী,
তারি প্রাণে এ নিরয় কি ক'রে না জানি !

রাজা ও রানীর অপ্রকাশিত সংস্করণ 'ভৈরবের বলি'

১৯২৯ সালে গগনেন্দ্রনাথ রাজা ও রানীর অভিনয়ের আয়োজন করিলে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির "কিছু কিছু রূপান্তর সাধন করিয়া" দেন ; 'ভৈরবের বলি' নামে ইহার অভিনয় হয়। এই-সকল সংস্কার রাজা ও রানীর কোনো মুদ্রণে গ্রন্থভুক্ত হয় নাই, পাণ্ডুলিপি আকারেই নিবদ্ধ আছে ; রাজা ও রানীর

রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই শেষ সংস্করণে, যোগ-বিয়োগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পাণ্ডুলিপির সাহায্যে লিপিবদ্ধ হইল।

তিনটি পাণ্ডুলিপি বা স্টেজ-কপিতে এই-সকল পরিবর্তন নির্দিষ্ট আছে—

১॥ প্রথমে একখণ্ড রাজা ও রানী গ্রন্থে (প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, মুদ্রাকর শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র, ইণ্ডিয়ান প্রেস) রবীন্দ্রনাথ অনেক অংশ বর্জন করিয়া নাটকটি অপেক্ষাকৃত সংহত করেন; চারিটি স্থলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ নূতন সংলাপ স্বতন্ত্র কাগজে লিখিয়া যোগ করিয়া দেন; গ্রন্থের মার্জিনেও অনেক স্থলে কিছু কিছু যোগ করেন। এই বইখানি বর্তমান সংকলয়িতার নিকট রক্ষিত আছে।

যে চারি স্থলে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র কাগজে নূতন অংশ যোগ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার দুইটি কাগজ রক্ষা পাইয়াছে, অন্য দুইটি পৃষ্ঠা স্খলিত।

অতঃপর পাণ্ডুলিপি বলিতে এই সংশোধিত বইটি উল্লিখিত। নূতন যোগগুলি এই পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত; ব্যতিক্রমস্থলে তাহা স্বতন্ত্র উল্লিখিত।

২॥ ভৈরবের বলি অভিনয়ার্থ রাজা ও রানীর সংশোধিত পাঠ অনুসরণে প্রস্তুত স্টেজ-কপি। ইহা বর্তমানে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আছে।[১]

পাণ্ডুলিপি হইতে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিখিত যে দুইটি পৃষ্ঠা স্খলিত, অপর কাহারো হস্তাক্ষরে লিখিত তাহার কপি ইহাতে পাওয়া যায়।

এই খাতাটি প্রস্তুত হইবার পর তাহার মার্জিনে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে আরো কিছু যোগ করেন। আবার, মূল নাটকের যে-সকল অংশ পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত তাহারও কোনো-কোনো অংশ এই খাতাটিতে বর্জন করেন। কোনো কোনো স্থলে তাঁহার হস্তাক্ষরে স্টেজ-ডিরেকশনও আছে, যেমন 'আলো নেবানো ও জ্বালানো'।

"অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কের পরিবর্তনকালে রঙ্গমঞ্চে চিত্রপট ওঠানো নামানো" সম্বন্ধে ভৈরবের বলি শীর্ষক একটি ভূমিকা, যাহা অভিনয়পত্রীতে মুদ্রিত হয়, কবির হস্তাক্ষরে এই খাতাটিতে আঁটা আছে।

১ ইহা অবলম্বনে শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য "রবীন্দ্রনাথের ভৈরবের বলি", বৈতানিক প্রকাশনী, বৈশাখ ১৩৭৫।

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে বর্তমান আলোচনাতেও এই স্টেজ-কপিটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩॥ এই স্টেজ-কপির অনুরূপ আর-একটি স্টেজ-কপি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। এই খাতায় আরো কিছু পরিবর্তন পরিবর্জন আছে; তাহা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে, সহজেই অনুমান করা যায়। কোনো-কোনো স্থলে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর আছে।

৪॥ ভৈরবের বলি আলোচনায় ব্যবহার্য অপর একটি উপকরণ, অভিনয়ের প্রোগ্রাম বা অভিনয়পত্রী। ইহাতে অঙ্ক ও দৃশ্য -বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে ও বিভিন্ন অঙ্কের পাত্রপাত্রীগণের তালিকা আছে। বিভিন্ন অংশের ঘটনাস্থল, জালন্ধর, ত্রিচূড় ও কাশ্মীর, নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। পরিশেষে এই অভিনয়ে ব্যবহৃত গানের তালিকা দেওয়া হইয়াছে— দেখা যায় রাজা ও রানীর কয়েকটি গান এই অভিনয়ে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কয়েকটি গান নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

চিত্রপট ওঠানো-নামানো সম্বন্ধে অভিনয়পত্রীতে মুদ্রিত কবির যে মন্তব্যের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে নিম্নে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল—

ভৈরবের বলি

অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কের পরিবর্তনকালে রঙ্গমঞ্চে চিত্রপট ওঠানো নামানো আমার মতে অনাবশ্যক। এইরূপ সন্ধিস্থলে একবার আলো নিবাইয়া পুনরায় আলো জ্বালাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট। নাট্যাভিনয়ে দৃশ্যবিভ্রম উৎপাদনের চেষ্টা সাহিত্যের প্রতি অত্যাচার— উহা ছেলেভোলানো খেলা। প্রাচীন ভারতে বা গ্রীসে উহা ছিল না। তখন নটদিগের ও দর্শকদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নাটকের সাহিত্যগত নাট্যবস্তুর প্রতি।

রাজা ও রাণী কিছু কিছু রূপান্তর সাধন করিয়া এই নাটকটি রচিত।

২৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯২৯

ভৈরবের বলির জন্য নবলিখিত অংশ

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য।[১] বিক্রমদেব ও দেবদত্তের কথারম্ভের ('দেব।

---

১ এই বিবরণে সর্বত্র যে অঙ্ক ও দৃশ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা রাজা ও রানীর প্রচলিত সংস্করণ অনুযায়ী। ভৈরবের বলিতে দৃশ্য-বর্জন, দৃশ্য-সংক্ষেপণ ও অন্য দৃশ্যের সহিত যুক্তকরণের ফলে তাহার অঙ্ক ও দৃশ্য -বিভাগ অন্যরূপ।

মহারাজ, একি উপদ্রব!') পূর্বে নিম্নলিখিত অংশ বসিবে, মূল পাণ্ডুলিপি হইতে ইহা মুদ্রিত হইল ; উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাস্থল 'জালন্ধর-প্রাসাদের এক কক্ষ' পরিবর্তনান্তে হইয়াছে 'জালন্ধর-প্রাসাদ উদ্যানের প্রান্তে পুরোহিতের কুটীর। তার সম্মুখে পথ'— দেবদত্ত ও নারায়ণীর নিম্নমুদ্রিত কথোপকথনের পর বিক্রমদেবের প্রবেশ।

নারায়ণী। ওগো আমার কথাটা শোনো।

দেব। প্রিয়ে, বিধাতা যেদিন তোমাকে বচনশক্তি দিয়েচেন তার পূর্ব্বেই আমাকে শ্রবণশক্তি দিয়ে সমস্ত প্রস্তুত করে রেখেছেন— তুমি কথা কইলে আমার না শুনে উপায় নেই।

নারায়ণী। তোমার ঐ পুঁথিটা রাখো দেখি।

দেব। পুঁথির প্রতি ঈর্ষা কোরোনা বাগ্‌বাদিনী। ও আমার কোলে পড়ে থাকে মাত্র কিন্তু কথা কইতে জানেনা। আমার ঘরে তোমারই কণ্ঠস্বরের জয়। যা বলবার আছে বলে ফেল।

নারায়ণী। কালভৈরবের পূজা আজ, তোমাকে মহারাজ না কি পুরোহিত করেচেন? এ বুদ্ধি তাঁকে দিলে কে?

দেব। এটা স্ত্রীবুদ্ধি।

নারায়ণী। মহারাণী সুমিত্রার পরামর্শ বুঝি।

দেব। তিনি তোমার মতো আমাকে এত বেশি জানেননা— তাই ব্রাহ্মণকে এখনো শ্রদ্ধা করেন। আজকের এই কালভৈরবের পূজা বিশেষ করে তাঁরই। এর যত কিছু ব্যয় তিনিই জোগাবেন।

নারায়ণী। তা হোক্— এ কাজ তুমি নিতে পারবে না।

দেব। বল কি ব্রাহ্মণী, পুঁথিও পড়ব না, পূজাও করব না, এই ব্রাহ্মণজন্ম একমাত্র তোমার সেবাতেই কাটবে।

নারা। ত্রিবেদী ঠাকুরকে ডিঙিয়ে তুমি যদি পুরোহিতের পদ নাও তবে তাঁর শাপ লাগবে।

দেব। কিন্তু দক্ষিণার কথাটা ভুলচ, ঠাকরুণ। লোকে যে আমাকে নির্ব্বোধ বলবে।

নারা। তা হোক্, ঐ রাজা আস্‌চেন,— আমার নাম করে তুমি ওঁকে—

দেব। তোমার নাম করতে পারব না। আমার স্ত্রী আমার বুদ্ধি হরণ

করেচেন এ কথা বাইরে রটতে দেব না। আমার সৃষ্টিকর্তার উপরে দোষ পড়ুক তোমার উপরে না। (নারায়ণীর প্রস্থান)

রাজা ও রানীর প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে দেবদত্ত ও নারায়ণীর কথোপকথনের ("নারায়ণী। মিছে না। ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নেই") পরে দেবদত্ত ও নারায়ণীর নিম্নমুদ্রিত নূতন কথোপকথন যোগ করা হইয়াছে ; মূল পাণ্ডুলিপি হইতে ইহা গৃহীত হইল। ইহার পরে চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেবদত্ত-নারায়ণী সংলাপ, একটি অংশ বর্জনপূর্বক, এখানে আনা হইয়াছে। অর্থাৎ নাটকের দুইটি বিভিন্ন দৃশ্যে দেবদত্ত-নারায়ণী-সংবাদ, নূতন অংশ যোগে, একটি দৃশ্যে পরিণত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই দেবদত্ত-নারায়ণী-সংবাদ ভৈরবের বলিতে স্থানান্তরিত, দ্বিতীয় স্টেজ-কপিতে সম্পূর্ণই বর্জনচিহ্নাঙ্কিত ; কিন্তু অভিনয়পত্রী দৃষ্টে ("প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য। দেবদত্ত ও নারায়ণী") অনুমান হয় এই দেবদত্ত-নারায়ণী-সংবাদ অভিনয়কালে বর্জিত হয় নাই।

দেব। শোনো শোনো।

না। আবার কি শুনব ? যা শোনবার তা শুনেছি। আরো কিছু বাকি আছে না কি ?

দেব। আসল কথাটাই বাকি।

না। বাজে কথা না বলে সেটাই গোড়ায় বল্‌লেই ত হত।

দেব। সংসারে আসল কথাটাতেই কাবু করে। সেইটেকে নরম করে আনতে হয় বাজে কথা দিয়ে। তবে বলি শোনো, একটু গোলমাল বেধেচে।

না। তা বুঝেচি তা নইলে তুমি আমার সঙ্গে অসময়ে হাসি তামাসা করতে আসবে কেন। ঐটে তোমার বদ অভ্যেস।

দেব। ঐ অভ্যেসটা আছে বলেই বেঁচে আছি। কলিকে শনিকে তাড়াবার প্রধান উপায় তাদের হেসে তাড়ানো। রাজা চলেচেন যুদ্ধ করতে।

না। কার সঙ্গে ?

দেব। সেটা তিনিও জানেন না, কিন্তু আমি জানি।

না। যা কেউ জানে না তা তোমার জানবার দরকার কি ? নাই জানলে। আগেভাগে অমঙ্গলের কথাগুলো মনে মনে ঠাওরাবার বিদ্যেটা তুমি ছাড়ো।

দেব। আগে যা ঠাওরানো যায় পরে তার ধাক্কাটা সহজ হয়। আমি বলে দিচ্চি শেষকালটায় রাজার যুদ্ধ বাধবে কুমারসেনের সঙ্গে।

১না। হাঁ গা, সে কি কথা? তিনি যে মহারাণীর ভাই। শ্যালার সঙ্গে যুদ্ধ? বোধ করি রাজায় রাজায় এই রকম ঠাট্টাই চলে। আমরা হলে শুধু কানমলে দিতেম।

দেব। প্রেয়সী, রাজকীয় চালে কানমলাকেই ভদ্রভাষায় বলে যুদ্ধ। মহারাণী নিশ্চয় তাঁর ভাইয়ের কাছে আশ্রয় নিতে গেছেন। এই নিয়ে আগুন জ্বল্‌বে। অতএব প্রিয়ে, অনুমতি করো, দাস বিদায় হয়।

না। অতএবের দরকার কি তোমার? যাও না। আমি তোমাকে বেঁধে রেখেছি না কি?২

রাজা ও রানীর তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে পুরুষবেশী সুমিত্রার সহিত শঙ্করের কথোপকথনে

'তুমি বুঝি
তাহারি অতীত স্মৃতি বাহিরিয়া এলে
আমারি হৃদয় হতে আমারে ছলিতে।'র পর

নবলিখিত অংশ নীচে সৌম্যেন্দ্রনাথ-সংগ্রহ স্টেজ-কপি হইতে মুদ্রিত হইল; পাণ্ডুলিপিতে এই অংশের নির্দেশ আছে, কিন্তু কাগজটি নাই।

[শঙ্কর] কি সংবাদ নিয়ে এলে বৎস কহ মোরে।

সুমিত্রা। কাশ্মীরের পঙ্গপাল রাণীর আত্মীয়
জালন্ধর করিতেছে অন্নহীন তারা।
সুমিত্রার শির নত হল।

শঙ্কর। ধিক্ ধিক্!
দিক সবে দূর করে জালন্ধরপতি।

সুমিত্রা। বিদ্রোহী হয়েছে তারা। কুমারের কাছে
রাণী তাই পাঠাল আমারে। ইচ্ছা তাঁর—
কাশ্মীরের অস্ত্র যেন কাশ্মীরের গ্লানি,
বিষব্রণ সম কেটে দেয় দূর করে।

---

১ নারায়ণীর এই উক্তি রাজা ও রানীর চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের ভৈরবের বলিতে বর্জিত অংশ হইতে গৃহীত।

২ নারায়ণীর এই উক্তি, ও পূর্ব ছত্রে দেবদত্তের উক্তির শেষাংশ রাজা ও রানীর চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য হইতে গৃহীত।

কাশ্মীরের রাজপুত্র এ আরোগ্যভার
নিজ হাতে লয় যদি তবে লজ্জা কাটে।

শঙ্কর। সুমিত্রার অনুরোধ রাখিবে কুমার,
নাহিক সন্দেহ। কাশ্মীরের অপরাধ
কাশ্মীর আপন হাতে করিবে ক্ষালন।
শুনেছিনু এ বৎসর সুমিত্রা আপনি
কালভৈরবের পূজা করেছে সাধন।
কহ বার্ত্তা তার।

সুমিত্রা। সে পূজা হয়েছে সাঙ্গ;
অর্ঘ্য তার, বলি তার রাখে নাই বাকি।[১]

শঙ্কর। এস বৎস মোর ঘরে লইবে আশ্রয়।
নাহি জানি কেন এত স্নেহ আসে মনে
তোমা পরে; যেন তুমি চিরপরিচিত,
যেন চিরজীবনের আদরের ধন।[২]

পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে লোকসমাগম-দৃশ্যে মুদ্রিত অংশের সূচনাতেই একটি নূতন অংশ বসানো হইয়াছিল। পাণ্ডুলিপিতে ইহার নির্দেশ থাকিলেও কাগজটি স্খলিত হইয়া গিয়াছে— সৌম্যেন্দ্রনাথ-সংগ্রহ স্টেজ-কপি হইতে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল। লক্ষণীয় যে ঘটনাস্থল কাশ্মীর হইতে ত্রিচূড়ে পরিবর্তিত।

১। কুমার গিয়েছিলেন কাশ্মীররাজের পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়তে— ফল হল উল্টো। কাশ্মীররাজ গেলেন ক্ষেপে। কুমারের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্চেন।

২। নেউলের হাত থেকে সাপকে বাঁচাতে গেলে শেষকালে সাপের কামড়ে মরতে হয়। এ কথা কুমারের বোঝা উচিত ছিল।

১। সাপের চরিত্র সাপই বোঝে, কুমার বুঝবেন কি করে? সঙ্গে তাঁর

---

১ "শুনেছিনু··· রাখে নাই বাকি" রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে; অনুমান হয় মূল পাণ্ডুলিপিতে এ অংশ ছিল না।

২ শঙ্করের এই উক্তি, এই দৃশ্যে শঙ্করের শেষ উক্তির শেষাংশের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ; 'বার্ধক্যের মুখরতা··· চোখে আসে জল' অংশ বর্জিত।

সৈন্য ত বেশি ছিল না। এখন ভগ্নীপতির হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে তাঁকে লুকিয়ে বেড়াতে হচ্চে।

২। তিনি ত এইখানে ত্রিচূড়েই এসেছেন শুনেচি।

১। হাঁ তিনি আমাদের রাজকুমারীর কাছে বিদায় নিতে এসেচেন।

২। বড়লোকের অদৃষ্ট এমনি করেই ওঠে পড়ে। বিবাহের আয়োজন যেমনি পাকা হয়েচে অমনি বিদায়ের দিন এল।

অন্যান্য যোগ

১॥ প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে জনতার কথোপকথনে শ্রীহর কলুর উক্তি 'আমার এক গাছ বড় কুড়ুল আছে, কিন্তু পালাবার সময় সেটা বাড়িতে ফেলে এসেছি!'র পরে যোগ হইয়াছে—

কিনু। হরু খুড়ো বলছিল কালভৈরব রাগ করেচেন তাই এই দুর্ভিক্ষ। বলি চাই। এবার মহাজনগুলোকে বলি দিলে হয়। আপদ যায়, দেবতারও পেট ভরে।

২॥ প্রথম অঙ্কে সপ্তম দৃশ্যে সুমিত্রার উক্তি

এ রাজ্যে যতেক আছে…

এই অংশের পরিবর্তিত রূপ—

এ নগরে যত আছে…

প্রথম অঙ্ক সপ্তম দৃশ্যে সুমিত্রার উক্তি

কালভৈরবের পূজোৎসবে
কর নিমন্ত্রণ। সেদিন বিচার হবে।

এই অংশের পরিবর্তিত রূপ—

কালভৈরবের পূজা আজি
কর নিমন্ত্রণ। মন্দিরে বিচার হবে।

ইহার পরবর্তী দুই ছত্র বর্জিত, তৎস্থলে নূতন যোগ—

অশ্ব মোর আছে দ্বারে
এখনি মন্দিরে যাব লয়ে তাঁর পূজা।
রুদ্রের প্রসাদ হোক্ সহায় আমার।

ইহার পর দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য হইতে বিক্রমদেবের উক্তি, 'কোথা যাও

একবার ফিরে চাও রাণী' হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্রম ও সুমিত্রার কথোপকথন যুক্ত হইয়াছে। অতঃপর দেবদত্তের প্রবেশ— তাহার উক্তির 'রাজ্যের নায়কগণ' অংশের পরিবর্তিত রূপ—

নগরে এসেছে যত রাজ্যের নায়ক
ভৈরবের পূজোৎসবে,···

পরে সুমিত্রার উক্তি—

ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা!
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রাণী!

অংশের শেষে যোগ হইয়াছে—

যাই চলে
এ রাজ্য ছাড়িয়া। আমি যদি নাহি ছাড়ি
অকল্যাণ ছাড়িবেনা এরে।
হে ভৈরব
তোমার পূজায় আজি দিনু আপনারে
বলি। ধর্ম্মরক্ষা হোক, শান্ত হও তুমি।

এই দৃশ্যে অতঃপর বিক্রমদেব ও দেবদত্তের কথোপকথনের শেষ ছত্রে বিক্রমদেবের উক্তি—

দেখে আসি ঘৃণাভরে কোথা গেল রাণী!

ঈষৎ পরিবর্তিত—

দেখে এস···

তাহার পর নবযোজিত অংশ—

দূতের প্রবেশ

দূত॥ মহারাণী অশ্বে চড়ি মন্দিরে না গিয়ে
গেলেন উত্তর মুখে।[১] এই পত্র তাঁর।

বিক্রম পত্র পড়িয়া

অতঃপর দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য এখানে যোগ করা হইয়াছে—

'বিক্রম। পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে পলায়ন।···'

---

১ 'মন্দিরে না গিয়ে / গেলেন উত্তর মুখে' স্থলে প্রথমে লিখিয়াছিলেন 'অন্তঃপুর হতে / কোথায় গেলেন চলি।'

এই দৃশ্যের শেষে মন্ত্রীর 'যে আদেশ মহারাজ' এই উক্তির পর অবশিষ্ট অংশ, সৌম্যেন্দ্রনাথ-সংগ্রহ স্টেজ-কপিতে বর্জন করিয়া, তৎস্থলে দেবদত্তের এই উক্তি বসানো হইয়াছে—

মহারাণী,
মা জননী, এই ছিল অদৃষ্টে তোমার!
তব নাম ধূলায় লুটায়। তব নাম
ফিরে মুখে মুখে!
তবু তুমি তেজস্বিনী সতী, এরা সব
পথের কাঙাল।

এই অংশ বস্তুত নবলিখিত নহে; এই দৃশ্যের পূর্বাংশে ইহা ছিল; কেবল তথায় 'ফিরে মুখে মুখে'র পর ছিল 'এ কি এ দুর্দ্দিন আজি!', সেই অংশ এখানে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৩॥ তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের স্থানকাশ্মীর হইতে ত্রিচূড়ে পরিবর্তিত, তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া শঙ্কর সম্বন্ধে প্রথম সৈনিকের নিম্নলিখিত উক্তি—

'যুবরাজ এখানে নেই— তবু বুড়ো সাজসজ্জা করে সেই দুয়োরে বসে আছে। পৃথিবী যদি উলট্‌পালট্‌ হয়ে যায় তবু বুড়োর নিয়মের ত্রুটি হবে না'

এই অংশের পরিবর্তে বসানো হইয়াছে—

'কাশ্মীরের সিংহদ্বারের সামনে পাথরের সিংহমূর্ত্তির মত চিরদিন স্থির হয়ে বসে থাকে। কী মনে করে আজ যুবরাজের সঙ্গে এই ত্রিচূড়ে এসেচে।'

এই দৃশ্যের শেষাংশে যে শঙ্কর ও সুমিত্রার নবলিখিত কথোপকথন যোগ করা হইয়াছে তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

৪॥ তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে কুমারসেন ও ইলার প্রবেশের পর ইলার উক্তির পূর্বে কুমারসেনের এই উক্তি যোগ করা হইয়াছে—

সংবাদ এসেছে প্রিয়ে, যেতে হবে মোরে
দুর্বিনীত দস্যুদের করিতে দলন,
কাশ্মীরের কলঙ্ক করিয়া দিতে দূর।

ইহার পরেই ইলার উক্তি

'থাক্ নাথ, আর বেশি বোলো না আমারে।'-র

পরে যোগ হইয়াছে—

শুনেছি সকল কথা, বেঁধেছি হৃদয়।

৫॥ পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমেই ইলার উক্তি—

'মিছে কথা, মিছে কথা! তোরা চুপ কর।'-এর

পরেই যুক্ত হইয়াছে—

এই মাত্র মনে হল যেন সে আমারে
দিল ডাক, তার কান্না ভরিল আকাশে।

ইলার এই উক্তিরই শেষ ভাগে, 'একটুকু চুপ কর।'-এর পরে যোগ হইয়াছে—

সে মোরে ডেকেছে জানি। তাহারি উত্তরে
গাব গান; মনে মনে শুনিতে সে পাবে।

৬॥ পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যের ঘটনাস্থল কাশ্মীর হইতে ত্রিচূড়ে পরিবর্তিত; তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া বিক্রমের উক্তি—

শীঘ্র না পাইলে তারে
সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড দীর্ণ করি
দেখিব কোথা সে আছে!

এইরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে—

ত্রিচূড়ে আছে সে শুনে এলেম হেথায়—
পেলে কি সন্ধান তার?

বিক্রমদেবের পরবর্তী উক্তির ("তারে পেলে অন্য কার্য্যে দিতে পারি হাত"…) শেষাংশে যোগ হইয়াছে—

শোনো সেনাপতি
ত্রিচূড়ের রাজকন্যা ইলারে শিবিরে
বন্দী করে নিতে হবে— সহজেই তবে
কুমার পড়িবে ধরা।

যুধাজিৎ। ত্রিচূড়-নৃপতি
আছেন সম্মত। কন্যারে দিবেন তিনি
নিজ হস্তে উপহার, বলেছেন মোরে।

[দূতের প্রবেশ]

রেবতীর প্রবেশ

চন্দ্র। রাক্ষসী পিশাচী
দূর হ দূর হ—আমারে দিসনে দেখা
পাপীয়সি!

রেবতী। এ রোষ রবে না চিরদিন!

(প্রস্থান)

বিক্রম। (নতজানু) দেবি, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে? ইহজন্ম
নিত্য-অশ্রু-জলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?
দেবতার মত তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

বধূবেশে ইলার প্রবেশ।

ইলা

এসেছি প্রস্তুত হয়ে। উৎসবের আলো
আজিকে সার্থক হোক। কুমার কোথায়?

(সমাপ্ত।)

সমাপ্ত

'ভৈরবের বলির' শেষ পৃষ্ঠা

দূত। দুয়ারে ত্রিচূড়রাজ আছেন প্রস্তুত

প্রভুর সাক্ষাৎ লাগি।

বিক্রম। নিয়ে এস তাঁরে।[১]

অমরুরাজ

প্রবেশ

অতঃপর পঞ্চম অঙ্ক সপ্তম দৃশ্য হইতে অমরুরাজের উক্তি ও অন্যান্য অংশ এখানে যুক্ত হইয়াছে।

৬॥ পঞ্চম অঙ্কে দশম বা শেষ দৃশ্যে বিক্রমদেবের

আমার এ সিংহাসন

যারে ইচ্ছা দিব।

এই উক্তির দ্বিতীয় ছত্র এইরূপ পরিবর্তিত—

দিব তাহা কুমারসেনেরে।

এই দৃশ্যে প্রধান পরিবর্তন— 'ছুটিয়া ইলার প্রবেশ' ও কুমারের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া মূর্চ্ছা অংশ পরিবর্জন, এবং গ্রন্থসমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে এই যোগ—

বধূবেশে ইলার প্রবেশ।

ইলা

এসেছি প্রস্তুত হয়ে। উৎসবের আলো

আজিকে সার্থক হোক্!

কুমার কোথায়?

বিভিন্ন দৃশ্যের ও চরিত্রের সম্পূর্ণ বা আংশিক বর্জন

ভৈরবের বলিতে রাজা ও রানীর কয়েকটি দৃশ্য সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে; অপর প্রায় সকল দৃশ্যেই সংলাপ অল্পবিস্তর সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন বা একই অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্য যোগ করিয়া কোনো কোনো স্থলে একটি দৃশ্যে পরিণত করা হইয়াছে, উপরে তাহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে।

ঘটনাস্থলেরও পরিবর্তন হইয়াছে, তাহারও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

---

১ এই অংশ সৌম্যেন্দ্রনাথ-সংগ্রহ স্টেজ-কপিতেও কবির হস্তাক্ষরে আছে। উহাতে 'দূতের প্রবেশ' তিনি যোগ করিয়াছেন।

যে-সকল দৃশ্য সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে, সেগুলি এই—

প্রথম অঙ্ক। অষ্টম দৃশ্য। মন্ত্রী ও ত্রিবেদী

দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য। জয়সেন, ত্রিবেদী ও মিহিরগুপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য। পুরুষবেশে রাণী সুমিত্রা···

তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য। কুমারসেন ও ছদ্মবেশী সুমিত্রা

তৃতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য। রেবতী ও চন্দ্রসেন

চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য। বিক্রমদেব ও সেনাপতি

চতুর্থ অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য। কুমারসেন ও সুমিত্রা···[১]

চতুর্থ অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য। বিক্রমদেব, যুধাজিৎ ও জয়সেন

পঞ্চম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য। রেবতী ও চন্দ্রসেন

এই-সকল সংক্ষেপণের ফলে ত্রিবেদী, রেবতী ও মিহিরগুপ্তের চরিত্র সম্পূর্ণই বাদ পড়িয়াছে।

'ভৈরবের বলি'তে ব্যবহৃত গান

ভৈরবের বলির অভিনয়পত্রী হইতে উক্ত অভিনয়ে ব্যবহৃত গানের তালিকা পাওয়া যায়; রাজা ও রানীতে পূর্বব্যবহৃত কয়েকটি গানের সহিত

---

১ এই দৃশ্য প্রথমে অংশত বর্জন করিয়া শঙ্করের উক্তি—

'হায় এ কি অপমান?
পলাতক ভীরু বলে রটিবে অখ্যাতি'র

পর তিন ছত্র পেনসিলে যোগ করিয়াছিলেন—

এ কথা জানিয়ো মনে, জালন্ধরপতি
তোমার শাস্তির ছলে, সৈন্যবল নিয়ে,
কাশ্মীর করিবে আক্রমণ।

তাহা বর্জন করেন।

রাজা ও রাণীর "যমের দুয়োর খোলা পেয়ে" গানটি অভিনয়পত্রীতে মুদ্রিত না হইলেও বস্তুত গীত হইয়াছিল, অভিনয়-দর্শক শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এইরূপ জানাইয়াছেন। ১, ৪, ৫, ৮ ও ৯ -সংখ্যক গান রাজা ও রানী হইতে রক্ষিত; অপরগুলি নবপ্রযুক্ত।

পরবর্তীকালে রচিত কয়েকটি গানও ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১ ঐ আঁখি রে
২ এবার অবগুণ্ঠন খোল
৩ বাজোরে বাঁশরী বাজো
৪ এরা পরকে আপন করে আপনারে পর
৫ ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
৬ না যেয়ো না, যেয়ো নাকো
৭ কেন ধরে রাখা ও যে যাবে চলে
৮ আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি
৯ বঁধু তোমায় করব রাজা
১০ অশ্রুভরা বেদনা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা। ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯।১২	হইয়াছিল	হইয়াছে
৩১।১৯	"সমালোচনা।	"সমালোচন।
৩৭। ৮	··· হইতে[১]	···হইতে শেষ পর্যন্ত[২]
৩৮।২০	দ্বিতীয় স্তম্ভে কবিতার নাম 'শেষ' পড়িতে হইবে।	
৪১।১৯	through	though
৬৬।২০	··· বসন্ত রায়১/ উপন্যাস। /)	···বসন্ত রায়)/ উপন্যাস।/